বেদের আদর্শ সুখবাদ। বৌদ্ধ আদর্শ দুঃখবাদ। এই বিপরীত বাদের সমবায়ে যে হিন্দুধর্ম্ম, তাহাতে সুখবাদ উপেক্ষিত ও দুঃখবাদ সম্মানিত হওয়ায় কোন্ পথে অকল্যাণের সৃষ্টি হইয়াছে এবং কোন্ পথে অগ্রগমন করিলে সমাজের শ্রেয় ও কল্যাণ হইবে, এই গ্রন্থে তাহাই আলোচিত হইয়াছে। এক কথায় এই গ্রন্থকে জাতীয় ভাষা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আহার ও যৌন সম্বন্ধের কৌতুকাবহ ক্রম পরিবর্ত্তনের সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ইতিহাস বলা যাইতে পারে।

ভবিষ্য ভারত

১৯৪৬

স্বামী ভূমানন্দ

মূল্য ১৲ টাকা

ভূমিকা

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"এমন কোন গুণ নাই, যা কোন জাতিবিশেষের একাধিকার। তবে কোন ব্যক্তিতে যেমন, তেম্‌নি কোন জাতিতে কোন কোন গুণের আধিক্য, প্রাধান্য।

"আমাদের দেশে—মোক্ষলাভেচ্ছার প্রাধান্য, পাশ্চাত্যে 'ধর্ম্মের'। আমরা চাই কি—'মুক্তি'। ওরা চায় কি—'ধর্ম্ম'। ধর্ম্ম কথাটা মীমাংসকদের মতে ব্যবহার হচ্ছে। ধর্ম্ম কি? যা ইহলোক বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম্ম হচ্ছে ক্রিয়া-মূলক। ধর্ম্ম মানুষকে দিন রাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে।

"মোক্ষ কি? যা শেখায় যে ইহলোকের সুখও গোলামী, পরলোকেরও তাই। এ প্রকৃতির নিয়মের বাইরে ত এলোকও নয়, পরলোকও নয়। তবে, সে দাসত্ব—লোহার শিকল আর সোনার শিকল। তারপর প্রকৃতির মধ্যে বলে বিনাশশীল সে সুখ থাকবে না। অতএব মুক্ত হতে হবে, প্রকৃতির বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, শরীর বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, দাসত্ব হলে চলবে না। * * * এককালে এই ভারতবর্ষে ধর্ম্মের আর মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল। তখন যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাস, শুক, জনকাদিও বর্ত্তমান ছিলেন। বৌদ্ধদের পর হতে ধর্ম্মটা একেবারে অনাদৃত হল, খালি মোক্ষ-মার্গই প্রধান হল। * * * এই যে দেশের দুর্গতির কথা

সকলের মুখে শুনছো, ওটা ঐ ধর্ম্মের অভাব। যদি দেশ-শুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম্ম অনুশীলন করে, সে ত ভালই; কিন্তু তা হয় না, ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ হ'বে। নইলে খামকা দেশ শুদ্ধ লোক মিলে সাধু হল, না এদিক্, না ওদিক্। যখন বৌদ্ধ রাজ্যে, এক এক মঠে এক এক লাখ সাধু, তখনই দেশটি ঠিক উৎসন্ন যাবার মুখে পড়েছে। বৌদ্ধ, কৃশ্চান, মুসলমান, জৈন, ওদের একটা ভ্রম যে সকলের জন্য সেই এক আইন, এক নিয়ম। ঐটি মস্ত ভুল; জাতি প্রকৃতি ভেদে শিক্ষা-ব্যবহার-নিয়ম সমস্ত আলাদা, জোর করে এক কর্ত্তে গেলে কি হবে? বৌদ্ধরা বল্লে,—মোক্ষের মত আর কি আছে, দুনিয়া-শুদ্ধ মুক্তি নেবে চল'—বলি তা কি হয়? 'তুমি গেরস্থ মানুষ, তোমার ওসব কথায় বেশী আবশ্যক নাই, তুমি তোমার স্বধর্ম্ম কর' একথা বলেছেন হিঁদুর শাস্ত্র। ঠিক কথাই তাই। একহাত লাফাতে পার না, লঙ্কা পার হবে। কাজের কথা? দুটো মানুষের মুখে অন্ন দিতে পার না, দুটো লোকের সঙ্গে এক বুদ্ধি হয়ে, একটা সাধারণ হিতকর কায কর্ত্তে পার না, মোক্ষ নিতে দৌড়াচ্ছ!! হিন্দু শাস্ত্র বলেছেন যে, 'ধর্ম্মের' চেয়ে—'মোক্ষ'টা অবশ্য অনেক বড়,—কিন্তু আগে ধর্ম্মটি করা চাই। বৌদ্ধরা ঐখানটায় গুলিয়ে যত উৎপাত করে ফেললে আর কি! অহিংসা ঠিক, 'নির্বৈর' বড় কথা; কথা তঃ বেশ, তবে শাস্ত্র বলেছেন তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে। 'আততায়িনমায়ান্তং' ইত্যাদি। হত্যা কর্ত্তে

এসেছে এমন ব্রহ্ম-বধেও পাপ নাই মনু বলেছেন। এ সত্য কথা, ঐটি ভোলবার কথা নয়।

"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য্য প্রকাশ কর, সাম, দান, ভেজ, দণ্ডনীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর তবে তুমি ধার্ম্মিক। আর ঝাঁটা লাথি খেয়ে চুপটি করে, ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরক ভোগ, পরকালেও তাই। এটিই শাস্ত্র মত। সত্য, সত্য, পরম সত্য,—স্বধর্ম্ম করহে বাপু! অন্যায় কর না, অত্যাচার কর না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে। * * * ঐ না পারলে ত তুমি কিসের মানুষ? গৃহস্থই নও—আবার 'মোক্ষ' !!

"পূর্ব্বে বলেছি যে, ধর্ম্ম হচ্ছে কার্য্য-মূলক। ধার্ম্মিকের লক্ষণ হচ্ছে, সদা কার্য্যশীলতা। এমন কি, অনেক মীমাংসকের মতে বেদে যে স্থলে কার্য্য করতে বলছে না, সে স্থলগুলি বেদই নয়। * * * 'ওঁকার ধ্যানে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি' 'হরিনামে সর্ব্বপাপ নাশ', 'শরণাগতের সর্ব্ব-প্রাপ্তি—এ সমস্ত শাস্ত্র-বাক্য, সাধুবাক্য অবশ্য সত্য; কিন্তু দেখতে পাচ্ছ, লাখলোক ওঁকার জপে মচ্ছে, হরিনামে মাতোয়ারা হচ্ছে, দিন রাত প্রভু যা করেন বলছে, পাচ্ছে ঘোড়র ডিম। তার মানে বুঝতে হবে যে কার জপ যথার্থ হয়? কার মুখে হরিনাম বজ্রবৎ অমোঘ? কে শরণ যথার্থ নিতে পারে? যার কর্ম্ম করে চিত্ত-শুদ্ধি হয়েছে, অর্থাৎ যে 'ধার্ম্মিক'। * * * 'মুক্তি-কামের ভাল' অন্য রূপ, 'ধর্ম্ম-কামের' ভাল আর একপ্রকার। এই গীতা-প্রকাশক

শ্রীভগবান্ এতকরে বুঝিয়েছেন, এই মহাসত্যের উপর হিঁদুর স্বধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম ইত্যাদি। 'অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ' (গীতা ১২।১৩) ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য মোক্ষ-কামের জন্য। আর 'ক্লৈবং মাস্ম গমঃ পার্থ' (গীতা ২।৩) 'তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব" (গীতা ১১।৩৩) ইত্যাদি ধর্ম্মলাভের উপায় ভগবান্ দেখিয়েছেন। * * * ঐ যে মিন্ মিনে পিন্‌পিনে ঢোঁক গিলে গিলে কথা কয়, ছেঁড়া নেতা, সাত দিন উপবাসীর মত সরু আওয়াজ, সাত-চড়ে কথা কয় না, ওগুলো হচ্ছে তমোগুণ, ওগুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্ত্বগুণ নয়, পচা দুর্গন্ধ। অর্জ্জুন ঐ দলে পড়েছিলেন বলেই ত ভগবান্ এত করে বোঝাচ্ছেন না গীতায়? প্রথম ভগবানের মুখ থেকে কি কথা বেরুল দেখ, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'—শেষ 'তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব'। ঐ জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে আমরা ঐ তমোগুণের দলে পড়েছি—দেশ শুদ্ধ পড়ে কতই 'হরি' বলছি, ভগবানকে ডাক্‌ছি, ভগবান্ শুনছেনই না,—আজ হাজার বৎসর। শুনবেনই বা কেন, আহাম্মকের কথা মানুষেই শোনে না, তা ভগবান্। এখন উপায় হচ্ছে ঐ ভগদ্বাক্য শোনা—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ;' 'তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব।' * * * মোক্ষমার্গ ত প্রথম বেদই উপদেশ করেছেন। তারপর বুদ্ধই বল, আর যীশুই বল, সব ঐখান থেকেই ত যা কিছু গ্রহণ। আচ্ছা, তাঁরা ছিলেন সন্ন্যাসী,—'অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ'—বেশ কথা, উত্তম কথা। তবে, জোর করে দুনিয়া শুদ্ধ লোককে ঐ মোক্ষ-মার্গে নিয়ে যাবার চেষ্টা কেন? ঘসে-মেজে রূপ, আর ধরে-বেঁধে পিরীত কি হয়? যে মানুষটা মোক্ষ চায় না, পাবার উপযুক্ত নয়,

তার জন্য বুদ্ধ বা যীশু কি উপদেশ করেছেন বল,—কিছুই নয়। হয় তুমি মোক্ষ পাবে, নয় তুমি উৎসন্ন যাও, এই দুই কথা। মোক্ষ ছাড়া যা কিছু চেষ্টা করবে, সে আটঘাট তোমার বন্ধ। তুমি যে এ দুনিয়াটা একটু ভোগ করবে তার কোনও রাস্তা নাই, বরং প্রতিপদে বাধা। কেবল বৈদিক ধর্ম্মে এই চতুর্ব্বর্গ সাধনের উপায় আছে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। বুদ্ধ করলেন আমাদের সর্ব্বনাশ, যীশু করলেন গ্রীস রোমের সর্ব্বনাশ !!!

"বৌদ্ধধর্ম্মের আর বৈদিক ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এক। তবে বৌদ্ধমতের উপায়টি ঠিক নয়। উপায় যদি ঠিক হয়, ত আমাদের এ সর্ব্বনাশ কেন হল? 'কালেতে হয়' বল্লে কি চলে? কাল কি কার্য্য কারণ সম্বন্ধ ছেড়ে কায কর্ত্তে পারে?

"অতএব উদ্দেশ্য এক হলেও উপায়হীনতায় বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষকে পাতিত করেছে। * * * উপায় হচ্ছে বৈদিক উপায়,—'জাতিধর্ম্ম,' 'স্বধর্ম্ম,' যেটি বৈদিক-ধর্ম্মের বৈদিক-সমাজের ভিত্তি। * * * এই 'জাতিধর্ম্ম,' 'স্বধর্ম্মই সকল দেশে সামাজিক কল্যাণের উপায়, মুক্তির সোপান। ঐ 'জাতিধর্ম্ম' 'স্বধর্ম্ম' নাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশটার অধঃপতন হয়েছে। তবে নিধুরাম-সিধুরাম যা 'জাতিধর্ম্ম,' 'স্বধর্ম্ম' বলে বুঝেছেন, ওটা উল্‌টো উৎপাত; নিধু জাতিধর্ম্মের ঘোড়ার ডিম বুঝেছেন, ওঁর গাঁয়ের আচারকেই সনাতন আচার বলে ধারণা কচ্ছেন, নিজের কোলে ঝোল টানছেন, আর উৎসন্ন যাচ্ছেন।"—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

ভবিষ্য ভারত

বা

মানবজাতি ও মানবধর্ম্ম গঠনের উপাদান

ছুঁৎমার্গ ও বর্ণ বিভাগ প্রভুত্বের প্রতীক

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকাতে বেদান্ত প্রচার করিয়া যে দিন ভারতে ফিরিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে মহাপ্রস্থানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নানা প্রসঙ্গের মধ্য দিয়া দেশবাসীকে ছুঁৎমার্গ পরিহার করিতে আন্তরিক অনুরোধ জানাইয়াছেন।

ইদানীং মহাত্মা গান্ধী যে হরিজন আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা সেই ছুঁৎমার্গ পরিহারেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। এই ছুঁৎমার্গ পরিহারের জন্য শুধু মন্দির-দ্বার হরিজনের সম্মুখে উন্মুক্ত করিলেই বৃহত্তর ভারত গঠিত হইবে না। বৃহত্তর ভারত গঠন করিতে হইলে, স্বামিজীর অন্য কথাও শুনিতে হইবে। যথা,—"আধুনিক বর্ণ বিভাগ প্রকৃত বর্ণ বিভাগ নহে; উহা প্রকৃত বর্ণের উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তিই এক এক বর্ণ—উহা প্রকৃতিগত। পুরাণেও দেখা যায়, এক পিতার বহু পুত্র স্বধর্ম্ম অনুসারে বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান [বংশগত] বর্ণ বিভাগ ঐ প্রকৃত [গুণগত] বর্ণের উন্নতি ও বিচিত্র গতির স্বাধীনতায় ব্যাঘাত করিয়াছে। কোন বদ্ধমূল প্রথা বা বংশানুগত বিশেষ সুবিধা বর্ণের যথার্থ প্রভাব অব্যাহত গতিতে যাইতে দেন না। আর যখনই কোন বর্ণ এইরূপ বিচিত্রতা প্রসব না করে, তখন উহা অবশ্য বিনষ্ট হইবে।

"অতএব আমি আমার স্বদেশবাসিগণকে এই বলিতে চাই যে,—[স্বধর্ম্মানুসারে] বর্ণ উঠাইয়া দেওয়াতেই ভারতের পতন হইয়াছে। প্রত্যেক বদ্ধমূল [বংশগত] আভিজাত্য অথবা [বংশানুক্রমে] সুবিধাভোগীর দল,—প্রকৃত বর্ণ নহে, উহারা বর্ণের প্রতিবন্ধক মাত্র। মানব নিজ প্রভাব বিস্তার করুক, উন্নতির পক্ষে যাহা কিছু বাধাবিঘ্ন আছে, সব ভাঙ্গিয়া ফেলা হউক—তাহা হইলেই আমরা উঠিব।"

সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দ কথিত "যাহা কিছু বাধাবিঘ্ন আছে," তাহা দেশবাসীকে ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে এপর্য্যন্ত হিন্দুর জাতীয় ধারা, আনুষ্ঠানিক কর্ম্মপদ্ধতি, যৌন সম্বন্ধ ও খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে যত রকম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা এই গ্রন্থে আলোচিত হইল। এই আলোচনা হইতে সকলেই অস্পৃশ্য (হরিজন) ও বর্ণ বিভাগের সম্যক ইতিহাসও জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

প্রথমে বর্ণ ও জাতি—এই শব্দ দুইটির ধাতুগত অর্থ জানিয়া রাখা বিধেয়। অন্যথায় 'বর্ণ' দ্বারা জাতি ও 'জাতি' দ্বারা বর্ণ বুঝিতে যাইয়া, বর্ণ বিভাগের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে।

বর্ণ ও জাতির ধাতুগত অর্থ

বর্ণ [ব্রিয়তে স চ নিৎ] বর্ণ, গুণ ও কর্ম্মপ্রকাশাত্মক। যেমন,—আর্য্য বর্ণ, দস্যু বর্ণ, পরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বর্ণ। জাতি [জন্ ক্তি (ভাবে—ক্তি)] জন্মদ্বারা সংহতি।—যেমন মানব জাতি, পশু [চতুষ্পদ] জাতি, পক্ষী জাতি। জাতির সংজ্ঞায়

গৌতম সূত্রে [২।১৩৪] লিখিত আছে,—সমানা প্রসবাত্মিকা—জাতি। অর্থাৎ যাহারা সমান আকার বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তাহারাই এক জাতি।

সুতরাং মানুষ হিসাবে আর্য্য, অনার্য্য, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল মানুষই এক জাতীয়, ইহা যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমন এই মানব জাতির মধ্যে গুণ ও কর্ম্ম পার্থক্যে শ্রেণী বিভক্ত হইলে, বর্ণ যে অসংখ্য হইবে, তাহাও অস্বীকার করা চলে না। আবার ইহাও অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই যে,—বর্ণ যখন গুণ ও কর্ম্মপ্রকাশক, তখন যে কোন মানুষ একই জীবনে নানা বর্ণ প্রাপ্ত হইতে পারে। শুধু সহজে মানুষ বদলাইতে পারে না—শরীরের রং, হাড়ের গড়ন ও রক্তের নিজস্ব তেজ।

প্রথম স্তবে আর্য্য বর্ণের কথা

আজ যাহারা উচ্চবর্ণ হিন্দু, তাহারাই হইল, ঋগ্বেদ বর্ণিত আর্য্য বর্ণ। আর যাহারা আজ শূদ্র ও হরিজন (অস্পৃশ্য) তাহারাই হইল,—ঋগ্বেদ বর্ণিত দস্যু, দাস, শিম্যু, পণি, নিষাদ, রাক্ষস প্রভৃতি। এক কথায় ভারতের আদিম অধিবাসী বা অনার্য্যগণ।

আর্য্যগণ ভারতের বাহির হইতে আসিয়া এদেশে যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তৎপক্ষে ঋগ্বেদের তিনটি মন্ত্র সাক্ষ্য প্রদান করিবে*। সুতরাং আর্য্যগণ বিজয়ী বেশে ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতের আদিম অধিবাসী যাহারা আর্য্যগণের ভারত লুণ্ঠনে বাধা দিয়াছিল, তাহাদিগকে দস্যু, নিষাদ, রাক্ষস প্রভৃতি শব্দ দ্বারা অভিহিত করিল। যেমন মুসলমান, ভারতবাসীকে 'হিন্দু' (চোর, বঞ্চক, কৃতদাস), 'কাফের' প্রভৃতি শব্দে ও ইংরাজ, সকল ভারতবাসীকে 'নেটিভ' 'নিগার' শব্দে অভিহিত করিয়া থাকে। বিজয়ী চিরদিন বিজিতকে এমন অপমান জনক কথা বলিয়াই সুখ অনুভব করে। বিজয়ী এমনই দাম্ভিক!

* (ক) ২।১৩।১২॥ (খ) ৫।৬১।১॥ (গ) ১০।৯৫।১২॥

ঋগ্বেদে আর্য্যং বর্ণং [৩।৩৪।৯] শব্দটি একবচনে প্রয়োগ থাকায় ইহাই সূচিত করিতেছে যে, যাহারা শ্বেতকায়, বেদপাঠী যজ্ঞে অভ্যস্ত ও দেবতায় বিশ্বাসী ছিল, তাহারা সকলেই আর্য্যবর্ণ।

আর্য্য শব্দের অর্থ

আর্য্য শব্দের ধাতুগত অর্থ,—ঋ-ণ্যৎ = আর্য্যতে গম্যতে পূজা। বেদের অভিধান 'নিরুক্ত' গ্রন্থে লিখিত আছে,—আর্য্য = ঈশ্বর পুত্র [৬।২৬]। ঋগ্বেদের ভাষ্যকার এই আর্য্য শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন,- বিজ্ঞ যজ্ঞানুষ্ঠাতা, বিজ্ঞ স্তোতা, বিজ্ঞ, অরণীয় বা সর্ব্ব-গন্তব্য, উত্তম বর্ণ, ত্রৈবর্ণিক [ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য,] মনু, কর্ম্মযুক্ত, কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ। বেদের অপর অভিধান 'নিঘণ্টু' গ্রন্থে আর্য্য শব্দের অর্থ,— গম্যতে হি সর্ব্বৈরাশ্বরৈঃ। অর্থাৎ—বাণিজ্য ও যুদ্ধ ব্যপদেশে সর্ব্বত্র গমনশীল ও সর্ব্বত্র জয়ী বলিয়া প্রভু বা ঈশ্বর পদবাচ্য।

আর্য্যগণের স্বধর্ম্মবশে জীবিকার্জ্জনের উদাহরণ

জীবিকার্জ্জনের জন্য আর্য্যগণ নিজ স্বধর্ম্মের উপর নির্ভর করিত। এই স্বধর্ম্ম বলিতে আর্য্যগণ বুঝিত,—স্বভাব বা প্রবৃত্তি। এই স্বভাব যাহাকে যে কাজে নিযুক্ত করে তাহাই হইল তাহার স্বধর্ম্ম [One's own natural intuition towards work]। এই স্বধর্ম্মের নিদর্শনে জীবিকার্জ্জনের উল্লেখও এই ঋগ্বেদেই আছে।ঃ—

১। হে সোম! সকল ব্যক্তির কার্য্য এক প্রকার নহে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, আমাদিগেরও [আর্য্যগণের] কার্য্য নানাবিধ। দেখ, তক্ষ (ছুঁতার) কাট তক্ষণ করে, বৈদ্য রোগের প্রার্থনা করে, স্তোতা [ঋত্বিক] যজ্ঞ কর্ত্তাকে চাহে॥ ৯।১১২।১॥

২। দেখ, শুষ্ক বৃক্ষ শাখা, পক্ষীর পালক ও শান দিবার নিমিত্ত উজ্জ্বল প্রস্তর, এই কয় বস্তুর সংযোগে কর্ম্মকার বাণ প্রস্তুত করিয়া, সেই

বাণ বিক্রয় করিবার উপযুক্ত ধনাঢ্য ব্যক্তির অন্বেষণ করে॥ ৯।১১২।২॥

৩। দেখ আমি স্তোত্রকার [ব্রাহ্মণ বা ঋত্বিক], পুত্র চিকিৎসক ও কন্যা প্রস্তরের উপর যব-ভর্জ্জন-কারিণী। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিতেছি। যেরূপ গাভীগণ গোষ্ঠ মধ্যে বিচরণ করে, তদ্রূপ আমরা ধনের কামনায় তোমার [সোমের] পরিচর্য্যা করিতেছি॥ ৯।১১২।৩॥

কর্ম্মের দ্বারা শ্রেণী বিভাগ

ঋগ্বেদে দেখা যায় আর্য্যবর্ণের মধ্যে যে যেমন কাজ করিত, কর্ম্মাশ্রয়ে তাহাকে তেমন নামে অভিহিত করা হইত। যেমন,—সম্রাট [৬।৭।৮ ঋক্], রাজা [১।৪০।৮], গ্রামণী [১০।৬২।১১], পুরপতি [১।১৭৩।১০], ঋষি [মন্ত্র ও যজ্ঞ আবিষ্কারক], ব্রহ্মা [যজ্ঞের প্রধান তদ্বিরকারক], কাঠুরিয়া, কামার, চামার, নাপিত, ধোবা, ছুঁতার, চিকিৎসক, তন্তুবায় প্রভৃতি। এই সকল প্রজাপুঞ্জ যাঁহার অধীনে থাকিতেন, তাঁহার নাম সম্রাট বা রাজা। রাজাই ছিলেন,—বেদ ও যজ্ঞের রক্ষক, সকলের মাথার মণি, পরম পূজনীয়। এই জন্য দেখা যায়, রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণ নিম্নাসনে বসিয়া উচ্চ সিংহাসনে অবস্থিত রাজার পাদপূজা করিতেছেন॥ বৃহদারণ্যক শ্রুতি॥ ১।৪।১১॥

ঋগ্বেদে আর্য্য ও দস্যুর কথা

ঋগ্বেদীয় যুগে আর্য্যগণ যে এক অবিভক্ত বর্ণ ছিল, তাহা যে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণে (গুণ বা বংশ) কোনরূপেই বিভক্ত হয় নাই, তৎপক্ষে ঋগ্বেদের কয়েকটি মন্ত্র নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল।ঃ--

১। সব্য ঋষি বলেন,—হে ইন্দ্র! কাহারা আর্য্য ও কাহারা দস্যু তাহা অবগত হও। কুশযুক্ত যজ্ঞের বিরোধীদিগকে শাসন করিয়া [যজমান আর্য্যদিগের] বশীভূত কর। তুমি শক্তিমান্, অতএব যজ্ঞ সম্পাদনকারীদিগের [আর্য্যের] সহায় হও॥ ১।৫১।৮॥

২। কুৎস ঋষি বলেন,—তিনি বহুরূপ অস্ত্র লইয়া বীরকার্য্যে

উৎসাহপূর্ণ হইয়া দস্যুদিগের নগর সমূহ বিনাশ করিয়া বিচরণ করিয়াছিলেন। * * * হে ইন্দ্র! আর্য্যগণের বল ও যশ বর্দ্ধন কর ॥ ১।১০৩।৩ ॥

৩। কক্ষীবান্ ঋষি বলেন,—হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আর্য্য মনুষ্যের জন্য লাঙ্গল দ্বারা [চাষ করাইয়া] যব বপন করাইয়া ও অন্নের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া এবং বজ্রদ্বারা দস্যুকে বধ করিয়া তাহার [আর্য্যের] প্রতি জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়াছ ॥ ১।১১৭।২১ ॥

৪। পরুচ্ছেদ ঋষি বলেন,—ইন্দ্র যুদ্ধে আর্য্য যজমানকে রক্ষা করেন। অসংখ্যবার রক্ষাকারী ইন্দ্র সমস্ত যুদ্ধে তাহাকে [আর্য্যকে] রক্ষা করেন। সুখপ্রদ সংগ্রামে তাহাকে [আর্য্যকে] রক্ষা করেন। * * * তিনি কৃষ্ণত্বক উন্মোচন করিয়া তাহাকে [দস্যুকে] বিনাশ করেন ॥ ১।১৩০।৮ ॥

৫। বিশ্বামিত্র ঋষি বলেন,—ইন্দ্র দস্যুদিগের বধ করিয়া আর্য্য-বর্ণকে রক্ষা করিয়াছেন ॥ ৩।৩৪।৯ ॥

৬। বামদেব ঋষি বলেন,—আমি [ইন্দ্র বা ব্রহ্ম] আর্য্যকে পৃথিবী দান করিয়াছি ॥ ৪।২৬।২ ॥

৭। সুমিত্র ঋষি বলেন,—হে অগ্নি! পর্ব্বতের উপরে যে সকল জঙ্গম-ধন, তাহা তুমি দাসদিগের নিকট জয় করিয়া আর্য্যদিগকে দিয়াছ ॥ ১০।৬৯।৬ ॥

উপরে যে ছয়টি মন্ত্র উদ্ধৃত হইল, এমন ধরণের একটি মন্ত্রও কেহ ঋগ্বেদ মধ্যে আবিষ্কার করিতে পারেন না, যাহা ব্রাহ্মণ বর্ণ, ক্ষত্রিয় বর্ণ, বৈশ্যবর্ণ কিম্বা শূদ্র বর্ণের মঙ্গল কামনায় উক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বর্ণের মহিমা মহাভারতাদি গ্রন্থে যে ভাবে লিখা আছে, তাহা যদি খাঁটি সত্য হইত তবে ঋষিগণ আর্য্যবর্ণ ভিন্ন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বর্ণের জন্যও পূর্ব্বোক্তরূপ মন্ত্র নিশ্চিতই রচনা করিতেন। ইহা ভিন্ন অন্য প্রমাণও যথেষ্ট আছে যে, বহুদিন পর্য্যন্ত আর্য্যগণ এক অবিভক্ত বর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল, যাহা পুরুষ সূক্তের আলোচনার সময়ে প্রকাশ পাইবে।

ভারতবাসীকে আর্য্যগণ দস্যু বলিত

আজ যেমন মাঞ্চুরিয়া রাজ্য জাপান দখল করিয়া যে সকল মাঞ্চু, দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিতেছে, তাহাদিগকে দস্যু বলিয়া অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করিতেছে, ভারতের স্বাধীনতা-হরণকারী আর্য্যগণকে ভারতের স্বাধীনতা হরণে বাধা দিয়া কৃষ্ণকায় ভারতের আদিম বর্ণ সকলও আর্য্যগণের রচনায় দস্যু নামে অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু অনার্য্যগণও [দস্যু] দুর্ব্বল হস্তে অস্ত্র চালনা করিত না। তাহাদের ছোট বড় অনেক রাজার নামও ঋগ্বেদে দেখা যায়। তাহাদের সুরক্ষিত নগর ছিল, প্রস্তরের নির্ম্মিত বৃহৎ অট্টালিকা ছিল, বাহুতে অসীম বলও ছিল। কিন্তু পরাজয়ের রকম দেখিয়া মনে হয়, বিভিন্ন দস্যু রাজগণের মধ্যে একতা ছিল না। আর ছিল না, উন্নত প্রণালীর অস্ত্র শস্ত্র এবং উদ্ভাবনী শক্তি।

দস্যুগণও বিলক্ষণ প্রবল ছিল

অনার্য্য দস্যুর সহিত আর্য্যগণের অনেক ভয়াবহ যুদ্ধের কথা ঋগ্বেদে রহিয়াছে। নিম্নে তাহারই কয়েকটি সংবাদ উদ্ধৃত করা হইল ঃ—

(ক) বামদেব ঋষি বলেন,—হে ইন্দ্র! তুমি পিপ্রু ও প্রবৃদ্ধ মৃগয়কে [দস্যু] বিনাশ করিয়াছিলে, তুমি দস্যুগণকে বিদথীর পুত্র ঋজিশ্বার [আর্য্য] বশীভূত করিয়াছিলে। তুমি পঞ্চাশ হাজার কৃষ্ণবর্ণ শত্রুকে বিনাশ করিয়াছিলে। জরা যেমন রূপ বিনাশ করে সেইরূপ তুমি [ইন্দ্র] শম্বরের নগর ধ্বংস করিয়াছিলে ॥ ৪।১৬।১৩ ॥

(খ) সুহোত্র ঋষি বলেন,—[হে ইন্দ্র!] তুমি শম্বরের একশত দুর্ভেদ্য নগর উচ্ছিন্ন করিয়াছ ॥ ৬।৩১।৪ ॥

(গ) বামদেব ঋষি বলেন,—ইন্দ্র, [আর্য্য] দভীতির জন্য মায়াবলে ত্রিশ হাজার দাসকে (দস্যু) হনন করিয়াছিলেন ॥ ৪।৩০।২১ ॥

দস্যু উৎসাদনের এই প্রকার বহু মন্ত্রই ঋগ্বেদে আছে। আর প্রায় প্রতি মন্ত্রে, হয় ইন্দ্র, নতুবা অগ্নি প্রভৃতি দেবতার নাম করিয়া বলা

হইয়াছে, দেবতারাই দস্যু নিধন করিয়াছেন। কার্য্যতঃ কিন্তু আর্য্য-গণই দস্যুগণকে বধ করিয়াছে।

আর্য্য ও দস্যুর প্রকৃতি ভেদের লক্ষণ

আদিম ভারতবাসী যে কৃষ্ণকায় ছিল এবং সেই কৃষ্ণবর্ণ যে আর্য্য মনে বিরক্তি ও ঘৃণার সঞ্চার করিয়াছিল, তাহার অনুকূলে অনেক ঋক্ রচিত হইয়াছে। ইহা ভিন্নও আর্য্যের সহিত অনার্য্যের যে সকল পার্থক্য ছিল তাহার অনেকটা বিমদ ঋষির কথায় প্রকাশ আছে। যথা,—

আমাদিগের [আর্য্যগণের] চতুর্দ্দিকে দস্যুগণ আছে, তাহারা যজ্ঞ করে না, তাহারা কিছু [বৈদিক দেবতা] মানে না. তাহাদের ক্রিয়া স্বতন্ত্র. তাহারা মানুষের মধ্যেই নহে। হে শত্রু-সংহারকারি [ইন্দ্র]! তাহাদিগকে নিধন কর, সেই দাসগণকে হিংসা কর॥ ১০।২২।৮॥

আর্য্যও দস্যুর পার্থক্যের হেতু

সুতরাং আর্য্য অনার্য্য মধ্যে অনেক দিন পর্য্যন্ত যে একটা স্থায়ী শত্রুভাব ছিল, তাহার হেতু হইয়াছিল,—

১। আর্য্যগণ ভারত আক্রমণকারী, দস্যুগণ বিরোধী।

২। শরীরে বর্ণ পার্থক্য

৩। ধর্ম্মমতের পার্থক্য

৪। ভাষা পার্থক্য

৫। রীতি নীতি আচার ব্যবহার পার্থক্য

তবুও ঋগ্বেদে দেখা যায়, যে সকল দস্যু বা দাস আর্য্য প্রভুত্ব স্বীকার করিতে চাহিত, আর্য্যগণ তাহাদিগকে ইন্দ্রের নামে গ্রহণ করিয়া বেদপন্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে প্রস্তুত ছিল। যথা,—

(ক) শতক্রতু ইন্দ্র সেই অগ্রুর পুত্র পরাবৃতকে [অনার্য্য] স্তোত্র-ভাগী [যজ্ঞ করিবার অধিকার দান] করিয়াছিলেন ॥ ৪।৩০।১৬ ॥

(খ) যজ্ঞপতি বিদ্বান ইন্দ্র অনভিষিক্ত [উপনয়ন বিহীন] সেই তুর্ব্বশ ও যদুকে [অনার্য্য] অভিষেকের যোগ্য [উপনয়নান্তে বেদপাঠের অধিকারী] করিয়াছিলেন ॥ ৪।৩০।১৭ ॥

বেদ, দেব ও যজ্ঞে বিশ্বাস করিলে আর্য্যগণ যে দস্যুগণকে 'দাস' বলিয়া আপ্যায়িত ও তাহার অন্ন গ্রহণ করিত, তৎপক্ষে নাভানেদিষ্ট ঋষি বলেন,—"যদু ও তুর্ব্ব নামে দুই দাস [অনার্য্য] রাজা গাভীবর্গে পরিবৃত হইয়া এবং অতি সুন্দর বাক্য [বৈদিক ভাষা] কহিতে কহিতে সেই মনুর জন্য ভোজনের আয়োজন করিয়া দেয় ॥ ১০।৬২।১০ ॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে যতদিন আর্য্যগণ, কৃষ্ণকায় অনার্য্য বা দস্যু-গণকে বশে আনিতে না পারিত, ততদিন তাহাদিগকে অস্পৃশ্য মনে করিয়া দূরে পরিহার করিত এবং অনার্য্যগণও যতদিন পরাধীনতার জ্বালা ভুলিতে না পারিত, ততদিন বিজয়ী আর্য্যগণকে 'দূরসে দণ্ডবৎ' করিত।

সকাম কর্ম্ম—আর্য্য আদর্শ

আর্য্যগণের প্রবৃত্তিমূলক যজ্ঞ পদ্ধতি ও প্রকৃতির অনুসরণে যে সভ্যতা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহার মুল উৎস হইল ঋগ্বেদের একটি মন্ত্র, যাহা প্রজাপতি ঋষির অনুভূতির উপরে রচিত হইয়াছিল। মন্ত্রে আছে,—

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্‌হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥ ১০।১২৯।৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—সর্ব্ব প্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে সর্ব্ব প্রথম উৎপত্তির কারণ নির্গত হইল। বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধির দ্বারা আপন হৃদয়ে পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক অবিদ্যমান [সূক্ষ্ম] বস্তুতে, বিদ্যমান [স্থূল] বস্তুর উৎপত্তির স্থান নিরুপণ করিলেন।

এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য হইল,—সগুণ ব্রহ্মের মনে সৃষ্টির কামনা হইতেই জগতের সৃষ্টি। এই জন্য জগতও কামনাময় এবং এই কামনাময় জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাণী মাত্রেই কামনার অধীন। শ্রুতিতেও 'আছে,—তিনি [সগুণ ব্রহ্ম] এক ছিলেন, তাঁহার বহু হইবার ইচ্ছা [কামনা] হইল। সেই কামনা হইতেই জীব জগতের উৎপত্তি হইল। শুধু শ্রুতি নয়, অধিকাংশ দর্শন শাস্ত্রের মত হইল,—একোঽহং বহুস্যাম্।

এ প্রসঙ্গে অথর্ব্ব বেদের ঋষি বলিয়াছেন,—

ক ইদম্ কস্মা অদৎ কাম কামায়াদাৎ।

কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহাতা কামঃ সমুদ্রমাবিবেশ ॥ ৩।২৯।৭ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—কে ইহা কাহাকে দিল! কাম কামকে দিল। কাম দাতা কাম প্রতি-গ্রহীতা। কাম [কাম] সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিল।

এখানেও ঋষি বলিতেছেন,—সকলেই কামনার অধীন। দাতাও কামনার অধীন, গ্রহীতাও কামনার অধীন। অনন্ত কাম সমুদ্র হইতেই সকল কামনার উদ্ভব ও অন্তে সমুদয় কামনাই কাম সমুদ্রে অবস্থান করিয়া থাকে। বৈষ্ণব কবিও গাহিয়াছেন,—

তোঁহে জনমি পুন তোঁহে সমাবত,

সাগর লহর সমানা।

সুতরাং যে বেদপন্থী সমাজের মূল সূত্র হইল,—কামনা প্রাণী মাত্রেরই স্বভাব, সেই বেদপন্থী সমাজের প্রার্থনা মন্ত্রের ভাষাও হইল,—দেহি, আর দেহি!

ঋগ্বেদের মন্ত্ররাশির মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ মন্ত্রে ঋষিগণ আর্য্য বর্ণের জন্য উর্বরা ভূমি, গাভী, ধন, সম্পদ, দীর্ঘজীবন, সুন্দরী নারী, বীর্য্যবান পুত্র, শতবর্ষ পরমায়ু এবং দস্যু দমনের জন্য অমোঘ বীর্য্য প্রার্থনা করিয়াছেন। আর প্রার্থনা করিয়াছেন,—

সেই বিদ্যাটি শিখাও মোদের যার বলে অনিবার।
দুহিতে পারিহে ধরণী ধেনুর অফুরন্ত ক্ষীরধার ১ ॥ ১০।১৩৩।৭ ॥

আর্য্যগণের দ্যাবা পৃথিবী দোহন আকাঙ্ক্ষা

জগতকে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শে সুন্দর সাজে সাজাইয়া সম্যকরূপে উপভোগ করিবার কামনা লইয়া উৎকীল ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন,—হে অভিষ্টবর্ষি অগ্নি! তুমি আমাদিগকে বর্দ্ধিত কর, আমাদিগকে অন্ন প্রদান কর, হে দেব! তুমি সুন্দর দীপ্তিদ্বারা শোভমান হইয়া দেবগণের সহিত আমাদের এই দ্যাবা পৃথিবীকে [অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী] দোহন যোগ্য কর। মর্ত্ত্যগণের দুর্ম্মতি যেন আমাদের নিকট আসিতে না পারে ২ ॥ ৩।১৫।৬ ॥

'এই দ্যাবাপৃথিবীকে যাহারা দোহন যোগ্য কর' বলিয়া অগ্নির প্রার্থনা করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান ভারতের হিন্দুগণ কি সেই আর্য্যগণের বংশধর? শুধু ঋগ্বেদের ঋষিগণই যে কর্ম্মকাণ্ড আশ্রয়ী বা যাগ যজ্ঞকারী আর্য্যগণকে সকাম কর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন এমত নহে, জ্ঞান কাণ্ডের ঋষিগণও আর্য্যগণকে সকাম কর্ম্মেরই উপদেশ করিয়াছেন। কর্ম্মকাণ্ড আশ্রয়ীর কামনার বিষয় হইল,—স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত, প্রতিষ্ঠা ও স্বর্গ। এই সকল কামনায় তাহারা যাগ যজ্ঞ করিত। জ্ঞানকাণ্ড আশ্রয়ীর কাম্য

১। এই পদ্যানুবাদ শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত রচিত বেদবাণী হইতে উদ্ধৃত। মূলে আছে,

অস্মভ্যং সু ত্বমিন্দ্র তাং শিক্ষ যা দোহতে প্রতি বরং জরিত্রে।
অচ্ছিদ্রোধ্নী পীপয়দ্যথা নঃ সহস্রধারা পয়সা মহী গৌঃ ॥ ১০।১৩৩।৭ ॥

২। প্রপীপয় বৃষভ জিন্ব বাজানগ্নে ত্বং রোদসী নঃ সুদোঘে।
দেবেভির্দেব সুরুচা রুচানো মা নো মর্ত্তস্য দুর্ম্মতিঃ পরিষ্ঠাৎ ॥ ৩।১৫।৬ ॥

বস্তু হইল,—মুক্তি বা মোক্ষ লাভ। উপায় হইল,—বিচার ও ধৃতি। এই মুক্তিলাভের জন্য কাহাকেও জমি, জরু, পুত্র, বিত্ত ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে দৃষ্ট হয় নাই। অবশ্য গুরুদ্রোহী যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির কথা স্বতন্ত্র।

এই দ্যাবা পৃথিবীকে দোহনযোগ্য করিবার উপায় ছিল যজ্ঞের দ্বারা দেবতার প্রসন্নতা লাভ। অথবা যজ্ঞই ছিল আর্য্যগণের পুত্র, বিত্ত, প্রতিষ্ঠা ও স্বর্গলাভের সেতু এবং পশু মাংসই ছিল যজ্ঞের প্রধান উপকরণ। দেবতার প্রীতি কামনায় নিম্নলিখিত পশুমাংস প্রদানের কথা ঋগ্বেদে লিখিত আছে। যথা,—অশ্বমাংস [১।১৬২।১২], বন্ধ্যা ও গর্ভিণী গাভীর মাংস [২।৭।৫], বৃষমাংস [১০।২৭।২], বলবান বৃষ পুরুষত্ববিহীন মেষ ও বিশুর ঘোটক মাংস [১০।৯১।১৪], মহিষ ও বরাহ মাংস [৮।৭৭।১০]। আর্য্যগণের পক্ষে গো মাংস নিত্য ভক্ষ্য ছিল বলিয়াই ঋগ্বেদে লিখিত আছে,—যেমন গো হত্যা স্থানে গাভী হত হয় [১০। ৮৯।১৪]॥

পশুযাগই একমাত্র শ্রৌত কর্ম্ম *

বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বেদপন্থী সমাজে শ্রৌত কর্ম্ম বলিতে পশুযাগই বুঝাইত। যজ্ঞ যত বিভিন্ন নামে অভিহিত হউক না কেন, যজ্ঞ ফলও যাহাই উক্ত থাকুক না কেন, সকল যজ্ঞেই পশু মাংস ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচিত হইত। এমন কি বেদকে আশ্রয় করিয়া যে সকল গৃহসূত্র রচিত হইয়াছিল, তাহাতেও গো মাংসের ব্যবহারই বেশী দৃষ্ট হইবে। বৈদিক কর্ম্ম—প্রবৃত্তিমূলক বা ফল আকাঙ্ক্ষা। তবুও ইহা বাধ্যতা মূলক ছিল না। যাহার মন ও সামর্থ্য ছিল সে ইচ্ছা হইলে যজ্ঞ করিত, ইচ্ছা না হইলে যজ্ঞ করিত না।

---

* অগ্নিষ্টোম, ২। অত্যগ্নিষ্টোম, ৩। উক্থ্য, ৪। ষোড়শী, ৫। বাজপেয়, ৬। অতিরাত্র, ৭। আপ্তোর্য্যাম—এই সাত প্রকার যজ্ঞকে সোম সংস্থা কহে। ইহাতে পশু মাংস দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

পুরুষ ও নারী ঋষির নাম

প্রথমে আর্য্য ও অনার্য্যের পার্থক্যের কথা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ দস্যুগণও যে বেদপন্থী হইতে পারিত, তাহা দেখান হইয়াছে। তৃতীয়তঃ আর্য্যগণ যে সকল পশুর মাংস গ্রহণ করিত, সে কথারও উল্লেখ করা হইয়াছে। অতঃপর শিক্ষা ও যৌন সম্বন্ধের কথা বলিলেই মোটামুটি আর্য্যবর্ণের ধর্ম্ম ও কর্ম্মের পরিচয় দেওয়া হইবে।

শিক্ষা বিষয়ে—ঋগ্বেদে বিশ্বামিত্র, মধুচ্ছন্দা, বশিষ্ট, ভরদ্বাজ, অত্রি, বামদেব, গৃৎসমদ, কণ্ব প্রমুখ পুরুষ ঋষির রচিত সূক্তের পার্শ্বে রেণু, অপালা, লোমশা, শশ্বতী, ঘোষা, বিশ্ববারা প্রমুখ নারী ঋষিগণের রচিত সূক্ত দৃষ্টে প্রমাণিত হইতেছে,—আর্য্যগণ শিক্ষার আদর এবং স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে বিদ্যার চর্চ্চা করিত।

ঋগ্বেদে যৌন সম্বন্ধের কথা

এইবার যৌন সম্বন্ধের কথা বলিতে হইবে। যৌন বিষয়ে একমাত্র ঋগ্বেদেই বহু পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। এই সকল বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা দেখিয়া প্রতীত হয় যে, যখন যেমন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তখন তেমন মন্ত্র রচিত হইয়া ঋগ্বেদে স্থান লাভ করিয়াছিল। তবুও যদি কেহ বলেন—, ঐ সকল ব্যবস্থা একই সময়ে আর্য্যগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তদুত্তরে আমরা মহাভারতের আদিপর্ব্বস্থিত ১০৪ ও ১২২ অধ্যায় সকলকে পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিব। ঋগ্বেদের উপমা ও মহাভারতের আদিপর্ব্বস্থিত ১০৪ ও ১২২ অধ্যায় দেখিয়া নিঃসন্দেহে ইহাকে পাঁচ স্তরে বিভাগ করা যাইতে পারে।

যৌন সম্বন্ধে ক্রম পরিবর্ত্তন

এই পাঁচ স্তরে বিভাগ যোগ্য যৌন সম্বন্ধের উপমা মধ্যে এমনও শ্রেণীর মন্ত্র রহিয়াছে, যাহা দেখিয়া নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে,—প্রথমাবস্থায় কন্যাগণ চিরদিন 'নিজ গৃহে থাকিত।' পরে বিবাহ প্রথা

প্রবর্ত্তনের সঙ্গে কন্যাগণকে পতির আলয়ে বসবাস করিতে বাধ্য করিল। কন্যাগণ যতদিন পর্য্যন্ত নিজ গৃহে থাকিত, ততদিন নিঃসন্দেহে তাহারাই ওয়ারিস সূত্রে বিষয়ের মালিক হইত। অধিকন্তু নারীগণ নানা কর্ম্ম দ্বারা জীবিকার্জ্জনও করিত। এই জন্য যৌন সম্বন্ধ স্থাপনে নারীই পুরুষকে প্রণয়বার্ত্তা জ্ঞাপন করিত, এবং সন্তানও তাহার জন্মদাতার সমস্ত ব্যয়ভার কন্যাই বহন করিত। প্রাচীন ভারতে সন্তানগণ মাতৃ-নামে পরিচিত হইত *।

যে সময়ে সমাজে বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল, তাহার পর হইতে পতি পত্নী সম্বন্ধ প্রচলিত হইল। পতি শব্দের অর্থ হইল, পালন কর্ত্তা, অর্থাৎ পুরুষ নিজ স্ত্রীপুত্রগণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিবে। সুতরাং বলা যাইতে পারে, এই সময় হইতে পুত্রগণ ওয়ারিস সূত্রে বিষয়ের মালিক হইত, স্বাধীন ভাবে অর্থোপার্জ্জন করিত, সুতরাং বিষয়ের মালিক হইয়া পুরুষ নারীকে প্রণয়বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে সক্ষম হইল, সন্তানগণও পিতৃ নামেই পরিচয় দিতে বাধ্য হইল।

প্রকৃতির নিয়মে স্তন্যপায়ী জীবগণ মধ্যে দেখা যায়, পুত্রার্থে নারীই পুরুষকে বরণ করিয়া থাকে। বিষয়ের স্বামিত্বের মধ্য দিয়া দেখা যায় ওয়ারিস সূত্রে যে বিষয়ের মালিক হয়, সেই ওয়ারিস সূত্রে বঞ্চিতকে প্রণয়বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া থাকে। এই জন্য প্রাচীন ভারতে নারীকেই প্রণয়বার্ত্তা নিবেদন করিতে হইত। পরে পুরুষগণ করিত। অর্থাৎ প্রথমে প্রকৃতির নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কন্যাগণকেই ওয়ারিস সূত্রে বিষয়ের মালিক করা হইয়াছিল। তারপর যে যুগে প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই যুগে কন্যাগণকে বঞ্চিত করিয়া পুত্রগণকেই বিষয়ের স্বামিত্ব প্রদান করা হইয়াছিল।

---

* ১। ঋগ্বেদ, ১০।৮৫।২৭॥ ২। ১০।৮৫।২৪, ২৫, ২৬॥ ৩। ১।১২৬।৭। ৪। বৃহদারণ্যক শ্রুতি, ৬।৪।১, ২, ৩, ৪॥ ঋগ্বেদ, ১।১২৮।৬॥

নারীর কর্ত্তৃত্বে অবাধ যৌন সম্বন্ধ

প্রথম স্তরের কথা:—ঋগ্বেদে কতকগুলি মন্ত্রে পতি পত্নী শব্দ না থাকিয়া রহিয়াছে, নারী ও নর, যুবতী ও যুবক, যোষিৎ ও পুরুষ, প্রণয়-বতী রমণী ও রূপাভিলাষী পুরুষ *। ইহা ছাড়াও এমন একটি মন্ত্র আছে যাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিতেছে,—আর্য্যনারী পুত্রার্থে নিজ কর্ত্তৃত্বে বহু পুরুষ সংসর্গিণী হইত। মূলে আছে,—

তাং পূষঞ্ছিবতমামেরয়স্ব যস্যাবীজং মনুষ্যা বপংতি।

যা ন উরূ উশতী বিশ্রয়াতে যস্যামুশংতঃ প্রহরাম শেপং॥ ১০।৮৫।৩৭

অর্থাৎ, হে পূষা! যে নারীর গর্ভে মনুষ্যগণ বীজ বপন করে তাহাকে তুমি যারপর নাই কল্যাণ সম্পন্না করিয়া পাঠাইয়া দাও ইত্যাদি কথার মধ্যে নারীর কথা এক বচনে ও পুরুষের কথা বহুবচনে প্রয়োগ থাকায় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে, যখন ঐ মন্ত্র রচিত হইয়াছিল, তখন পুত্রার্থে নারী বহু পুরুষ সংসর্গিণী হইত।

নারীর বহু পতি

দ্বিতীয় স্তরের কথা:—এই স্তরে নূতন 'জায়া' ও 'পতি' শব্দ সৃষ্ট হইল। জায়া শব্দের অর্থ হইল,—গৃহ ও পুরুষস্য মিশ্রণস্থানং [৩।৫৩।৪, সায়ন]। পতি শব্দের অর্থ হইল,—রক্ষা কর্ত্তা। অর্থাৎ এই সময় পতির পক্ষে জায়া লাভ অর্থ,—পতিকে ঘর জামাই থাকিতে হইত এবং জায়ার রক্ষা কর্ত্তা হইয়া তাহার সমস্ত বিষয় রক্ষা করিতে হইত। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্র আছে, "হে অগ্নি! * * * তুলি সন্তানসন্ততি

* ঋগ্বেদ, ১।১১৫।২, ১।১২৬।৬, ২।৩৫।৪, ৩।৩০।১০, ৩।৩৭।৪, ৬।৬২।৭, ৮।৩৫।৫, ৮।৬০।৯, ৯।৯৬।২২, ১০।৩০।৬॥

সমেত জায়াকে পতিদিগের নিকট সমর্পণ করিলে [১০।৮৫।৩৮]।" এই মন্ত্রে প্রকাশ আছে যে, সন্তানসন্ততি সমেত জায়া বহুপতির দ্বারা রক্ষিত হইত। অর্থাৎ তখন জায়াই নিজ সন্তানগণকে ও পতিদিগকে খাইতে দিত। অবস্থা দেখিয়া মনে হইবে, তখন কন্যা পরম্পরা বিষয়ের মালিক হইত।

নারীর কর্ত্তৃত্বে বর নির্ব্বাচন

তৃতীয় স্তরের কথা :—এই স্তরে 'বর' ও 'বধূ' নামে দুইটি নূতন শব্দের সৃষ্টি হইল। এই সময় কন্যা স্বয়ম্বর প্রথায় মাত্র এক পুরুষকে বরণ করিত। অবস্থা দেখিয়া মনে হইবে, তখন জায়ার পক্ষে সন্তানসহ বহু পতি পালন দুঃসাধ্য ছিল ॥ ১০।২৭।১২ ॥

পুরুষের পছন্দে স্ত্রী নির্ব্বাচন

চতুর্থ স্তরের কথা :—এই স্তরে 'বেনা' নামক প্রথার প্রচলন হইল। এই প্রথায় বর পক্ষ হইতে কন্যা পছন্দ করিবার রীতি প্রচলিত হইল *।

প্রথম হইতে চতুর্থ স্তর পর্য্যন্ত নারী নিজ গৃহে বাস করিত, পতিকে জায়া গৃহে 'ঘর জামাই' থাকিতে হইত।

বিবাহ

পঞ্চম স্তরের কথা :—এই স্তরে ঋগ্বেদে অনেক নূতন শব্দ যুক্ত হইল। যেমন 'বিবিদে' বা বিবাহ, বিধবা, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, ননদ, দেবর প্রভৃতি। এই সময় হইতে পত্নীকে পতিগৃহে থাকিতে হইত। পুত্র বিষয়ের মালিক ও সন্তানগণ পিতৃ নামে পরিচিত হইত।

---

* ঋগ্বেদে---বেনা শব্দ ১।৩৪।২, ১।৫৬।২, ৯।৬৪।২১, ৯।৮৫।১০ ও ১১ মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। আচার্য্য সায়ন বেনা শব্দের অর্থ বলিয়াছেন,---কান্তাস্ত্রিয়ঃ কাময়মানা।

নারীর সকল অবস্থায় পুরুষগ্রহণ প্রথা প্রচলিত ছিল

বিবাহের পূর্ব্বে নারীর নাম হইল,—কন্যা। পতির মৃত্যু হইলে,—বিধবা। পতিগৃহে গমন উপলক্ষ্য করিয়া,—শ্বশুর, শ্বশ্রূ, ননদ, দেবর প্রভৃতি সম্পর্কমূলক শব্দ। শেষ উপপতি, উপপত্নী, জার, পত্নীশোধন প্রভৃতি শব্দেরও উদ্ভব হইল। যথা:—

(ক) যেমন কন্যা জারকে আহ্বান করে ॥ ৯।৫৬।৩ ॥

(খ) এই সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করিয়া মনোমত পতিলাভ করিয়া অঞ্জন ও ঘৃতের সহিত গৃহে প্রবেশ করুন। এই সকল বধূ অশ্রুপাত না করিয়া, রোগে কাতর না হইয়া, উত্তম উত্তম রত্ন ধারণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে গৃহে আগমন করুন ॥ ১০।১৮।৭ ॥

(গ) [হে বধূ] তুমি শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব কর, শ্বশ্রূকে বশ কর, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাটের ন্যায় হও ॥ ১০।৮৫।৪৬ ॥

(ঘ) হে নারি! যে রাক্ষস তোমার ভ্রাতা, পতি বা উপপতির মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তোমার নিকট গমন করে, তোমার গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে এইস্থান হইতে দূরীভূত [১০।১৬২।] করি। এই ঋকৃটি প্রতি গর্ভবতী নারীকে শুনাইতে হইত।

(ঙ) পতি যেমন পত্নীকে শোধন করে [৭।২৬।৩]। এই শোধন করিবার প্রথা সেই সময়েই রচিত হইয়াছিল, যখন আর্য্যনারীর পক্ষে বহু পুরুষ সংসর্গ দোষাবহ বিবেচিত হইয়াছিল। পত্নী শোধন ব্যবস্থা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবে হিন্দু সমাজে গৃহীত হইয়াছিল। সে কথা পরে প্রমাণিত হইবে।

ঋগ্বেদের অধিকাংশ যৌন মন্ত্রেই নারীর কর্ত্তৃত্ব এবং অল্প কয়েকটি মন্ত্রে পুরুষের কর্ত্তৃত্বের কথা আছে। নারীর কর্ত্তৃত্বের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এইবার পুরুষের কর্ত্তৃত্বের কথা বলিতে হইবে।:—

(চ) লম্পট যেমন নির্ভয়ে বন্ধুর প্রণয়িনীর সহবাস করে॥ ৯।৯৬।২২॥

(ছ) প্রজাবান্ ঋষি বলিতেছেন,—আমি নিজ স্ত্রী ব্যতীত অন্যের স্ত্রীর গর্ভেও পুত্রোৎপাদন করিয়াছি॥ ১০।১৮৩।৩॥

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে ঋগ্বেদের বিপরীত ব্যবস্থা

কিন্তু বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে যে মন্ত্রদ্বয় পুরুষকে পুষ্পমতী কন্যা দেখিলেই মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া, কিম্বা অলঙ্কারের লোভ দেখাইয়া অথবা হস্ত কিম্বা যষ্টির দ্বারা তাড়না করিয়া পুত্রার্থে উপগত হইতে বলিয়াছে [(৬।৪।৬), (৬।৪।৭)], ঐ মন্ত্রদ্বয় এবং এই শ্রুতিতে জন্ম শাসন [৬।৪।১০], উপপতি উচাটন [৬।৪।১২] মন্ত্র যে সময় রচিত হইয়াছিল, তখন যৌন সম্বন্ধ প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে পুরুষের কর্ত্তৃত্ব সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল জানিতে হইবে।

বৈদিক ধর্ম্ম প্রবৃত্তিমূলক, বৌদ্ধধর্ম্ম নিবৃত্তিমূলক

শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন,—বৈদিক ধর্ম্ম প্রবৃত্তিমূলক এবং যৌন বিষয়ে আর্য্যগণ অনেকাংশে প্রকৃতির অনুসরণকারী। বৌদ্ধধর্ম্ম নিবৃত্তি মূলক এবং সকল বিষয়ে বা সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারী। বৈদিক ধর্ম্ম মানবকে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের মধ্য দিয়া স্বর্গ এবং অনাসক্তি দ্বারা মোক্ষলাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।* বৌদ্ধধর্ম্ম রূপ, রসাদির বিরুদ্ধচারণ করিয়া নির্ব্বাণ লাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং বৈদিক ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভেদটা আকাশ পাতালের ন্যায় তফাৎ হইল।

---

* অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ গীতা, ৬।১॥

মহাভারতের আদি-পর্ব্বের ১০৪ ও ১২২ অধ্যায় দেখিয়া ও তৎসঙ্গে ঋগ্বেদের উপমা পাঠ করিয়া নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে,—আর্য্য জন-সাধারণ মধ্যে যাহাদের ভাগ্যে জায়া লাভ হইত, তাহারা "ঘর জামাই" থাকিত, রাজা রাজরারা পত্নী লইয়া ঘর করিতেন। বৌদ্ধ যুগে এই রাজধর্ম্মই সমাজে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল এবং তদবধি হিন্দু সমাজে যৌন বিষয়ে পুরুষের কর্তৃত্বই চলিতেছে। ১

বৈদিক ধর্ম্ম সত্যকে স্বীকার করিবার মত সাহস রাখিত এবং মানব মনের প্রবৃত্তিকে স্বভাব বলিয়া মনে করিত। এই জন্য দেখা যায় ঋগ্বেদের ঋষিগণ সতী অসতী নির্ণয় করিতে অযথা শ্রম স্বীকার করেন নাই। অথবা সতীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ও অসতীর নিন্দায় শতমুখ হন নাই। ঋষিগণ জানিতেন,—নারীর জন্ম হইয়াছে নিজ নিজ পছন্দ মত পুরুষ সহযোগে সন্তানের জননী হইবার জন্য।

মহাভারতে যৌন কাহিনী

ঋগ্বেদের উপমার মধ্য দিয়া যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, মহাভারতের কাহিনীর মধ্যেও সেই কথাগুলি লিখিত আছে ঃ—

১। বৈশম্পায়ন কহিলেন,—* * * পূর্ব্বকালে মহিলাগণ অনাবৃত [অপর্দ্দানশীন] ছিল। তাহারা ইচ্ছামত গমন ও বিহার করিতে পারিত। তাহাদিগকে কাহারও অধীনতায় কালক্ষেপ করিতে

১। উপরোক্ত যৌন সম্বন্ধে বৈদিক প্রমাণ দৃষ্টে মনে হয়, যে যুগ হইতে কন্যার যৌন বিষয়ে স্বাধীনতা খর্ব্ব হইয়াছিল, সেই সময় হইতে নারীজাতির পক্ষে বেদ-পাঠও নিষিদ্ধ হইয়াছিল। পাছে এই সকল উপমা ও কাহিনী পাঠ করিয়া তাহারা বৈদিক সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট থাকে। আর শূদ্রের পক্ষে যে বেদপাঠ নিষিদ্ধ হইয়াছিল, তাহার হেতুও মনে হয়,—যাহাতে এই অবাধ যৌন সম্বন্ধের কথা শূদ্রগণ জানিতে না পারে। অর্থাৎ —"নেটিভ পাছে সন্ধান আমাদের জেনানা। দেহে প্রাণ বিবিজান কখন তা হবেনা॥"

হইত না। কৌমারাবধি পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে আসক্ত হইলেও তাহাদের অধর্ম্ম হইত না॥ আদিপর্ব্ব,, ১২২ অধ্যায়॥ ইহাই হইল প্রথম স্তরের কথা।

২। নারীর বহু পতি প্রসঙ্গে জটিলা, বাক্ষী ও দ্রৌপদীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সে দিনে যে ক্ষেত্রে পুরুষ একা স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ করিতে সক্ষম ছিল না, সেখানে ঐরূপ বহু পতি-প্রথা গৃহীত হইত। যুধিষ্ঠিরাদি যখন দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা রাজকুমার হইয়াও দরিদ্র বনবাসী ছিলেন॥ আদি পর্ব্ব, ১৯৬, ১৯৮ অধ্যায়॥

৩। স্বয়ম্বর প্রথা প্রসঙ্গে মহাভারতের উল্লেখ যোগ্য বহু কাহিনী উক্ত আছে।

৪। বেনা প্রথায় কন্যা পছন্দ করা প্রসঙ্গেও বহু কাহিনী মহাভারতে ব্যক্ত আছে।

বিবাহ বা পাণি-গ্রহণ প্রসঙ্গে বহু কাহিনী এবং স্ত্রী জাতি সম্বন্ধে কতগুলি বিধি নিষেধও মহাভারতে লিখিত আছে।ঃ—

(ক) বৈশম্পায়ন কহিলেন, বেদবিদ্ মহাত্মারা কহিয়া গিয়াছেন, ঋতুকালে [প্রথম ষোড়শ দিবস] পতি পরিত্যাগ করিয়া পুরুষান্তর গ্রহণ করিলে স্ত্রীদিগের অধর্ম্ম হয়, কিন্তু অন্য সময় [অবশিষ্ট দ্বাদশ দিবস] তাহারা (নারীগণ) যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারে, তাহাতে তাহাদের কোন পাপ নাই॥ আদিপর্ব্ব, ১২২ অধ্যায়॥

উপরোক্ত কথা যখন সমাজে প্রচলিত ছিল, তখনও কন্যার প্রাধান্য ছিল। তবে ঐ ব্যবস্থার মধ্যে একটা বড় অর্থ নৈতিক কথাও যে না ছিল, এমত নহে। কথাটা হইল, কোন স্বামী নিজ স্ত্রীর গর্ভে অপরের ঔরসজাত সন্তানের ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত ছিল না বলিয়াই প্রথম

ষোড়শ দিবস অর্থাৎ যে সময়ে সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা, সেই সময় নারীকে পতির অধীনে থাকিতে বলা হইয়াছে। বাকী সময় স্ত্রী যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে এই অধিকারও স্ত্রীকে দেওয়া হইয়াছে। পরে এই যথেচ্ছ ব্যবহার যখন সমাজে বন্ধ হইয়া গেল, তখন নূতন করিয়া উদ্দালক উপাখ্যান মহাভারতে যুক্ত হইল ।:—

শ্বেতকেতুর বলপূর্ব্বক নিয়ম স্থাপন—অসম্ভব কথা

(খ) পূর্ব্বকালে উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। একদা তিন পিতামাতার নিকট বসিয়া আছেন,— এমন সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাহার জননীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—'আইস আমরা যাই।' ঋষি কুমার পিতার সমক্ষে মাতাকে লইয়া যাইতে দেখিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। মহর্ষি উদ্দালক পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন,—বৎস! ক্রোধ করিও না, ইহাই সনাতন (নিত্য) ধর্ম্ম। গাভীগণের ন্যায় স্ত্রীগণও স্বজাতীয় শত-সহস্র পুরুষে আসক্ত হইলেও উহারা অধর্ম্ম-লিপ্ত হয় না। ঋষিপুত্র পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, প্রত্যুত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া মনুষ্যমধ্যে বলপূর্ব্বক এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন যে,—অদ্যাবধি যে স্ত্রী পতি ভিন্ন পুরুষান্তর সংসর্গ করিবে এবং যে পুরুষ স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, ইহারা উভয়ে ভ্রূণ হত্যা সদৃশ ঘোরতর পাপ-পঙ্কে লিপ্ত হইবে। আর স্বামী পুত্রোৎপাদনার্থে নিয়োগ করিলে যে স্ত্রী স্বামী আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে, তাহারও ঐ পাপ হইবে॥ আদি পর্ব্ব, ১২২ অধ্যায়॥

কন্যা শব্দের অর্থ

এই প্রকার কাহিনী নিতান্ত বালক বা কোমলমস্তিষ্ক ব্যক্তি ভিন্ন

কেহ বিশ্বাস করিবে কি না, সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। পূর্ব্বে বৈশম্পায়ন যাহা বলিয়াছেন.—'গাভীগণের ন্যায় স্ত্রীগণও স্বজাতীয় শত-সহস্র পুরুষে আসক্ত হইলেও উহারা অধর্ম্মে লিপ্ত হয় না,' শান্তিপর্ব্বে ব্যাসদেব বলিয়াছেন,—"অভিযাচিত হইয়া পরস্ত্রী সম্ভোগ করিলে পাপভাগী হয় না," * অভিযাচিত না হইয়াও ঋষি পরাশর কুমারী কন্যা গমন করিয়াও পাপী হন নাই *। আর সূর্য্যদেবও কুন্তীকে বলিয়াছিলেন,—"নারীগণ যাহাকে ইচ্ছা কামনা করিতে পারে বলিয়াই তাহাদিগকে কন্যা কহে"* এমন সমাজে এক চ্যাঙ্গরা ঋষি কুমার বলপূর্ব্বক নিয়ম স্থাপন করিয়া দিলেন আর সমাজ তাহা মানিয়া লইল? আসল কথা হইল, বৌদ্ধ রাজগণের শাসন, সে কথা স্বীকার করিতে শাস্ত্রকারগণ বড়ই নারাজ।

যৌন সম্বন্ধের ক্রমপরিবর্ত্তন

প্রথমে কন্যাগণ পুরুষ হইতে পুরুষান্তর আশ্রয় করিতে পারিত। পরে কন্যার বহু স্বামী হইল। ইহার পরে এক স্বামী হইলেও ঋতুকালে স্ত্রী স্বামীর অধীনে ও বাকী সময় স্বেচ্ছাচার ভাবে পুরুষান্তর গ্রহণ প্রচলিত ছিল। তারপর সক্ষম স্বামীর স্ত্রীর পক্ষে পুরুষান্তর গ্রহণ নিষিদ্ধ হইল। অক্ষম স্বামীর আদেশে স্ত্রী, নিয়োগ প্রথায় পুত্র লাভ করিবার অধিকারিণী রহিল। অতঃপর নিয়োগ প্রথা এবং বিধবা বিবাহ যখন নিষিদ্ধ হইয়া গেল, তখন মহাভারতে ঋষি দীর্ঘতমার নামে এক কাব্যের সৃষ্টি হইল। মহাভারতে লিখিত আছে—"দীর্ঘতমা ঋষি কহিলেন—আমি অদ্যাবধি পৃথিবীতে এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলাম যে,—

(ক) স্ত্রীজাতিকে যাবজ্জীবন একমাত্র পতির অধীন হইয়া কাল-

---

* ১। শান্তি-পর্ব্ব, ৩৪ অধ্যায় ॥ ২। আদি-পর্ব্ব, ৬৩ অধ্যায় ॥ ৩। বন-পর্ব্ব, ৩০ অধ্যায় ॥

যাপন করিতে হইবে। পতি জীবিত থাকিতে অথবা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে নারী যদি পুরুষান্তর ভজনা করে, তাহা হইলে অবশ্যই পতিত হইবে, সন্দেহ নাই।*

(খ) আর পতিবিহীনা নারীগণের সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধি থাকিলেও তাহা ভোগ করিতে পারিবে না। বিষয় ভোগ করিলে বিধবার অকীর্ত্তি ও পরিবাদের সীমা থাকিবে না॥ আদি-পর্ব্ব, ১০৪ অধ্যায়॥ ইহাই হইল মোটামুটি যৌন সম্বন্ধের ক্রম পরিবর্ত্তনের ইতিহাস।

যৌন সম্বন্ধ বিষয়ে ঋষি-কুমার শ্বেতকেতুর 'নিয়ম প্রবর্ত্তন' সম্বন্ধে প্রতিবাদে যাহা বলিবার তাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এক্ষণে দীর্ঘতমা ঋষির 'নিয়ম প্রবর্ত্তন' সম্বন্ধে মহাভারত অবলম্বনে কিছু বলা প্রয়োজন। অন্যথায় পাঠকগণ ভাবিবেন—দীর্ঘতমা উপাখ্যানটি পরম সত্য।

দীর্ঘতমার কাহিনী—এক কাব্য

মহাভারতে লিখিত আছে,—দীর্ঘতমা তাঁহার স্ত্রীর কথায় নারী-জাতিকে শাসন করিবার জন্য ঐ প্রকার নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহাতে ঋষি-পত্নী পুত্রদিগকে আদেশ করায়, পুত্রগণ দীর্ঘতমাকে বাঁধিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দেন। সেই সময় বলীরাজা গঙ্গা পথে যাইতে যাইতে একটি মানুষকে জলে ভাসিতে দেখিয়া নৌকায় তুলিয়া লন। ইহার পরে তিনি ঋষিসহ রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন এবং নিঃসন্তান বলী-

---

* 'কলির বেদ' পরাশর সংহিতায় ক্ষেত্রজ পুত্রের প্রশংসা আছে (৪।১৯) আর আছে,—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥৪।২৬॥

সর্ব্বশেষ আছে, —রজসা শুধ্যতে নারী বিকলং যদি গচ্ছতি ॥৭।৪॥

রাজা রাজ্ঞীকে আদেশ করিলেন, ঋষি হইতে পুত্র লাভ কর। রাজ্ঞী ঋষিকে বৃদ্ধ দেখিয়া স্বয়ং না যাইয়া দাসীকে পাঠাইয়া দিলেন। দাসীর গর্ভে ঋষি এগারটি সন্তান লাভ করিলেন। তন্মধ্যে ঋগ্বেদের ঋষি কক্ষীবান্‌ও একজন। ইহার পরে রাজা সমস্ত ঘটনা জ্ঞাত হইয়া রাণীকে পুনরায় আদেশ করিলেন। ঋষি রাণীর অঙ্গ স্পর্শ করায় রাজা পাঁচটি পুত্র লাভ করিলেন। *

রাজা যযাতির পাঁচ পুত্র। বলীরাজা যযাতির পুত্র অনুর বংশে উনিশ পুরুষ পরে জন্মিয়াছিলেন। ঋষি দীর্ঘতমাকে বলীরাজার সম সাময়িক ও বৃদ্ধ বলা হইয়াছে. ইহা কিন্তু সত্য নহে।

দীর্ঘতমা নিজের নিয়ম প্রথমে নিজেই ভাঙ্গিয়াছেন

প্রথমতঃ মহাভারতে দেখা যাইতেছে,—ঋষি দীর্ঘতমা যে নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই ধাত্রী ও রাজ্ঞী সহবাসে ষোড়শ সন্তান উৎপাদন করিয়া ভঙ্গ করিয়াছেন। নিজে নিয়ম করিয়া নিজেই যেখানে প্রথম নিয়ম ভঙ্গকারী, সেই ঋষিবাক্য যে বেদপন্থী সমাজ আমল দেন নাই, তাহাই এখন দেখাইতে হইবে।

বংশাবলীতে দেখা যায়,—মনু-পুত্র ইলা, ইলা-পুত্র পুরুরবা, পুরুরবার পুত্র আয়ু, আয়ুর পুত্র মধ্যে নহুষ ও বিতথ, নহুষ পুত্র যযাতি, বিতথ-পুত্র দীর্ঘতমা। দীর্ঘতমা হইতে বলীরাজা আট পুরুষ নিম্নে। আট পুরুষ পূর্ব্বের লোক দ্বারা বলী-রাজ-মহিষীর গর্ভে পাঁচ পুত্রের উদ্ভব একেবারেই অসম্ভব। বলীরাজ হইতে

* মহাভারতে লিখিত আছে,—ঋষিদিগেরও এমন শক্তি নাই যে স্ত্রী ব্যতিরেকে প্রজা সৃষ্টি করিতে পারেন॥ আদি-পর্ব্ব, ৭৪ অধ্যায়॥

বিচিত্রবীর্য্য প্রায় ষোল ও পাণ্ডু সতের পুরুষ নিয়ে। সুতরাং সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে,—ঋষি দীর্ঘতমা পরাশর, ব্যাস, শ্রীকৃষ্ণ, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতির অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী কালের লোক। মহাভারতে আছে,—ব্যাসদেবের নিয়োগে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম। বিধবা রাণীতে যখন ব্যাসদেবের নিয়োগ হইয়াছিল, তখন দীর্ঘতমার নিয়ম প্রতিষ্ঠিত থাকিলে রাণী সত্যবতীও অমন কথা পুত্র ব্যাসকে বলিতেন না, ব্যাসদেবও নিয়োগে নিযুক্ত হইতে সম্মত হইতেন না। তারপর পাণ্ডু-রাজার আদেশে কুন্তী ও মাদ্রী পরপুরুষ সহায়ে যে সন্তান লাভ করিলেন, তাহাও কখনও সম্ভব হইত না। শ্রীকৃষ্ণ [হরিবংশ দ্রষ্টব্য] কদাচ নরকাসুরের পুরী হইতে আনীত নারীগণেব সহবাস করিতে পারিতেন না। অথবা কর্ণকেও শ্রীকৃষ্ণ বলিতে পারিতেন না, দিবসের ষষ্ঠ ভাগে দ্রৌপদী তোমার হইবে। ভীম কদাচ পরস্ত্রী গ্রহণ করিতেন না, অর্জ্জুনও বিধবাতে পুত্রোৎপাদন করিতেন না। সুতরাং কাহিনীটি খুব জমকাল হইলেও বিচারে ইহাকে প্রক্ষিপ্ত ভিন্ন সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

এ পর্য্যন্ত বৈদিক ধর্ম্ম ও আর্য্য সভ্যতার মোটামুটি বিষয়গুলি সংক্ষেপে বলা হইল, এইবার মহাভারতের কথা বলিতে হইবে। ঋগ্বেদ যেমন আর্য্যবর্ণের ইতিবৃত্ত, মহাভারত তেমনই ক্ষত্রিয় ও মহর্ষিগণের ইতিহাস। ঋগ্বেদ আকারে ক্ষুদ্র, মহাভারত আকারে অনেক বড়। কিন্তু যে আর্য্যবর্ণের কথায় ঋগ্বেদ মুখরিত, মহাভারতে সে আর্য্যবর্ণের কোন কথাই নাই। অথচ যাঁহাদের লইয়া মহাভারত রচিত, ঋগ্বেদে তাঁহারা আর্য্য নামে পরিচিত, আর মহাভারতে তাহারাই কিন্তু ক্ষত্রিয় নামে কীর্ত্তিত।

ঋগ্বেদের আর্য্যই মহাভারতের ক্ষত্রিয় বর্ণ

যে বিবস্বান-পুত্র মনু ঋষির কথা ঋগ্বেদে রহিয়াছে,—সেই আর্য্য মনু ঋষিকে মহাভারতে রাজর্ষি মনু বলা হইয়াছে ও এই মনু রাজর্ষিকেই শাস্ত্রগ্রন্থে প্রথম মানব বলা হইয়াছে। এবং এই মনুর পুত্র পৌত্রাদিকে ক্ষত্রিয় রাজা বলিয়াই ঘোষণা করা হইয়াছে। এই ঋগ্বেদ মধ্যে 'নহুষের সন্তান', 'পুরু বংশীয়গণ', 'শান্তনু', 'মুদ্গল', 'ত্রসদস্যু', 'তুর্ব্বশ', 'যদু', 'দ্রুহ্য', 'অনু' প্রভৃতি আর্য্যগণকে মহাভারতে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা বলা হইয়াছে। ইক্ষ্বাকু, ক্ষেত্রপতি মান্ধাতাকে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় নরপতি স্বীকার করা হইয়াছে। তারপর যে বিশ্বামিত্র ঋগ্বেদে গায়ত্রী মন্ত্রের ঋষিরূপে বিদ্যমান আছেন, সেই বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, বামদেব, অগস্ত্য, কণ্ব, ভরদ্বাজ, আঙ্গিরা, অত্রি, গৃৎসমদ প্রভৃতি আর্য্য ঋষিগণকে মহাভারতে মহর্ষি নামে, না আর্য্য, না ক্ষত্রিয় এবং পৃথক ঋষিবংশ রূপে দেখান হইয়াছে।

দেবতার সংখ্যা ও যজ্ঞীয় পশুর নাম

ঋগ্বেদে আর্য্যগণ যে তেত্রিশ দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করিত, ক্ষত্রিয়গণও সেই তেত্রিশ দেবতাকে ত্রিভুবনের ঈশ্বর স্বীকার করিয়া, সেই সকল যজ্ঞে সেই সকল পশুমাংস প্রদান করিয়াছেন, যাহা আর্য্যগণ

---

* বিবস্বান পুত্র মনু হইতে মনুষ্যগণের উৎপত্তি, এই নিমিত্ত তাহারা মানব নামে খ্যাত। আদিপর্ব্ব, ৭৫ অধ্যায়।

করিত * । সেই অবাধ ও সাময়িক নিষ্ঠাযুক্ত যৌন সম্বন্ধ, সেই গো, মহিষ বরাহ মাংস [শ্রাদ্ধে] ভক্ষণ করিত। *

দ্বিতীয় স্তরে—মহাভারতের মূল বর্ণ—ক্ষত্রিয়

মহাভারতে—মূলবর্ণ ক্ষত্রিয়। এই ক্ষত্রিয়বর্ণ হইতে পরে গুণ ও কর্ম্ম পার্থক্যে প্রথমে বৈশ্য, পরে শূদ্র ও সর্ব্ব শেষ ব্রাহ্মণ বর্ণ উদ্ভূত হইয়াছিল। বংশাবলী দৃষ্টেও উপরোক্ত কথাই সমর্থিত হইবে।

ঋগ্বেদের আর্য্য ও মহাভারতের ক্ষত্রিয় এবং মহর্ষিদের ধর্ম্ম কর্ম্ম, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি একরূপই দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু মহাভারতে লিখিত আছে,—মহর্ষি বশিষ্ঠের বংশের সহিত অনার্য্য কন্যাগণের যৌন সম্বন্ধ পুরুষানুক্রমে স্থাপিত হইয়াছিল। এইরূপ যৌন সম্বন্ধের কোন নজীর বা নিদর্শন বেদে দৃষ্ট হয় না। *

পুরাণে যে সকল বংশাবলীর কথা ও রাজাগণের রাজত্বের বিবরণী রহিয়াছে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এবং নানা তাম্রশাসন ও প্রস্তরে খোদিত তথ্য সহায়ে ভারতের যে ইতিহাস রচিত হইয়াছে, এইবার সেই ইতিহাসের কথা কিছু বলা প্রয়োজন। অন্যথায় বক্তব্য বিষয় ঠিক ধারাবাহিক ভাবে বলা হইবে না।

---

* অনুশাসন পর্ব্ব, ১১৯ অধ্যায়॥ * অশ্বমেধ যজ্ঞ (রাজসূয়), সভাপর্ব্ব ৪৪ অধ্যায় ; যুধিষ্ঠিরের গোমেধ যজ্ঞের কথা, বনপর্ব্ব, ৬৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

* শ্রাদ্ধে গো, মহিষ, বরাহ মাংস প্রদানের কথা অনুশাসন পর্ব্ব, ১০৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৫। শাস্ত্রে বশিষ্ঠকে বেশ্যাপুত্র বলা হইয়াছে। সেই বশিষ্ঠ অক্ষমালা নামে এক অনার্য্য কন্যার সহবাসে মহর্ষি শক্তিকে লাভ করেন। শক্তি অনার্য্য শ্বপাক কন্যার সহবাসে মহর্ষি পরাশরকে প্রাপ্ত হন। পরাশর অনার্য্য দাস রাজের কন্যার সহবাসে ব্যাসদেবকে লাভ করেন, ব্যাসদেব অনার্য্যা কন্যা শুকীর সহবাসে পরম ভাগবত শুকদেবকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন।

আৰ্য্য ও ক্ষত্রিয় বর্ণের আচার ব্যবহার

বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভারতীয় যুগেরও অনেক শতাব্দীর পর পর্য্যন্ত বেদপন্থী সমাজে [আর্য্যই হউক আর ক্ষত্রিয়ই থাকুক] তেত্রিশ দেবতার উদ্দেশে পশু যাগ,—অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ, গাভী, বৃষ, অশ্ব, মহিষ, বরাহ প্রভৃতি পশুর মাংস ভক্ষণ, মদ্যপান, অবাধ ও সাময়িক সীমাবদ্ধ যৌন সম্বন্ধ, কুমারীর পুত্র লাভ, সধবার উপপতি আশ্রয়, বিধবার পুরুষ আশ্রয় বা দেবরের দ্বারা সুতোৎপাদন, মধুপর্কে গাভী বা বৃষ বধ, নিত্য বেদ অধ্যয়ন ও অগ্নি-রক্ষণ—এই সকল কর্ম্ম বৈধ বলিয়া প্রচলিত ছিল। পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখানেও বলিয়া রাখা বিধেয় যে বেদপন্থী সমাজ প্রকৃতির নিয়ম যথা সম্ভব অনুসরণ করিত, প্রবৃত্তি বশে আহার, বিহার করিত। স্বধর্ম্ম বা নিজ প্রকৃতি অনুসারে জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত বেদপাঠ হইতে জুতা সেলাইয়ের কাজে আর্য্যগণ আত্মনিয়োগ করিত, ইহাতে দোষ বা পাপ কিছুই ছিল না।

বুদ্ধদেবের শিক্ষাবাদ

১। 'জীব হিংসা করিও না।' এতদ্দ্বারা বৌদ্ধ রাজগণের আদেশে দেশ হইতে বৈদিক পশুযাগ লোপ পাইল ও তৎস্থলে,—অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শ পৌর্ণমাস, আগ্রয়ণ, চাতুর্ম্মাস্য, পশু বন্ধ সৌত্রামণি—এই সাত প্রকার হবি সংস্থা যাগ নূতন করিয়া প্রবর্ত্তিত হইল।

২। 'চুরি করিও না'। এতদ্দ্বারা বৌদ্ধ রাজগণের আদেশে অনার্য্যগণের গাভী, বিত্ত লুট করিয়া লওয়া বন্ধ হইয়া গেল।

৩। 'ব্যভিচার করিও না।' ব্যভিচারের সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইল,—পতিপত্নী সহবাস ভিন্ন অন্য নরনারীর সংমিশ্রণ। বৌদ্ধ রাজশক্তির চাপে পড়িয়া বৌদ্ধ ও বেদপন্থী সমাজকে আপন বৈশিষ্ট্যানুযায়ী বিবাহ নামক সংস্কার গ্রহণ করিতে হইল এবং অবাধ ও সাময়িক সীমাবদ্ধ যৌন সম্বন্ধের স্থলে অনেকটা স্থায়ী [যেহেতু বৌদ্ধ ও বেদপন্থিগণ মধ্যে পত্নী-ত্যাগ প্রথা এবং সেই পতি পরিত্যক্তা পত্নীর পক্ষে অন্য পুরুষ গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা থাকায়] ভাবের বিবাহ প্রচলিত হইল। ইহাতে দেবরের দ্বারা সুতোৎপাদন ব্যবস্থার মর্য্যাদাও ক্ষুণ্ণ হইয়া গেল।

৪। 'মিথ্যা কথা বলিও না।' খুব সম্ভব মানব রচিত দেবতার কথা, দেবতার আদেশ এই সকল লক্ষ্য করিয়াই এই ব্যবস্থাটি হইয়া থাকিবে। যেমন ঋগ্বেদে আছে, আমি ইন্দ্র, দস্যুগণকে নিধন করিয়া, নিজ মিত্র আর্য্যকে পৃথিবী দান করিয়াছি ॥ ৪।২৬।২ ॥

যেমন ইন্দ্র কহিয়াছেন,—স্ত্রীর মন দুঃশাস্য, স্ত্রীর ক্রতু লঘু ॥৮।৩৩।১৭॥

৫। 'মদ্যপান করিও না।' এই ব্যবস্থা দ্বারা আর্য্যগণের অতিপ্রিয় সোমরস পান বন্ধ করিতে বৌদ্ধ রাজশক্তি বেদপন্থী সমাজকে বাধ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সত্য কথা শাস্ত্রকারগণ লিখিতে সাহস না করিয়া শুক্রাচার্য্যের নামে মদের সহিত শিষ্য কচকে ভক্ষণ করার কাহিনী এবং শুক্রাচার্য্যের আদেশে সমাজ হইতে মদ্য পান নিষিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া এক রংদার গল্পের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পরে ব্রাহ্মণের প্রসাদে সমাজও তাহাই বিশ্বাস করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল।

৬। 'অনিয়মিত সময়ে আহার করিবে না।'

৭। 'সাংসারিক আমোদ প্রমোদে যোগদান করিবে না।

৮। 'বিলাস দ্রব্য ব্যবহার করিবে না।' আর্য্যরাজগণ ভারতের উপর আধিপত্য বিস্তার করতঃ অনার্য্যগণকে লুণ্ঠন করিয়া অতি মাত্রায় ধনী হইয়া বিলাস ব্যাসনে যে মাতিয়াছিল ইহা ধ্রুব সত্য। বোধ হয়

সেইদিকে লক্ষ্য করিয়াই বুদ্ধদেব এই ব্যবস্থা প্রচার করিয়া থাকিবেন। অর্থাৎ বেদপন্থী সমাজের সমস্ত কার্য্যগুলিই যে দোষাবহ তাহা দেখাই-তেই যেন বুদ্ধদেব অতি মাত্রায় ব্যগ্র ছিলেন।

৯। 'সাজ-সজ্জা পূর্ণ পালঙ্কে শয়ন করিবে না।'

১০। 'অর্থ গ্রহণ করিবে না।'

উপরোক্ত দশটি শিক্ষাবাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটি বৌদ্ধ গৃহীর জন্য কিন্তু সমগ্র দশটি শিক্ষাবাদই বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীর জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিল। বৈদিক ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মূলতঃ পার্থক্য রহিল, বৈদিক ধর্ম্ম, প্রবৃত্তি মূলক, প্রকৃতির অনুসরণে নিযুক্ত। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম,—প্রবৃত্তি রোধক, প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণে প্রযুক্ত।

এই প্রবৃত্তি রোধক বৌদ্ধধর্ম্ম সত্যকে আবরণ দেওয়াই বড় ধর্ম্ম মনে করিত এবং মানব মনের প্রবৃত্তির কোন মূল্য দিতে নারাজ ছিল। পক্ষান্তরে বাধ্যতা মূলক কর্ম্ম, বাধ্যতা মূলক নির্দ্দিষ্ট নিয়মে জীবন যাপন, বৌদ্ধ মনেরই কল্পনা, যাহা পরবর্ত্তীকালে ব্রাহ্মণগণ স্বীকার করিয়া লইয়া স্মৃতি ও পুরাণের মধ্য দিয়া বাধ্যতা-মূলক কর্ম্ম ও নির্দ্দিষ্ট নিয়মে জীবন যাপন করিতে বেদপন্থী সমাজকে বাধ্য করিয়াছিল এবং তাহারই প্রভাবে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রমুখ নারী চরিত্র অতি উজ্জ্বল করিয়া লিখিত হইয়াছিল।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মের বিরোধী

ভারতে বৈদিক ধর্ম্ম ও আর্য্য সভ্যতা প্রথমে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল বুদ্ধদেবের ধর্ম্মমত দ্বারা। ইতিহাসের ধারা ধরিয়া কোন্ ধর্ম্মমত প্রথমে ছিল, তারপর কোন্ কোন্ ধর্ম্ম মতের উদ্ভব হইয়াছে দেখিবার

পরে তুলনা মূলক ভাবে ঐ সকল ধর্ম্মমত আলোচনা করিলে ইহাই প্রকাশ পাইবে যে—পরবর্ত্তী ধর্ম্ম-মত-গুলি যেন তৎপূর্ব্ব ধর্ম্ম মতেরই প্রতিবাদে উদ্ভব হইয়াছে।

ইতিহাসে দেখা যায়,—বৈদিক ধর্ম্ম ভারতেই প্রায় তিন হাজার বৎসর সতেজে চলিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে বৌদ্ধধর্ম্ম, তাহা দেখিতে চমৎকার, শুনিতে বিস্ময়কর হইলেও মাত্র ছয়শত বৎসর পরেই মদ্যপান ও ব্যভিচার পথে ভাঙ্গিয়া পড়িতে সুরু করিল। সর্ব্ব বিষয়ে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া মোক্ষলাভ করা অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভবপর নহে। তবুও প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে ধর্ম্মমত, তাহাতে অনেকেরই একটা মোহ দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্ষত্রিয় বর্ণকে পৃথক করিয়া দেখাইবার জন্যই মহাভারতের রচনা

যদিও আর্য্য শব্দের অর্থ হইল,—গম্যতে হি সর্ব্বৈরীশ্বরৈঃ আর ক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ,—বলশালী, তবুও কেন যে আর্য্যগণ 'আর্য্য' বর্ণের পরিবর্ত্তে মহাভারতে আপনাদিগকে 'ক্ষত্রিয় বর্ণ' বলিয়া জাহির করিল, তাহার কোন হেতু কোন শাস্ত্র মধ্যে দৃষ্ট হয় না। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়,—বেদপন্থী আর্য্য রাজগণ জাতীয় নাম [আর্য্য] বজায় রাখিয়া, বেদ বিরোধী হওয়ায়, * রাজা ও রাজপক্ষীয়গণের সহিত বেদপন্থীগণ নিজেদের পার্থক্য বজায় রাখিবার জন্য ক্ষত্রিয় বর্ণ বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং আর্য্যবর্ণ হইতে ক্ষত্রিয় বর্ণ যে সর্ব্বতোভাবে একটি স্বতন্ত্র বর্ণ ও সেই বর্ণই যে জগতে

---

* প্রথম আর্য্য রাজা অজাতাশত্রু বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পরে আমাদের মনে হয় বেদপন্থী সমাজ নিজেদের বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয় নাম গ্রহণ ও ক্ষত্রিয় বর্ণের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিবার দুরাশায় মহাভারত রচনা করিয়াছিল।

প্রথমে উদ্ভূত হইয়াছিল, এই বেদবিরোধী মিথ্যা কথাগুলি প্রমাণ করিবার জন্যই মহাভারত রচিত হইয়াছিল। অথবা ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ সহায়ে যে সকল অনার্য্য বেদ পন্থী হইয়াছিল, মহাভারতে তাহারাই ক্ষত্রিয় নামে প্রচারিত হইয়াছিল কিনা কে বলিবে।

মহাভারতে রাজাগণের অলৌকিক জীবনী লিখিবার ভঙ্গিতে ক্ষত্রিয় বর্ণের প্রতি পাঠকের শ্রদ্ধা যেমন জাগরিত হইবে, তেমন ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বের সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিবার পরে পাঠকের পক্ষে আর্য্য বর্ণের কথা মনে উদয় না হইয়া ক্ষত্রিয় বর্ণের কথাই মনে গাঁথিয়া থাকিবে। মহাভারতে লিখিত আছে,—

১। মানবমণ্ডলীর মধ্যে ক্ষত্রিয়েরাই শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকে। বেদে কথিত আছে যে অন্য তিন যাবতীয় ধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম সমস্তই রাজধর্ম্মের আয়ত্তাধীন। যেমন সমুদয় প্রাণীর পদচিহ্ন হস্তীর পদচিহ্নে লীন হইয়া যায়, তদ্রূপ সমস্ত ধর্ম্মই রাজধর্ম্মে লীন রহিয়াছে॥ শান্তিপর্ব্ব, ৬৩ অধ্যায়॥

২। ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম আদিদেব হইতে সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ ধর্ম্মের পশ্চাতে অন্যান্য ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়। ধর্ম্ম নানা প্রকার এবং উহাদের ফলও বিনশ্বর। যাহা হউক সমস্ত ধর্ম্মই ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের আয়ত্ত। এই নিমিত্ত ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে॥ শান্তিপর্ব্ব ৬৪ অধ্যায়॥

৩। অসামান্য প্রভাব সম্পন্ন ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ॥ শান্তিপর্ব্ব, ৬৫ অধ্যায়॥

যে বুদ্ধি জগতের সকল বর্ণ অপেক্ষা নিজ বর্ণের প্রাধান্য রাখিতে ও নিজধর্ম্মমতকে অভ্রান্ত ভাবিতে শিক্ষা দেয়, আর্য্যগণেরও সেই বুদ্ধি ছিল বলিয়াই তাহারা বেদকে অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় ঘোষণা করিয়াছিল এবং যাহা বেদে নাই, এমন কর্ম্ম বা বিধি মাত্র

করিতে নিশ্চিতরূপেই নারাজ ছিল। অতএব মহাভারতে যখন লিখিত হইয়াছিল,—'ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আদিদেব হইতে সর্ব্বাগ্রে সৃষ্ট হইয়াছে' এবং 'ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ', তখন এই সকল অবৈদিক সিদ্ধান্তের নজীর দেখাইবার ভাবনা যে ক্ষত্রিয়—মনে ছিল না, এমত নহে।

ক্ষত্রিয় বর্ণের বৈদিক প্রমাণ—কাল্পনিক কথা

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ নামে যে শ্রুতি আছে তাহার লেখার রকম দেখিয়া মনে হয়,—যেন মতলব করিয়াই এই শ্রুতিখানি সকল অবৈদিক ব্যবস্থার নজীর দেখাইবার জন্য লিখিত হইয়াছিল। সকলেই জানেন,—যে গ্রন্থে ব্রহ্মবিদ্যার কথা লিখিত তাহাই উপনিষদ্। কিন্তু সমগ্র বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ খানি পাঠ করিবার পরে মনে হইবে,—ইহা ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা যৌন বিদ্যার পরিচয় এত বেশী দিয়াছে যে, মাত্র এই হেতুতেই বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌কে অতুলনীয় বলা যাইতে পারে।

এই অতুলনীয় গ্রন্থে লিখিত আছে,—"সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ ছিল, তিনি [ব্রহ্ম] একাকী [কর্ম্ম সম্পাদন করিতে] সমর্থ হইলেন না. তিনি উত্তম শ্রেয়স্কর ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিলেন। * * * এই কারণেই ব্রাহ্মণ নীচে বসিয়া উপরিস্থিত [সিংহাসনে উপবিষ্ট] ক্ষত্রিয়ের আরাধনা করিয়া থাকেন॥ ১।৪।১১॥

আর্য্য ও ক্ষত্রিয় সভ্যতা এক

এই ক্ষত্রিয়গণের যাগ যজ্ঞ, আহার, বিহার (যৌন সম্বন্ধ) আর্য্য-

গণের অনুরূপই দৃষ্ট হয়। প্রভেদ মাত্র, মহাভারতীয় যুগে—কন্যাকুল হইতে কেহ ঋষি হইয়াছেন দেখা যায় না।

ক্ষত্রিয়গণ বেদ ও যজ্ঞ মানিত এবং তেত্রিশ দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ-ভাগ অর্পণ করিত। আহারাদি বিষয়ে ক্ষত্রিয়গণ মৎস্য, মেষ, শশক, অজ, বরাহ, পক্ষী, মৃগ, মহিষ ও গো মাংস শ্রাদ্ধে প্রদান করিত ও নিজেরা আহার করিত॥ অনুশাসন পর্ব্ব, ৮৮ অধ্যায়॥

যুধিষ্ঠির যে গো-মেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহা দ্রৌপদীর মুখে ব্যক্ত আছে [বনপর্ব্ব, ৩০ অধ্যায়] এবং ব্যাসদেব ও শ্রীকৃষ্ণ যে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে মধুপর্ক দ্বারা সম্মানিত হইয়া পরে আহারে গো মাংস গ্রহণ করিয়াছিলেন সে কথাও মহাভারতে আছে [আদি পর্ব্ব, ৬০ অঃ, উদ্যোগ পর্ব্ব, ৮৮ অধ্যায়], আর রাজা রন্তিদেবের মহানশে ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য যে প্রতিদিন দুই সহস্র গাভী হত হইত তাহাও বনপর্ব্ব, ২০৬ অধ্যায় এবং শান্তি-পর্ব্ব, ২৬২ অধ্যায়ে ব্যক্ত আছে।

বলা বাহুল্য—উক্ত বিষয় সকল বৈদিক যুগে আর্য্যগণ মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল, কিন্তু মৎস্য আহারের কোন নিদর্শন ঋগ্বেদে দেখা যায় না।

বর্ণ বিভাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন অভিমত

শাস্ত্র শাসিত জাতির বালাই হইল,—প্রতি কথা, প্রতি ব্যবস্থা যাহা সমাজে প্রচলিত আছে, তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখিতে চাওয়া। আর্য্য-রাজগণের বৌদ্ধ হওয়া এবং বেদপন্থী আর্য্যগণের ক্ষত্রিয় নাম গ্রহণ করিবার পরে ক্ষত্রিয় হইতে যে বৈশ্য, শূদ্র ও ব্রাহ্মণ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাইবার জন্য হরিবংশে তিন রকম,

বিষ্ণুপুরাণে দুই রকম মৎস্য, ব্রহ্ম ও বায়ু পুরাণে মাত্র এক রকম বর্ণ বিভাগের কথা লিখিত হইল ঃ—

(ক) দত্তাত্রেয়রূপী ভগবান পুনরায় বেদোক্ত কার্য্য, যজ্ঞ ও চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ প্রবর্ত্তন করেন ॥ হরিবংশ পর্ব্ব, ৪১ অধ্যায় ॥

(খ) ক্ষত্রিয় গৃৎসমদ্-পৌত্র শৌনক আপন সন্তানগণকে গুণ ও কর্ম্ম পার্থক্যে [ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র] চারিবর্ণে বিভাগ করিয়াছিলেন ॥ হরিবংশ পর্ব্ব, ২৯ অধ্যায় ॥

(গ) ক্ষত্রিয় ভার্গভূমি আপনা সন্তানগণকে চারিবর্ণে বিভাগ করিয়াছিলেন ॥ হরিবংশ, ৩২ অধ্যায় ॥

(ঘ) ব্রহ্ম বরে বলিরাজা চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রতিষ্ঠাতা হন ॥ মৎস্য পুরাণ, ৪৮ অধ্যায় ॥

(ঙ) রাজা বলি [ক্ষত্রিয়] চারিবর্ণ প্রতিষ্ঠা করেন ॥ ব্রহ্মপুরাণ ॥

(চ) ক্ষত্রিয় গৃৎসমদ পৌত্র শৌনক আপন সন্তানগণকে চারিবর্ণে বিভাগ করেন ॥ বায়ু পুরাণ, ৯২ অধ্যায় ॥

(ছ) ক্ষত্রিয় গৃৎসমদ পৌত্র শৌনক আপন সন্তানগণকে চারিবর্ণে বিভাগ করেন ॥ বিষ্ণু পুরাণ, ৪।৮।১ ॥

(জ) ক্ষত্রিয় ভার্গভূমি চারিবর্ণ স্থাপন করেন ॥ বিষ্ণুপুরাণ ৪।৮।৯ ॥

উপরোক্ত বর্ণ বিভাগের কথা হইতে প্রকাশ পাইতেছে,—এই বর্ণ বিভাগের কর্ত্তা এক দত্তাত্রেয় ছাড়া আর সকলেই ক্ষত্রিয়। ইহার মধ্যে পরমপুরুষ নাই, ব্রহ্মা নাই, হরি নাই, নারায়ণ নাই, কেশব নাই, আছেন শুধু ক্ষত্রিয়,—যে ক্ষত্রিয় তখন মূলবর্ণ ছিল এবং যাহার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্যই মহাভারত রচিত হইয়াছিল।

মহাভারতে পশু যাগের কথা

মহাভারতের নানা স্থানে যে সকল যজ্ঞের কথা উক্ত আছে,

তাহাতে অশ্বমেধ যজ্ঞ ও গোমেধ যজ্ঞের কথাই ব্যক্ত আছে। যেমন সভাপর্ব্ব, ৪৪ অধ্যায় রাজসূয় যজ্ঞে অশ্ব বধের কথা; বন-পর্ব্ব, ৩০ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের গোমেধ যজ্ঞের সংবাদ এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবশানে আশ্বমেধিক পর্ব্ব, ১০ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা। এতদ্দারা এবং বুদ্ধদেব যে যজ্ঞে পশু বধ দেখিয়া ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন—এই উভয় হেতুতে স্বীকার করিতে হইবে,—বৌদ্ধ রাজ-শাসনে যখন বেদপন্থী সমাজ যজ্ঞে পশুবধ বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তখনই হবিসংস্থা বা নিরামিষ যজ্ঞের প্রচলন হইয়াছিল।

হবিসংস্থা যাগের নাম

১। অগ্ন্যাধেয়. ২। অগ্নিহোত্র, ৩। দর্শ পৌর্ণমাস, ৪। আগ্রয়ণ, ৫। চাতুর্ম্মাস্ত, ৬। নিরূঢ় পশুবন্ধ, ৭। সৌত্রামণি—এই সাত প্রকার মদ্যহীন নিরামিষ যজ্ঞকে হবিসংস্থা কহে। এই সকল যজ্ঞ যজমানের পক্ষে স্বেচ্ছামূলক ছিল।

একে যজ্ঞে সোমরস পান রহিত হইল, তারপর পশুবধে যে উত্তেজনা তাহাও বন্ধ হইয়া গেল, এমত অবস্থায় স্বেচ্ছামূলক মদ মাংসহীন যজ্ঞে কোন যজমানই উৎসাহ বোধ করিলেন না।

তন্ত্রের কথা

এমনই সময়ে বাহির হইতে তন্ত্র নামে একপ্রকার সাধনপদ্ধতি ভারতে আসিল এবং বৌদ্ধ ও বেদপন্থী এই উভয় পক্ষ হইতেই এই মত আদৃত হইল। পরে এই তন্ত্রকে মূলধন করিয়া বৌদ্ধগণ বৌদ্ধ-তন্ত্র ও বেদপন্থীগণ শক্তি তন্ত্র রচনা করিতে লাগিল।

বেদপন্থী সমাজ তন্ত্রের উপাসনায় পঞ্চমকার বা মুদ্রা, মৎস্য, মাংস,

মদ্য ও মৈথুন গ্রহণ করিয়া সংক্ষেপে বৈদিক ধর্ম্মমত ও সভ্যতা রক্ষার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিল। কিন্তু রাজবিধানে জীবনাশ, মদ্যপান ও ব্যাভিচার (অবাধ যৌন সম্বন্ধ) নিষিদ্ধ থাকায় বেদপন্থীগণ গভীর অমানিশায় তন্ত্রের উপাসনা প্রবর্ত্তন করিল। গভীর অমানিশায় রাজশক্তির ভয়ে যে কাজ তাহাতে উত্তেজনা আসিতেই পারে না! সুতরাং তৎকালে তন্ত্রও একপ্রকার অচলই রহিল।

স্মার্ত্তকর্ম্ম প্রবর্ত্তনে ও ক্ষত্রিয় বর্ণের 'ব্রাহ্মণ' নাম গ্রহণ

অতঃপর বেদপন্থী সমাজ বৌদ্ধ স্মৃতির অনুকরণে বেদপন্থী সমাজের জন্য এমন এক স্মৃতি রচনা করিলেন, যাহা বৌদ্ধ ধর্ম্মের বাধ্যতা মূলক কর্ম্মের ন্যায় বেদপন্থী সমাজের পক্ষেও বাধ্যতামূলক হইয়াছিল এবং ইহার ফলে ক্ষত্রিয়বর্ণকে নাম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ বর্ণ বলিয়া ঘোষণা করিতে হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত বাধ্যতামুলক কর্ম্ম সমগ্র দেশের উপর বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ক্ষৌরিত মস্তক, পীত-বসন-পরিহিত শত ভিক্ষু কণ্ঠে উপাসনা মন্ত্র উচ্চারিত, শত ভিক্ষু ভিক্ষাপাত্র হস্তে রাজপথে আগত এই সকল দেখিয়া নিজ সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ রাখিবার জন্য বেদপন্থী পণ্ডিতগণ স্মৃতিশাস্ত্রের রচনা ও স্মার্ত্তকর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

বাধ্যতা মূলক স্মার্ত্তকর্ম্ম প্রাচীন মত নহে

প্রথমে স্মার্ত্তকর্ম্ম বলিতে ষোলটি সংস্কার ধার্য্য হইল। তারপর শ্রাদ্ধ, তর্পণ, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি ক্রমশঃ অনেক কিছুই যুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু

এই সকল স্মার্ত্তকর্ম্ম * যে বেদ বিরোধী সে কথা বশিষ্ঠ সংহিতা ও বায়ু পুরাণে ব্যক্ত আছে ঃ—

বশিষ্ঠ সংহিতায় আছে,—দেশধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম বেদে অভাব হেতু মনু বলিয়াছেন ॥ প্রথম অধ্যায় ॥

বায়ু পুরাণে আছে,—শ্রৌতধর্ম্ম যজ্ঞ বেদাত্মক, স্মার্ত্তধর্ম্ম বর্ণাশ্রমাত্মক; ঋষিগণবেদ প্রণয়ন করিয়াছেন, মনু পূর্ব্ব মন্বন্তরের আচার স্মরণ করিয়া স্মার্ত্তধর্ম্ম রচনা করিয়াছেন। শ্রবণ দ্বারা যাহা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে তাহা শ্রৌত, এবং স্মরণ করিয়া যাহা বলা হইয়াছে, তাহা স্মার্ত্ত ॥ ৫৯।৩৯ ॥

ব্রাহ্মণ বর্ণের উৎপত্তি

বৌদ্ধ উপ-প্লাবনে বেদপন্থী সমাজের লোক সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়ার অবস্থা এমন সঙ্গিন হইয়াছিল, যাহার জন্য বাধ্য হইয়া অবৈদিক বাধ্যতামূলক কর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া নানা উৎসবাদির দ্বারা বেদপন্থী সমাজকে প্রাণবন্ত রাখিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। এই বাধ্যতামূলক কর্ম্ম, হয় স্বয়ং মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সম্পন্ন করিতে হইবে, অথবা পুরোহিতের কথিত মন্ত্র শুনিয়া নিজকে সেই মন্ত্র পাঠ করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। সুতরাং বলা যাইতে পারে, সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান থাকুক বা নাই থাকুক সকলকেই সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ করিতে হইবে। ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ,—মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক স্তোত্র-পাঠকারী। শাস্ত্রেতে দেখা যায়,—সমগ্র ক্ষত্রিয় বর্ণ একদা নাম ত্যাগ

---

* গর্ভাধানং পুংসবনং সীমান্তো জাতকর্ম্ম চ। নাম ক্রিয়া নিষ্ক্রমণেঽন্নাশনং বপন ক্রিয়া ॥ ১।১৩ ॥

কর্ণবেধো ব্রতাদেশো বেদারম্ভ ক্রিয়াবিধিঃ। কেশান্তঃ স্নানমুদ্বাহো বিবাহাগ্নি পরিগ্রহঃ ॥ ১।১৪ ॥

ত্রেতাগ্নি সংগ্রহশ্চেতি সংস্কারাঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ ॥ ॥ ব্যাস সংহিতা, ১।১৫ ॥

করিয়া ব্রাহ্মণবর্ণ নামে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কেন ব্রাহ্মণ নাম গ্রহণ করিয়াছিল, সে কৈফিয়ৎ শাস্ত্রে নাই। আমাদের দৃঢ় ধারণা, স্মার্ত্তকর্ম্ম যখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখনই স্মৃতিপন্থী মানবগণ 'ব্রাহ্মণ বর্ণ' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। কারণ, সকলেই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক স্মার্ত্তকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইত। মহাভারতে লিখিত আছে,— একমাত্র ব্রহ্ম হইতে প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ বর্ণ উৎপন্ন হয়। ক্রমে সেই ব্রাহ্মণ বর্ণ হইতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে॥ শান্তিপর্ব্ব, ৬০ অধ্যায়॥

উপরোক্ত মহাভারতের বচন কোন বেদ মন্ত্রই সমর্থন করেন না। অথবা অত্রি সংহিতার নিম্নলিখিত মন্ত্রেরও কোন বৈদিক প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। যথা,—

জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব চ॥ ১৪০ শ্লোক॥

অর্থাৎ (স্মৃতিপন্থা সমাজের লোক) জন্মদ্বারা 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া জ্ঞাত হয়, সংস্কার হইলে 'দ্বিজ' পদবাচ্য হয়। বিদ্যা লাভ করিয়া 'বিপ্র' হয়। জন্ম, সংস্কার ও বিদ্যা এই তিনের যোগে 'শ্রোত্রিয়' হন।

ম্লেচ্ছ কৈবর্ত্তকে উপবীত প্রদান করতঃ ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার

এই স্মৃতিপন্থী সমাজ যতদিন ব্রাহ্মণ বর্ণ বলিয়া পরিচিত ছিল, সেই সময়ের মধ্যে ভৃগুবংশীয় এক উৎসাহী ব্রাহ্মণ "অব্রাহ্মণ্য [ম্লেচ্ছ] দেশে নিজ পক্ষ প্রবল করিবার মানসে অনার্য্য কৈবর্ত্তদিগকে উপবীত প্রদান-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ বর্ণে উন্নীত করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলেন।"১

১। অব্রাহ্মণ্য তদা দেশে কৈবর্ত্তান্ প্রেক্ষ ভার্গব।
স্বপক্ষং প্রবলং কর্ত্তুং যজ্ঞ সূত্রমকল্পয়ৎ॥
স্থাপয়িত্বা স্বকীয়ে স ক্ষেত্রে বিপ্রান্ প্রকল্পিতান্।
জামদগ্ন্যস্তদোবাচ সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা॥ স্কন্দ পুরাণ

স্কন্ধ পুরাণোক্ত বচনে "স্বপক্ষপ্রবল করিবার মানসে" "অনার্য্য ও কৈবর্ত্তগণকে উপবীত প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ বর্ণে উন্নীত করা" কথার মধ্যে যে ঐতিহাসিক সত্য লুক্কাইত আছে, তাহা এখন খুলিয়া বলিতে হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে,—স্বপক্ষ প্রবল করিবার কল্পনা কখন জাগ্রত হইয়াছিল এবং কেনই বা অনার্য্য কৈবর্ত্তগণকে উপবীত প্রদানপূর্ব্বক একেবারে ব্রাহ্মণ বর্ণে উন্নীত করা হইয়াছিল ?

ইহার একমাত্র উত্তর এই যে,—যে সময় প্রবল বৌদ্ধধর্ম্মের আঘাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য আর্য্যবংশধরগণ স্মৃতি রচনা করিয়া ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইতে হইয়াছিল, তখন ব্রাহ্মণ বর্ণের লোক সংখ্যা অত্যধিক কমিয়া গিয়াছিল বলিয়াই ভার্গব স্বপক্ষ প্রবল করিবার জন্য অনার্য্য কৈবর্ত্তগণকে উপবীত প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ বর্ণে উন্নীত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দায়ে পড়িয়া আর্য্য রক্তের সহিত এইভাবেই অনার্য্য রক্তের মিশ্রণ ঘটিয়া গিয়াছিল।

দশবিধ ব্রাহ্মণ হইতে চারিবর্ণ ও অন্ত্যজের উদ্ভব

এই ভাবে ক্ষত্রিয়বর্ণ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইবার পরে, এই ব্রাহ্মণবর্ণই আবার গুণ ও কর্ম্ম পার্থক্যে দশ রকম ব্রাহ্মণ নামে কথিত হইয়াছিল। যথা,—দেব, মুনি, দ্বিজ, রাজা, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ ও চণ্ডাল—এই দশবিধ ব্রাহ্মণ [৩৬৪ শ্লোক] শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট। ইহার পরে ৩৬৫ হইতে ৩৭৪ শ্লোকে—এই দশবিধ ব্রাহ্মণের গুণ ও কর্ম্মের পরিচয়ে যাহা লিখিত আছে, তাহা দেখিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন,—প্রথমে যে বর্ণ বিভাগ হইয়াছিল, তাহা ব্যক্তিগত গুণ ও কর্ম্ম দেখিয়া ধার্য্য হইলেও সকলেই একবর্ণের লোক বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহারই

জন্য মহাভারত, রামায়ণ, অষ্টাদশ পুরাণ, ততোধিক উপপুরাণ মধ্যে বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ প্রভৃতির নামের পরে দেবশর্ম্মণঃ, চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্য, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উপপদ দৃষ্ট হয় না। রাজাদের নামের পরেও যুধিষ্ঠির দেববর্ম্মণ—সিংহ প্রভৃতি উপপদ দৃষ্ট হয় না। দ্রোণ ও কৃপকে ব্রাহ্মণ বলিলেও তাঁহাদের নামের পরে চট্টোপাধ্যায়, বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি উপপদ যুক্ত হয় নাই। কখন হইতে নামের পরে উপপদ যুক্ত হইল সেকথা সময়মত প্রকাশ পাইবে।

অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট হেতু আছে যে,—যখন বৌদ্ধধর্ম্ম পতনের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল, তখন দেব, মুনি, দ্বিজ এই তিন দ্বারা ব্রাহ্মণবর্ণ, রাজন্য দ্বারা ক্ষত্রিয় বর্ণ, বৈশ্যকে বৈশ্য বর্ণ ও শূদ্রকে শূদ্র বর্ণ এবং বাকী নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ ও চণ্ডালকে বর্ণহীন বা অন্ত্যজ করা হইয়াছিল, তখন মহাভারতে নূতন করিয়া লিখিত হইল,—

যিনি যাতকর্ম্মাদি দ্বারা শুচি, বেদধ্যয়ন সম্পন্ন, ষট্‌কর্ম্মে [অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ] অবস্থিত, গুরুপ্রিয়, নিত্য ব্রতী ও সত্যবাদী, তিনিই ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হন। যাঁহার মধ্যে সত্য, দান, অদ্রোহ, আনৃশংস, লজ্জা, ঘৃণা ও তপস্যা দেখা যায়, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। যিনি বেদধ্যয়নে রত থাকিয়াও ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্ম করেন, আদান প্রদানে যাঁর আনন্দ হয়, তিনি ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হন। যিনি বেদধ্যয়নসম্পন্ন, কৃষি, বাণিজ্য [জল ও স্থল পথে] ও পশু রক্ষা যাঁহার বৃত্তি, তিনি বৈশ্য নামে অভিহিত হন। আর যে বেদধ্যয়ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনাচারী হইয়া সমস্ত ভোজ্যই ভক্ষণ করে, সমস্ত কর্ম্মই করিয়া থাকে, সে শূদ্র নামে অভিহিত হয়॥ শান্তিপর্ব্ব, ১৮৯ অধ্যায়॥

যে আর্য্য বর্ণের কথায় ঋগ্বেদ মুখরিত, সেই আর্য্যবর্ণই পরে ক্ষত্রিয় বর্ণ রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। স্মার্ত্তকর্ম্ম প্রবর্ত্তনের সঙ্গে ক্ষত্রিয়বর্ণ প্রথমে ব্রাহ্মণ বর্ণ নামে পরিচিত হইল। তারপর যখন ব্রাহ্মণ হইতে গুণ ও কর্ম্ম পার্থক্যে চারিবর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন খুব সম্ভব কথা উঠিয়াছিল,—কে বড়, কে ছোট? এই বড় ছোট'র মীমাংসার জন্য মহাভারতে নূতন করিয়া লিখিত হইল,—"এক ব্রহ্ম হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। এই জন্য এই চারিবর্ণ পরস্পর সমান ও সকল বর্ণের সকল সময় যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য ॥ শান্তিপর্ব্ব. ৬০ অধ্যায় ॥ অন্যত্র লেখা আছে,—

সকল বর্ণই ব্রহ্ম হইতে সম্ভূত, অতএব সকল বর্ণকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা যায় এবং সকল বর্ণেরই বেদপাঠের অধিকার আছে ॥ শান্তিপর্ব্ব. ৩১৯ অধ্যায় ॥

ঋগ্বেদে যেখানে যেখানে ব্রহ্ম শব্দ আছে তাহার ভাষ্যে আচার্য্য সায়ন লিখিয়াছে মন্ত্র, ব্রাহ্মণ। মন্ত্র হইতেই যে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। অর্থাৎ যাহারা মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক স্তোত্র পাঠ করিতে সক্ষম তাহারাই ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ বর্ণ যে ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এমন নজীর বেদে নাই। শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে,—ব্রহ্মই মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ হইলেন (১।৪।১৫) আর কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে লিখিত হইল,—দেবগণ হইতে ব্রাহ্মণবর্ণ ও অসুরগণ হইতে শূদ্রবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১।২।৬।২৭ ॥

ব্রাহ্মণবর্ণের বৈদিক প্রমাণে মতভেদ

শ্রুতি বলিলেন,—দেবগণ হইতে ব্রাহ্মণ বর্ণ আর বলিলেন,—ব্রহ্মই

ব্রাহ্মণ কিন্তু মহাভারত বলিলেন,—ব্রহ্ম হইতে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের উদ্ভব। আর শূদ্রের কথায় শ্রুতি নানা মত।ঃ—বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন,—ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সৃষ্টি করিবার পরে শূদ্র সৃষ্টি করিলেন (১।৪।১৩), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলিলেন,—অসুর হইতে শূদ্রের উৎপত্তি (১।২।৬।৭), আবার ঋগ্বেদ বলেন,—পরম পুরুষের পদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি [১০।৯০।১২]।

ইহাই হইল,—মিথ্যাকে সত্য বলিয়া চালাইবার পরিণামে অভ্রান্ত বেদের কলঙ্ক। এমন কলঙ্ক কত যে আছে—আলোচনা প্রসঙ্গে তাহারই কিছু কিছু ক্রমশ প্রকাশ পাইবে।

বৃহদারণ্যক্ শ্রুতির বর্ণ উৎপত্তি—গ্রহণের অযোগ্য

যে বৃহদারণ্যক শ্রুতির উল্লেখ বহুবার করিয়াছি, তন্মধ্যে যে একমাত্র ক্ষত্রিয়েরই পরিচয় আছে এমত নহে। যে মন্ত্রে ক্ষত্রিয়ের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার পরে বৈশ্য তৎপর শূদ্রের উৎপত্তির কথাও বলা হইয়াছে। তার পরের মন্ত্রে উগ্র প্রকৃতি ক্ষত্রিয়কে যিনি বশে রাখিবেন, সেই ধর্ম্মের [Law] উৎপত্তি কথা বলিবার পরে, যে মন্ত্রটি রচিত হইল, তাহা শুধু অদ্ভুত নহে, একেবারে অতুলনীয়। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে আছে,—"তদেতদ্ ব্রহ্ম ক্ষত্রং বিট্ শূদ্রঃ তদাগ্নিনৈব দেবেষ্ ব্রহ্মাভবদ্ ব্রাহ্মণো মনুষ্যেষু ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যেন বৈশ্যঃ শূদ্রেণ শদ্র স্তস্মাদ্-অগ্নৌ-এব দেবেষু লোকমিচ্ছন্তে ব্রাহ্মণো মনুষ্যেষু এতাভ্যাং হি রূপাভ্যাং ব্রহ্মাভবৎ॥ ১।৪।১৬॥

ধর্ম্মের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে,—"ক্ষত্রিয়ের নিয়ন্তা বলিয়া ধর্ম্মাপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কিছু নাই" [১।৪।১৫]। তারপরের মন্ত্রে যাহা

বলা হইয়াছে, তাহার মূল উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ হইল,— এইরূপে ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র [রূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন], ব্রহ্ম দেবগণের মধ্যে অগ্নিরূপে ব্রাহ্মণ [হইলেন] ব্রহ্ম মানুষের মধ্যে, ব্রাহ্মণ হইলেন। [তারপর ব্রহ্ম সোজাসুজি মানুষের মধ্যে ক্রমাগত ব্রাহ্মণ হইতে লাগিলেন, কিন্তু] ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয় হইতে, বৈশ্য—বৈশ্য হইতে শূদ্র—শূদ্র হইতে উৎপন্ন হইতে লাগিল। সেই হেতু দেবগণের কোন কাম্যবস্তু লাভ করিবার ইচ্ছা হইলে অগ্নি এবং মানবগণের পক্ষে ব্রাহ্মণকে প্রার্থনা করা বিধেয়। কেন অগ্নি ও ব্রাহ্মণের উপসনা করা বিধেয়, তৎপ্রসঙ্গে বলিতেছেন,—[ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র মানব জাতি বলিয়া বিকৃত] অগ্নি ও ব্রাহ্মণ স্বয়ং ব্রহ্ম, অতএব অবিকৃত। কিন্তু এত কথার মধ্যে আর্য্যবর্ণের কিন্তু কোন কথাই নাই!

বর্ত্তমান আকারপ্রাপ্ত বেদ অভ্রান্তও নহে অপৌরুষেয়ও নহে

শ্রুতি বলিতেই যাহারা মনে করেন, উহা অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয়, অতএব অতি প্রাচীন গ্রন্থ ও প্রামাণ্যের শ্রেষ্ঠ আকর, তাঁহাদের সহিত আমরা এক মত নহি। প্রথমতঃ ঋগ্বেদ যে ভাষায় লিখিত, বৃহদারণ্যক্ উপনিষদের ভাষা সেইরূপ নহে। সুতরাং ঋগ্বেদের ন্যায় ইহাও প্রাচীনতম গ্রন্থ নহে। তারপর ঋগ্বেদের ঋষিগণ যে আর্য্যবর্ণের জন্য গাভী, বিত্ত, পুত্র সুন্দরী নারী প্রার্থনা করিয়াছেন, সেই আর্য্যবর্ণের কোন কথা ইহাতে নাই। অপিচ ঋগ্বেদস্থিত পুরুষসূক্তে ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বলিয়া যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কথা আছে, তাহাদের লইয়াই বৃহদারণ্যক্ উপনিষদ্ লিখিত। এমত অবস্থায় আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আর্য্যবর্ণ যখন ক্ষত্রিয় বলিয়া আত্ম প্রকাশের পরে গুণগত ভাবে

ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্য, শূদ্র ও ব্রাহ্মণ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, বৃহদারণ্যক্ শ্রুতি তৎসময়ে অথবা পরবর্ত্তী সময়ে রচিত হইয়া কতগুলি অবৈদিক কথার বৈদিক প্রমাণরূপে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল।

যে কেহ শ্রম স্বীকার করিলেই দেখিতে পাইবেন,—ঋগ্বেদ আর্য্য বর্ণের উৎপত্তি প্রসঙ্গে একেবারে নীরব। মহাভারত ক্ষত্রিয় বর্ণের উৎপত্তি প্রসঙ্গে মুখর। এই উৎপত্তি প্রসঙ্গে অন্ততঃ পক্ষে একুশ রকম মতবাদ এক মহাভারতেই রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান মত হইল,—রাজর্ষি মনু আদিমানব এবং তাঁহার বংশধরগণই ক্ষত্রিয়বর্ণ। তারপর এই ক্ষত্রিয় বর্ণ যখন গুণ ও কর্ম্ম পার্থক্য চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, তখন সেই বিভাগ কর্ত্তার নাম মহাভারতে স্থান লাভ না করিয়া অপর চারিখানি পুরাণ ও মহাভারতের পরিশিষ্ট খিল হরিবংশে স্থান লাভ করিয়া দেখাইয়াছিল,—ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয় রাজাই এই বর্ণ বিভাগ করিয়াছেন।

ইহার পরে যখন মূল ক্ষত্রিয় বর্ণ ব্রাহ্মণ বর্ণ নাম গ্রহণ করিল, তখন মহাভারতে নূতন করিয়া তিনটী মন্ত্রে দেখান হইল ব্রহ্ম হইতে ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্ম হইতে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে।

শূদ্র ও ব্রাহ্মণের লক্ষণ

ব্রহ্ম হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছে লিখিত হইলেও ব্রাহ্মণ বলিতে কেহই খুব বড় একটা কিছু মনে করিতেন না এবং তাহা মনে না করার হেতুও মহাভারতেই লিখিত আছে। যথা,—

"যুধিষ্ঠির কহিলেন,—অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণ লক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতে [ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য] শূদ্র লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব শূদ্র

বংশ হইলেই যে শূদ্র হয় এবং ব্রাহ্মণ বংশীয় হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয় এমত নহে; কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয় তাহারাই ব্রাহ্মণ এবং যে সকল ব্যক্তিতে তাহা লক্ষিত হয় না, তাহারাই শূদ্র। * * বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ মানব জাতির সাধারণ ধর্ম্ম, এই জন্য পুরুষেরা বর্ণ বিচারে বিমূঢ় হইয়া নারীতে অপত্যোৎপাদন করিয়া থাকে; অতএব মনুষ্য জাতির মধ্যে সমুদয় বর্ণ এইরূপ সঙ্কর বশতঃ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের নিরুপণ দুরুহ; কিন্তু তত্ত্বদর্শীরা মানব মধ্যে যাহারা যজ্ঞ পরায়ণ, তাহারাই ব্রাহ্মণ—এই আর্য্য প্রথানুসারে বৈদিক ব্যবহারেই প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। বেদ বিহিত কর্ম্মই ব্রাহ্মণত্ব লাভের হেতু। * * * মানব যত বেদপাঠ না করে, ততদিন শূদ্র সম থাকে। বর্ণ সংশয় স্থানে স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন,—যদি বৈদিক ব্যবহার না থাকিত, তাহা হইলে সকল বর্ণই শূদ্র তুল্য হইত এবং সঙ্কর বর্ণই সর্ব্বপ্রধান হইত। এই নিমিত্ত প্রথমেই বলিয়াছি যে, বৈদিক ব্যবহার সম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হন॥ বনপর্ব্ব, ১৮০ অধ্যায়॥

এই প্রসঙ্গে কয়েকখানি শাস্ত্রের অভিমতও নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।ঃ—

১। যে পর্য্যন্ত বেদে অধিকার না জন্মে, সে পর্য্যন্ত শূদ্র তুল্য থাকিবে। বেদ পাঠ আরম্ভের পরে দ্বিজ [ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য] বলিয়া জানিবে॥ শঙ্খ সংহিতা, ১।৮॥

২। যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয় অধ্যয়ন করে, সে সন্তান সহ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। * * * উপনয়নের পূর্ব্বে দ্বিজ শূদ্র তুল্য থাকে॥ বিষ্ণু সংহিতা, ২৮ অধ্যায়॥

৩। যতদিন উপনয়ন না হয়, ততদিন শূদ্রবৎ জানিবে। যতদিন

বেদ জন্ম না হয়, তাবৎ শূদ্রবৎ ব্যবহার করিবে ॥ বশিষ্ট সংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

(ক) অশ্রোত্রিয়, অনুবাক্ শূন্য [বেদ শূন্য] নিরগ্নি দ্বিজাতি শূদ্র তুল্য। বেদ অধ্যয়ন ব্যতীত ব্রাহ্মণ হয় না ॥ বশিষ্ঠ সংহিতা, তৃতীয় অধ্যায় ॥

(খ) বেদ ত্যাগ করিলে শূদ্র হয়, সেই জন্য বেদ ত্যাগ করিবে না। বশিষ্ঠ সংহিতা, দশম অধ্যায় ॥

৪। যে দ্বিজ, বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয় অধ্যয়ন করে, সে ইহজন্মেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ মনু, ২।১৬৮ ॥১

বেদ অধ্যয়ন ও যাগ যজ্ঞের শ্রেষ্টত্ব প্রাচীন ভারতেও যেমন ছিল, বৌদ্ধ ভারতেও বেদপন্থী সমাজে তেমনই ছিল। প্রভেদ হইয়াছিল,— প্রাচীন ভারতে রাজাই ছিলেন কৃষ্ট, বেদ ও যজ্ঞ রক্ষক। বৌদ্ধ ভারতে প্রথমে ক্ষত্রিয় পরে ব্রাহ্মণই হইলেন বেদ ও যজ্ঞ রক্ষক। এই বেদ ও যজ্ঞ রক্ষার জন্যই ব্রাহ্মণগণ যে পরে শ্রেষ্টত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

রাজার জাতির কার্য্য কলাপ, রীতি নীতি, বিজিত জাতি যে কি ভাবে অনুকরণ করিয়া থাকে, এ পরিচয় মুসলমান ও ইংরাজ শাসিত ভারতবাসীকে না বলিলেও চলিবে। সুতরাং বৌদ্ধ যুগে বেদপন্থী সমাজ প্রথমে বৈদিক ধর্ম্ম ও সভ্যতা রক্ষার জন্য প্রাণপাৎ নিষ্ঠা দেখাইলেও, শেষের দিকে বেদপন্থী সমাজ বৌদ্ধদের প্রায় সকল রকম ব্যবস্থাই রকম ফের করিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

যে বেদ পাঠকে আর্য্যগণ এত প্রাধান্য দিয়াছিল, সেই বেদ পাঠ

১। যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥ মনু, ২।১৬৮ ॥

করিবার জন্য ও বৌদ্ধ ভিক্ষুর আদর্শে বেদপন্থী সমাজের আকার প্রদান করিবার জন্য বর্ণ বিভাগ জাতিধর্ম্ম আশ্রম বিভাগ কত কি করিতে হইল। যথা,—ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম, গার্হস্থাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম ও সন্ন্যাস।

বেদপন্থী সমাজ শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়াছিল,—বৌদ্ধ গৃহীগণ কেমন সুন্দর শ্রদ্ধার সহিত বিদ্যার্থী ও ভিক্ষুগণকে পক্কান্ন ভিক্ষা দিয়া থাকে। সুতরাং স্মার্ত্তকর্ম্ম দ্বারা বেদপন্থী সমাজে বর্ণ, জাতিধর্ম্ম, আশ্রম ধর্ম্ম বিভক্ত হইবার সঙ্গে ধার্য্য হইল,—ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের ভিক্ষা গৃহীগণ যোগাইবে।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বিদ্যার্থী উপনয়ন গ্রহণ করিয়া গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করিবে, সংযত জীবন-যাপন ও ভিক্ষান্নে জীবিকা যাপন করিবে। বিদ্যার্থী গুরুগৃহে পঁচিশ বা ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত থাকিবে।

গার্হস্থাশ্রমে—বিদ্যার্থী অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বিবাহ করিবে এবং জীবনের অর্দ্ধেক বয়স বা পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত গৃহধর্ম্ম পালন করিবে।

বানপ্রস্থাশ্রম—সস্ত্রীক অথবা একক বনে যাইয়া যজ্ঞাদি করিবে। নিজের বিষয়ের দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

সন্ন্যাস এই আশ্রম স্বীকার করিবার পুর্ব্বে রাজার অনুমতি গ্রহণ করিবার প্রথা কোন কোন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। রাজার অনুমতি লাভ করিতে পারিলেই সমস্ত দেশবাসীর পক্কান্নের উপর সন্ন্যাসীরও ভাগ স্বীকৃত হইবে। সুতরাং ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের পোষণের জন্য নূতন করিয়া পাক সংস্থা যাগ প্রবর্ত্তন করিতে হইল,—যদিও ইহার সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ও যুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই সমস্তই বেদ-বিরোধী ব্যবস্থা।

পাক সংস্থা যাগের কথা

১। সায়ং হোম, ২। প্রাতর্হোম, ৩। স্থালীপাক, ৪। নব যজ্ঞ, ৫। বৈশ্ব দেব, ৬। পিতৃযজ্ঞ, ৭। অষ্টকা—এই সাত প্রকার যাগকে পাক সংস্থা যাগ কহে।

মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে দেখা যায়, ব্রহ্মা নামে এক দেবতার ব্যবস্থায় বর্ণাশ্রম ও আশ্রম-জনিত-কর্ম্ম বা জাতিধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতের কয়েকটি কথা দেখিয়া মনে হয়,—প্রথমে যখন মাত্র ষোলটি বাধ্যতামূলক সংস্কার বা স্মার্ত্তকর্ম্ম দেশে প্রচলিত হইয়াছিল, তখন সবে মাত্র স্মৃতিপন্থী সমাজের লোক ক্ষত্রিয় নাম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণবর্ণ হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ বর্ণ যতদিন প্রবল বৌদ্ধ মতবাদের বিরুদ্ধে গুণগত বর্ণ বিভাগ প্রচলিত রাখিতে সচেতন ছিল, ততদিন বংশগত বর্ণ স্থাপিত হইতে পারে নাই। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি যখন গভীরতম হইয়া উঠিল, তখন বংশগত বর্ণ যে স্থাপিত হইয়াছিল, তৎপক্ষে মহাভারতে লিখিত আছে,—

(ক) নারায়ণ বলিয়াছেন,—আমার শক্তিদ্বারা আমার মুখ ব্রাহ্মণ, বাহুযুগল ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় বৈশ্য এবং পাদদেশ ক্রমশঃ শূদ্র হইয়াছিল॥ বনপর্ব্ব, ১৮৯ অধ্যায়॥

(খ) অনন্তর মধুসূদনের মুখ হইতে একশত ব্রাহ্মণ, বাহুযুগল হইতে একশত ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হইতে একশত বৈশ্য ও পদযুগল হইতে একশত শূদ্র উৎপন্ন হইল॥ শান্তি-পর্ব্ব, ২০৭॥

উপরোক্ত বচন হইতে ইহাই প্রতীত হয় যে,—মূল ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে যখন বংশগত বর্ণ স্থাপিত হইয়াছিল, তখন আরম্ভ হইয়াছিল,—ব্রাহ্মণাদি প্রতি বর্ণের একশত পরিবার লইয়া। আর 'ক্রমশঃ শূদ্র হইয়াছিল' কথাতে প্রকাশ পাইতেছে যে,—বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতন সুনিশ্চয় বুঝিয়া দলে দলে অনার্য্যগণ ব্রাহ্মণের বৈশ্যতা স্বীকার করিয়া শূদ্র পর্য্যাভুক্ত হইয়াছিল।

অব্রাহ্মণবর্ণের ভীতি উৎপাদনে ব্রাহ্মণের অলীক গুণ বর্ণন

একদিকে বৌদ্ধধর্ম্ম যেমন দ্রুত পতনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল,

অন্যদিকে ব্রাহ্মণগণও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা স্থায়ীভাবে রক্ষা করিবার জন্য নূতন করিয়া মহাভারতে লিখিতে লাগিলেন,—

(ক) * * * ব্রাহ্মণেরা পিতৃ, দেবতা ও উরগগণের পূজ্য। দেবতা, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, অসুর ও পিশাচগণ মধ্যে কেহই উহাঁদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। উহাঁরা দেবতাকে অদেবতা ও অদেবতাকে দেবতা করিয়া থাকেন। যাঁহারা উহাঁদিগের প্রিয়, তাঁহারা রাজা হন, আর যাহারা অপ্রিয়, তাহারা পরাভূত হইয়া থাকে। যে মূর্খেরা ব্রাহ্মণের অযশ গাহিয়া থাকে তাহারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। * * * ব্রাহ্মণেরা যে পুরুষের প্রশংসা করেন, তিনি অভ্যুদয়শালী হন, আর তাঁহারা যাহার নিন্দা করেন, সে অবিলম্বে পরাভূত হয়, সন্দেহ নাই। শক, যবন, কম্বোজ, দ্রাবিড়, কালিন্দ, পুলিন্দ, উশীনর, কোলিসর্প ও মাহিষক প্রভৃতি কতগুলি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের অনুগ্রহ দৃষ্টি ব্যতীরেকে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে॥ অনুশাসন পর্ব্ব, ৩৩ অধ্যায়॥

(খ) * * * ইহলোকে ব্রাহ্মণের সেবা পরম পবিত্র ও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের সেবা করিলে পাপের লেশমাত্র থাকে না। * * * ব্রাহ্মণ-সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। * * * যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করে, তাহাকে মহার্ণব নিক্ষিপ্ত মৃৎপিণ্ডের ন্যায় অচিরাৎ অতলে ডুবিতে হয়। ব্রাহ্মণের অনিষ্টাচরণ পরাভবের হেতু। দেখ, ব্রাহ্মণের শাপে ভগবান চন্দ্রমা কলঙ্কযুক্ত ও সমুদ্র লবণ জলে পূর্ণ এবং দেবরাজ ইন্দ্র প্রথমে সহস্র ভগ-চিহ্নে পরিব্যপ্ত হইয়া পরিশেষে আবার ব্রাহ্মণের কৃপায় সহস্র চক্ষু লাভ করিয়া ছিলেন॥ অনুশাসন পর্ব্ব, ৩৪ অধ্যায়॥

(গ) ব্রাহ্মণগণ জন্মাবধি সকলের নমস্য। * * * ব্রাহ্মণের তপো-বল, ক্ষত্রিয়ের বাহুবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ তপস্বী কেহ উগ্র স্বভাব, কেহ ক্ষিপ্রকারী, কেহ সিংহের ন্যায়, কেহ ব্যাঘ্রের ন্যায়, কেহ বরাহের ন্যায়, কেহ মকরাদি জলজন্তুর ন্যায়, কেহ বা সর্পের

ন্যায় প্রভাবশালী। উহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ আশীবিষ তুল্য উগ্র, কেহ কেহ বা নিতান্তই মৃদু, কেহ বাঙ্‌নিষ্পত্তি ও কেহ বা দর্শন মাত্রেই অপরকে বিনাশ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণগণ এইপ্রকার নানারূপ স্বভাব-সম্পন্ন হইলেও তাঁহাদিগের সকলকেই পূজা করা কর্ত্তব্য। মেকল, দ্রাবিড়, লাট, পৌণ্ড্র, কোন্নশির, শৌণ্ডিক, দরদ, দর্ব্ব, চৌল, শবর, বর্ব্বর, কিরাত ও যবন প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের কোপেই শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে॥ অনুশাসন পর্ব্ব, ৩৫ অধ্যায়॥

বিনা শ্রমে ব্রাহ্মণের ধন প্রাপ্তি বা দান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন

দেবগণ কহিয়াছেন,—ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ নির্ম্মিত শৃঙ্গ-সুশোভিত সহস্র ধেনু প্রদান করিলে মানবগণ নিঃসন্দেহে দেবলোক লাভ করিতে পারে। * * তিলময় ধেনু ব্রাহ্মণকে দান করিলে পরলোকে 'বসু লোক' লাভ হয়। * * যাহারা ইহলোকে ব্রাহ্ম বিধানানুসারে কন্যা দান ও ব্রাহ্মণকে ভূমি ও অন্ন দান করেন, পরলোকে তাঁহাদিগের ইন্দ্রলোক লাভ হয়। * * যিনি ইহলোকে ব্রাহ্মণকে ফল, পুষ্প ও বৃক্ষ প্রদান করেন, তিনি পর জন্মে উত্তম স্ত্রী ও নানাবিধ রত্নে বিভূষিত গৃহ লাভ করেন। * * আর যে ব্যক্তি ইহলোকে ব্রাহ্মণকে সুগন্ধযুক্ত বিচিত্র আস্তরণ ও উপাধান সম্বলিত শয্যা প্রদান করেন, তিনি পরজন্মে সৎ-কুলোদ্ভবা রূপবতী ভার্য্যা লাভ করিয়া থাকেন॥ অনুশাসনপর্ব্ব, ৫৭ অধ্যায়॥

অনুশাসন পর্ব্বের প্রথম দিকে ব্রাহ্মণের অলৌকিক শক্তির মিথ্যা আস্ফালন রচিত হইয়া যখন দেশবাসীর পক্ষে ব্রাহ্মণ একটা জীবন্ত ভীতি-প্রদ বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল, তখন 'দান মাহাত্ম্য' রচিত হইয়া অল্প শ্রমে ব্রাহ্মণের পক্ষে বেশী অর্থাগমের পথ অতি মাত্রায় সুগম করিয়া

দিয়াছিল। ইহকালে ব্রাহ্মণের প্রসন্নতায় অভ্যুদয় ও পরকালের জন্য স্বর্গের চাবি কাঠিটিও যখন ব্রাহ্মণের হাতে রহিল, তখন ব্রাহ্মণ জন্মিবা মাত্র দেবতারও দেবতা না হইয়া যে থাকিতে পারেন না, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

এই ভাবে দিন দিন ব্রাহ্মণগণ দেশের উপর আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন, রাজ শক্তিও ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণের করতলগত হইতে লাগিল।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের উন্নতি ও অবনতির মূলে রাজশক্তি

যে রাজশক্তির সহায়তা অত্যল্প সময়ের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম জগতে এতাদৃশ মান্য লাভ করিয়াছিল, সেই রাজশক্তি প্রায় হাজার বৎসর পরে বৌদ্ধগণের অতিমাত্রায় অনাচার দেখিয়া দেশ হইতে ব্যভিচারের শ্রোত দূর করিতে ব্রাহ্মণগণের সহিত যুক্ত হইলেন। ফলে তাসের ঘরের ন্যায় বৌদ্ধ সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া পড়িল, বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের বাহিরে যাইয় বিশ্রাম লাভ করিল।

ব্রাহ্মণ—বৌদ্ধ চুক্তি নামা

তারপর—পরাজিত কিন্তু সংখ্যায় অত্যধিক বৌদ্ধগণকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে স্থান লাভ করিতে যখন রাজশক্তি চাপ দিতে লাগিলেন, তখন কয়েকটি সর্ত্তে তাহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আশ্রয় করিতে সম্মত হইল পক্ষান্তরে বিজয়ী ব্রাহ্মণগণও কয়েকটি সর্ত্ত উপস্থিত করিলেন, যাহা না করিলে পরাজিত বৌদ্ধগণকে বর্ণাশ্রমধর্ম্মে গ্রহণ করা হইবে না তখন উভয় পক্ষে আলোচনার দ্বারা যাহা স্থির হইল, তাহা বেদে স্থান পাইল না, গৃহ্যসূত্রে লিখিত হইল না, মহাভারত, রামায়ণ বা পুরাণা দিতেও রক্ষিত হইল না। হইল,—খান কতক পুরাণ উপাধিধারী

উপপুরাণ মধ্যে। আর এই উপপুরাণে লিখিত চুক্তি গুলিই হইয়াছে,, রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণের অভ্রান্ত বেদবাক্য !! সেই আপ্তবাক্য বৃহন্নারদীয় [উপ] পুরাণ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ।ঃ—

সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণং
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযম স্তথা ॥ ২২।১৩ ॥
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্মধুপর্কে পশোর্বধঃ ।
মাংস দানং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা ॥২২।১৪ ॥
দত্তাক্ষতায়াঃ কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্য চ ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ ॥ ২২।১৫ ॥
মহা প্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মখং ।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্মনীষিনঃ ॥ ২২।১৬ ॥১

যাহারা ইতিহাসের সহিত পরিচিত নন, তাঁহারা উপরোক্ত উপ পুরাণের বচন হইতে জানিতে পারিলেন,—সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে যে সমুদ্র যাত্রা, কমণ্ডলু ধারণ বা সন্ন্যাস গ্রহণ, দ্বিজাতির [ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের] পক্ষে শূদ্র বা অন্ত্যজ কন্যা বিবাহ, বিধবার পক্ষে দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন, মধুপর্কে গাভী ও বৃষ বধ, শ্রাদ্ধে মাংস প্রদান, বানপ্রস্থাশ্রমে গমন, বিধবা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন, নরমেধ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, মহাপ্রস্থান বা বৃদ্ধ বয়সে আত্মহত্যা, যজ্ঞে গো-মাংস প্রদান ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত ও সমাজে প্রচলিত ছিল, তাহা বুধগণের ব্যবস্থায় কলিযুগের জন্য নিষিদ্ধ হইল।

উপরোক্ত উপ-পুরাণের মন্ত্রগুলি যে প্রকৃতপক্ষেই একখানি চুক্তিনামা তাহা বুঝিতে হইলে ঐ মন্ত্রগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন। এই

১। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত বৃহন্নারদীয় (উপ) পুরাণ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও অনুদিত।

মন্ত্রগুলি বিশ্লেষণ করিতে গেলেই দেখা যাইবে, কোন্ কোন্ বিষয়ের গতিরোধ করিবার জন্য কোন্ পক্ষের মাথা কত বেশী গরম হইয়াছিল।

চুক্তিনামা বিশ্লেষণ

১। যে সমুদ্র পথে বহির্ব্বাণিজ্য দ্বারা ভারতের ধন সম্পদ অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সেই সমুদ্র যাত্রার বিরুদ্ধে বৌদ্ধগণের আপত্তি উঠিবার কোন হেতু দেখা যায় না। এ অবস্থায় স্বীকার করিতে হইবে, ইহা ব্রাহ্মণগণেরই দাবী। এই দাবী উত্থাপনের দুইটি প্রকৃষ্ট হেতুও দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

(ক) পরাজিত বৌদ্ধগণ যাহাতে ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে গমন করিয়া ভারতীয় বৌদ্ধ-উৎসাদনের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী ঐ সকল দেশের বৌদ্ধ রাজশক্তিকে জানাইয়া তাঁহাদিগকে ভারতের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে না পারে।

(খ) পূর্ব্ব হইতেই ভারতের বাহিরে নানা আর্য্য উপনিবেশ স্থাপিত ছিল এবং ঐসকল উপনিবেশে বেদ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ সকলও গিয়াছিল। সুতরাং জলপথে কেহ যাইয়া যদি ঐ সকল দেশ হইতে বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র সকল এদেশে আনিয়া ফেলেন, তাহা হইলেই ভারতীয় বেদাদি শাস্ত্রের কোথায় কোন্ মন্ত্র ব্রাহ্মণবর্ণের সুবিধার জন্য প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা ধরা পড়িয়া যাইবে। অতএব এইদিক দিয়াও ব্রাহ্মণগণের আশঙ্কা কিছু কম ছিল না।

২। কমণ্ডলু ধারণ বা সন্ন্যাস গ্রহণ, ৯। দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন এই উভয় বিষয়েই বৌদ্ধগণের আপত্তির কোন কারণ দেখা যায় না। যেহেতু ব্রহ্মচর্য্য ও সংযম বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম ও দ্বিতীয় শিক্ষা। পক্ষান্তরে বৈদিকধর্ম্মে যখন ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস দৃষ্ট হয় না, কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের ঋষি ও উপাসকগণ সকলেই যখন বিবাহিত ছিলেন, তখন উহা বৈদিক আদর্শ

বিরুদ্ধ বলিয়া ব্রাহ্মণগণই আপত্তি তুলিয়া ছিলেন, এবং এই আপত্তিতে বৌদ্ধগণ যে কোন প্রতিবাদ তুলিতে পারেন নাই, তাহার কারণ,—পতনের যুগে বৌদ্ধ ভিক্ষু (ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী) ও ভিক্ষুণী যে ভাবে মদনোৎসবে মাতিয়া ছিলেন, তাহার পর ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসের কথা আর জোর করা চলে না !

৪। দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন, ৫। মধুপর্কে পশুবধ, ৬। শ্রাদ্ধে মাংস দান, ৭। বাণপ্রস্থাশ্রম, ১০। নরমেধ যজ্ঞ, ১১। অশ্বমেধ যজ্ঞ, ১২। মহাপ্রস্থান গমন বা পরিণত বয়সে রোগ ভুগিয়া না মরিয়া আত্মহত্যা করা, ১৩। গো-মেধ যজ্ঞ,—এই সকল বিষয়ে ব্রাহ্মণগণের আপত্তি করিবার কোন হেতু ছিল না। বরং এই সকল কর্ম্মে যে বেদপন্থী সমাজ তৎপর ছিল, তাহার প্রমাণ বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া, মহাভারত, রামায়ণ, মন্বাদি অনেক স্মৃতি ও অনেক পুরাণেই লিপিবদ্ধ আছে। পক্ষান্তরে অহিংস, নীতিবাদী বৌদ্ধগণ বৈদিকধর্ম্ম ও সভ্যতার এই সকল অঙ্গের ভীষণ বিরোধী। এমত অবস্থায় জানিতে হইবে, উপরোক্ত আটটি বিষয়ের গতিরোধে বৌদ্ধগণই আপত্তি তুলিয়াছিলেন। বাকী রহিল,—৩। দ্বিজাতিদিগের অসবর্ণা কন্যা বিবাহ, এবং ৮। দত্তা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ। এই উভয় বিধ কর্ম্ম উভয়পক্ষের সম্মতিতে সম্ভব হইয়াছিল। প্রথম ব্যবস্থাটির উদ্দেশ্য,—অনার্য্য সংশ্রব ত্যাগ করা। দ্বিতীয় ব্যবস্থা দেখিয়াই মনে হইবে, সমাজে কুমারী সংখ্যা তখন অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

চুক্তিনামার পরে

এই চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হইবার পরে সত্য যাহা ঘটিয়াছিল, অতঃপর তাহাই সংক্ষেপে বলিতে হইবে ।ঃ—

(ক) যে ধর্ম্মমত লইয়া প্রায় হাজার বৎসর আর্য্যাবর্ত্ত দুইভাগে

বিভক্ত হইয়া একদল বুদ্ধদেব ও অন্যদল বেদ আশ্রয় করিয়া কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহার অবসান হইল। ভাইয়ে ভাইয়ে পুনরায় মিলন হইল।

(খ) এই মিলনের মূল্য বাবদ দেশ লাভ করিল—এক জগা খিচুরী ধর্ম্মমত, যাহা না বৌদ্ধ, না বৈদিক।

(গ) অনার্য্য সংশ্রব হইতে আর্য্যগণের দূরে অবস্থান।

(ঘ) ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে নূতন নূতন প্রক্ষিপ্ত মন্ত্রের শুভাগমন।

ব্রহ্মা কাল্পনিক দেবতা *

বৌদ্ধ প্রভাব ভারতে হতমান হইবার পরে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নূতন করিয়া প্রবর্ত্তিত হইল। পুরাতন পদ্ধতির উপরে নূতন উপসর্গ যুক্ত হইল।ঃ—

প্রথম উপসর্গ ব্রহ্মা! সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তাঁহার কথা বলা প্রয়োজন। কারণ এই ব্রহ্মাকে আশ্রয় করিয়াই মনুসংহিতায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন। এই জন্য আমাদিগকে বেশীরভাগ মনুসংহিতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

ব্রহ্মার উৎপত্তি সম্বন্ধে মনু সংহিতায় লিখিত আছে,—"সেই পরমাত্মা ইচ্ছামাত্র জল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে আপন শক্তিরূপ বীজ অর্পন

* বৈদিক দেবতার মধ্যে ব্রহ্মা নামে কোন দেবতা নাই। বৈদিক দেবতায় সংখ্যা মোট তেত্রিশ। যথা,—

অষ্টবসু ঃ—ধর, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, প্রত্যুষ ও প্রভাস।

একাদশ রুদ্র ঃ—অজ, একপাৎ, অহিবুধ্ন্য, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হরণ, ঈশ্বর।

দ্বাদশ রুদ্র ঃ—বিবস্বান, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ মিত্র, শক্র, উরুক্রম। দ্যু ও ইন্দ্র। মোট তেত্রিশ।

করিলেন (১।৮), অর্পিত বীজ একটি অণ্ডে পরিণত হইল, সেই অণ্ড হইতে সর্ব্বলোকের পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন (১।৯), সেই পরম পুরুষ হইতে উৎপন্ন অণ্ডজাত পুরুষ ব্রহ্মা নামে খ্যাত হইলেন (১।১১)।

ইহার পর প্রথম অধ্যায়ের ১৩ শ্লোক হইতে ৩০ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্রহ্মা কেমন করিয়া স্বর্গাদি লোক, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সমুদয় ভূতের সৃষ্টি (১।১৬) করিলেন, সেই কাহিনী লিখিত হইল। ইহার মধ্যে কিন্তু ব্রাহ্মণাদি কোন বর্ণেরই উল্লেখ নাই। তার পরে লিখিত হইল,—

লোকনান্ত বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ ॥ ১।৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ :—"লোক সকলের বৃদ্ধির নিমিত্ত মুখ, বাহু, উরু ও পাদদেশ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সৃষ্ট হইল।" কাহার মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদি সৃষ্ট হইল, মূলে সে কথাটির উল্লেখ নাই। কিন্তু এই অধ্যায়ের অন্যত্র আছে,—

সর্ব্বস্যাস্য তু সর্গস্য গুপ্তর্থ্যং স মহাদ্যুতিঃ।
মুখবাহূরুপজ্জানাং পৃথক্ কর্ম্মাণ্যকল্পয়ৎ ॥ ১।৮৭ ॥

বঙ্গানুবাদ :—"সেই মহাদ্যুতি সৃষ্টির পরিপালন নিমিত্ত মুখজাত [ব্রাহ্মণ], বাহুজাত [ক্ষত্রিয়], উরুজাত [বৈশ্য] ও পাদজাতগণের [শূদ্র] পৃথক পৃথক কর্ম্ম কল্পনা করিলেন।" এখানে 'মহাদ্যুতি' শব্দটি রহিয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মা কথাটা ১।৩১ অথবা এই শ্লোকের মধ্যে যে বলা হয় নাই, তাহা সকলেই দেখিলেন। এই মহাদ্যুতির ব্যবস্থায় ধার্য্য হইল,—

১। ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ [এই ষট্ কর্ম্ম] করিবে ॥ ১।৮৮ ॥

২। ক্ষত্রিয় প্রজাপালন, দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, ভোগের বিষয়ে সাধ্যমত সংযম করিবে ॥ ১।৮৯ ॥

৩। বৈশ্য পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন. বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম ও সুদে ধন বৃদ্ধি করিবে ॥ ১।৯০ ॥

৪। শূদ্রের জন্য প্রভু ব্যবস্থা করিলেন,—অসূয়াবিহীন হইয়া অপর বর্ণ সকলের সেবা করিবে ॥ ১।৯১ ॥

ব্রহ্মার উৎপত্তি সম্বন্ধে মনু সংহিতার সহিত মহাভারতের ঐক্য আছে। কিন্তু নারায়ণের শক্তিতে মুখাদি হইতে যে ব্রাহ্মণাদি, কিম্বা কেশবের মুখাদি হইতে শত ব্রাহ্মণাদি অথবা ব্রহ্ম হইতে প্রথমতঃ ব্রাহ্মণের উৎপত্তি এবং পরে সেই ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উদ্ভব এসকল কথার সহিত মনু সংহিতার কোন ঐক্য দেখা যায় না। মনু সংহিতায় দেখা যায়, লোক বৃদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণাদি মুখাদি হইতে জন্মিয়াছেন [কাহার মুখ, তাহা বলা হয় নাই], আর মহাদ্যুতি সেই মুখাদি জাত ব্রাহ্মণাদির জন্য পৃথক কর্ম্ম ভাগ করিয়াছিলেন।

যাহা বেদে ছিল না, যাহা গীতায় উক্ত হয় নাই, সেই কর্ম্মের মধ্যে ছোট বড় দেখাইতে যাইয়া বা প্রকান্তরে ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য মনু সংহিতায় লিখিত হইল,—

(ক) পুরুষের নাভীর ঊর্দ্ধভাগ পবিত্রতর, মুখ পবিত্রতম একথা স্বয়ম্ভূব কহিয়াছেন ॥ ১।৯২ ॥

(খ) একে ব্রাহ্মণ উত্তমাঙ্গ [মুখ] হইতে উৎপন্ন বলিয়া জ্যেষ্ঠ এবং বেদাদির মালিক ও স্বর্গলাভের সেতু বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রভু [শ্রেষ্ঠ] হন ॥ ১।৯৩ ॥

(গ) ব্রাহ্মণের দেহ সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম্মের মূর্ত্তি, ধর্ম্মের জন্য উৎপন্ন ব্রাহ্মণ মোক্ষলাভের উপযুক্ত পাত্র হন ॥ ১।৯৮ ॥

(ঘ) জগতে যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, সমুদয়ই ব্রাহ্মণের নিজেদের

তুল্য : অতএব ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া সমুদয় সম্পত্তি প্রাপ্তির যোগ্য হন॥ ১।১০০ ॥

উপরের ব্যবস্থার মধ্যে লজিক (যুক্তি) নাই, ম্যাজিক [যাদুবিদ্যা] আছে। এই যাদুমন্ত্র আবৃত্তি করিয়া হাজার বৎসর ব্রাহ্মণগণ সমাজ শোষণ করিয়াছেন আর দম্ভ করিয়া মনুর বচন উদ্ধৃত করিয়া সমাজকে শুনাইয়াছেন,—

১। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ যত্নসহকারে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন এবং শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইবেন॥ ১।১০৩॥ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বর্ণের অধ্যাপনার অধিকার নাই। কেন নাই, ইহার উত্তর মনু সংহিতায় নাই।

২। ব্রাহ্মণ বিদ্বান হউন বা অবিদ্বান হউন, সকলের (বর্ণত্রয়ের) পরম দেবতা, যেমন সংস্কৃত অথবা অসংস্কৃত অগ্নি মহাদেবতা॥ ৯।৩১৭ ॥

৩। ব্রাহ্মণেরা যদি নিন্দিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তথাপি সকলের পূজ্য, যেহেতু ব্রাহ্মণ পরম দেবতা স্বরূপ॥ ৯।৩১৯ ॥

যদিও কোন কোন জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থে 'ব্রহ্মার' (দেবতা) উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তবুও সমগ্র শাস্ত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভারতীয় যুগের শেষ পর্য্যন্ত যজ্ঞপ্রিয় বেদপন্থীগণ ব্রহ্মা অর্থে ঋত্বিক্ বা পুরোহিতই জানিত। ব্রহ্মা নামে কোন যজ্ঞভাক্ বৈদিক দেবতা যে আছেন একথা বেদপন্থীগণ জানিত না।

দর্শন শাস্ত্রের আবির্ভাবের পরে যখন প্রকৃতিকে ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়া সকলে শুনিল এবং সেই তিন গুণকে সকলে সত্ত্ব, রজ ও তম বলিয়া জানিল, তখন সত্ত্ব গুণের প্রতীক বিষ্ণুকে ধার্য্য করিয়া পুরাণে বিষ্ণুর মহিমা গীত হইল, তমোগুণের বা সংহারের প্রতীক শিবকে ধার্য্য করিয়া পুরাণে শিবের মহিমা কীর্ত্তন হইল, কিন্তু রজগুণের বা সৃষ্টির প্রতীক

বলিয়া যখন কোন বৈদিক দেবতা পাওয়া গেল না, তখন বেদের ঋত্বিক্ ব্রহ্মাকে পুরাণে রজগুণের প্রতীকরূপে একেবারে দেবতা করা হইল এবং এই কাল্পনিক দেবতাকে সত্য দেবতা দেখাইবার জন্য অসংখ্য প্রক্ষিপ্ত মন্ত্র শাস্ত্র মধ্যে যুক্ত করা হইল। মনুসংহিতায় যেমন অণ্ড হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি দর্শান হইয়াছে, মহাভারত ও নানা পুরাণে ঠিক সেই কথাই লিখিত আছে। অধিকন্তু আরও অনেক কথাই আছে। আর বর্ণাশ্রম স্থাপন প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় যাহা ঠারে ঠোরে বলা হইয়াছে, মহাভারতে সে কথা একেবারে খোলাখুলি ভাবে বলা হইল। দেশবাসী সবিস্ময়ে শুনিল,—

১। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহু-যুগল হইতে, বৈশ্য উরুদ্বয় হইতে এবং তিন বর্ণের সেবার জন্য চতুর্থবর্ণ শূদ্র পাদদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে॥ শান্তিপর্ব্ব, ৭২ অধ্যায়॥

২। ধর্ম্মবিদ্ ব্যক্তিগণ ইহাই জানেন যে, লোকস্রষ্টা প্রজাপতির মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদদেশ হইতে শূদ্র সৃষ্ট হইয়াছে॥ শান্তিপর্ব্ব, ২৯৬ অধ্যায়॥

৩। ব্রহ্মার আস্য হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে॥ শান্তিপর্ব্ব, ৩১৯॥

এই সকল উক্তির বৈদিক প্রমাণ রক্ষা করিতে যাইয়া শ্রুতিতেও নানা নজীর রক্ষা করিতে হইল। ফলে অভ্রান্ত বেদের কলঙ্ক ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।ঃ—

(ক) যজুর্ব্বেদ সংহিতার সপ্তম কাণ্ডে আছে,—তিনি (পরম পুরুষ) নিজের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, রাজন্য ও বৈশ্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

(খ) অথর্ব্ববেদে উক্ত আছে,—ব্রাত্য হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, সৃষ্ট হইয়াছে॥ ১৫।১০।১—৩॥

(গ) এক তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেই তিন স্থানে তিন রকম উক্তি রহিয়াছে ।ঃ—

(১) এই সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। কেহ বলেন,—ঋগ্বেদ হইতে বৈশ্য, যজুর্ব্বেদ হইতে ক্ষত্রিয় এবং সামবেদ হইতে ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হইয়াছে ॥ ৩।১২।৯।২ ॥

(২) দেবগণ হইতে ব্রাহ্মনবর্ণ ও অসুরগণ হইতে শূদ্রবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১।২।৬।৭ ॥

(৩) অসৎ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ৩।২।৩।১ ॥

(ঘ) পুরুষসূক্ত—এই সূক্ত ঋগ্বেদ [১০।৯০।১২], শুক্ল যজুর্ব্বেদ [৩১।১৬] ও অথর্ব্ববেদে [১০।৬।৬] আছে। তিনই প্রায় এক-প্রকার, অর্থও সুতরাং একই রকম। যথা,—ব্রাহ্মণ খণ্ডিত পুরুষ পশুর মুখ হইল, রাজন্য বাহু হইল, বৈশ্য উরু হইল, পাদদেশ হইতে শূদ্র উদ্ভূত হইল।১ এই মন্ত্রটিকে ব্যাকরণ সম্মত ভাবে অন্বয় করিলেই দেখা যাইবে,—পরম পুরুষকে পশু কল্পনা করিয়া যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য নামে তিন শ্রেণীর মানুষ বিদ্যমান ছিল, যাঁহারা সময় মত কেহ মুখ, কেহ বাহু, কেহ উরু হইয়াছিল, কিন্তু একমাত্র শূদ্রই পুরুষ পশুর পাদদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

সৃষ্টিতত্ত্বে অদার্শনিক সিদ্ধান্ত

উপরোক্ত অদার্শনিক কথাগুলি ব্রাহ্মণগণ হিন্দু ভারতে পুরুষানুক্রমে জানাইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কদাচ ভুলিয়াও বলেন নাই যে,—মহা-ভারতে বশিষ্ট কহিয়াছেন, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হইতে সম নিয়মে দেব,

১। ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত ॥

দানব ও মানব উদ্ভূত হইয়াছে [শান্তিপর্ব্ব, ৩০৩ অধ্যায়], অথবা ইহাও কখন বলিতে কেহ শুনেন নাই যে, মহাভারতে লিখিত আছে,—ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিবার অভিলাষ করিয়া লোচন যুগল হইতে অগ্নি ও চন্দ্রের সৃষ্টি করিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত প্রজা সৃষ্টি হইলে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণ বিভাগ কল্পিত হইল। চন্দ্র ব্রাহ্মণ ও অগ্নি ক্ষত্রিয় স্বরূপ হইল [শান্তিপর্ব্ব, ৩৪৩ অধ্যায়], কিম্বা কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ কখন বলেন নাই—ওহে বাপু! মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদি জন্মিয়াছে, উহা একেবারেই বাজে কথা। এই দেখ শাস্ত্রে কি লেখা আছে :—

অযোনি সন্তান—অসম্ভব কথা

(ক) বামাগণ আত্মার [দেহের] সনাতন পবিত্র জন্মক্ষেত্র. ঋষিদিগেরও এমন শক্তি নাই যে, স্ত্রী ব্যতিরেকে প্রজা সৃষ্টি করিতে পারেন মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৭৪ অধ্যায় ॥

(খ) নারীগণ স্বভাবতঃ অপত্যোৎপত্তির ক্ষেত্র ভূত, নর সকল ক্ষেত্রজ্ঞ ॥ মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২১৩ অধ্যায় ॥

মৎস্য পুরাণে আছে,—স্ত্রীজাতি ব্যতীত জীব সৃষ্টি হয় না ॥ ১৫৪ অধ্যায় ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে,—স্ত্রী ভিন্ন [প্রজা] সৃষ্টি হয় না। শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ড, ৬১ অধ্যায় ॥

ব্যাস সংহিতায় আছে,—পুরুষ যাবৎ দারপরিগ্রহ না করে, তাবৎ অর্দ্ধ শরীর বিশিষ্ট থাকে। সেই অর্দ্ধমাত্র শরীর হইতে প্রজা সৃষ্টি হইতে পারে না। দার পরিগ্রহ করিলে তখন সম্পূর্ণ শরীর হয়, আর তখনই প্রজা উৎপন্ন হইতে পারে ॥ ২।১৪ ॥

মনু সংহিতায় আছে,—নারী ক্ষেত্র স্বরূপ এবং পুরুষ বীজ স্বরূপ—

ক্ষেত্র ও বীজ এই উভয়ের সংযোগে যাবতীয় শরীরী সমুৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৯।৩৩ ॥

উপরোক্ত শাস্ত্র বচন সকল গ্রন্থ মধ্যে থাকিবার পরেও কোন্ সাহসে যে অযোনি সম্ভবা সীতা, দ্রোণ, কার্ত্তিকেয়, কৃপ, কৃপী প্রভৃতির অলৌকিক জন্ম লিখিত হইয়াছিল, তাহারা আমরা ভাবিয়া পাই না!

ব্রাহ্মণের শাস্ত্রাধিকার

আজ আর একথা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই যে, আচার্য্য শঙ্করের [জন্ম ৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ] বৌদ্ধ বিজয়ের পর হইতে বেদাদি শাস্ত্র সকল বিশেষভাবে ব্রাহ্মণের অধিকারে আসিয়াছিল। সুতরাং গত ১২শত বৎসর ধরিয়া ক্রিয়া কর্ম্ম সামাজিক ব্যাপারের সকল ব্যবস্থাদিই ব্রাহ্মণে দিয়া আসিতেছেন।

একে শাস্ত্রাদি বৈদিক ও সংস্কৃত (Reformed) ভাষায় লিখিত, তাহাতে আবার দেশ হইতে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা বৌদ্ধ ও মুসলমান রাজত্বে প্রায় লোপ হইবার উপক্রম, তবুও সমগ্র দেশে যে কয়েকটি 'টোল' ছিল, তাহাতে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের ছাত্র লওয়া হইত না। তদুপরি শাস্ত্রগ্রন্থ সকল ব্রাহ্মণের অধিকারে ছিল বলিয়া, এই সুদীর্ঘকাল অব্রাহ্মণ বর্ণের পক্ষে শাস্ত্র পাঠ করা সম্ভব হয় নাই।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

প্রায় সকল দেশের লোকেই বলিয়া থাকে,—'বোকাদের বুদ্ধিমানেরা মারেন, আর বুদ্ধিমানদিগকে ভগবান্ মারেন। এই প্রবাদটি বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণের কৃপায় ভারতবাসীর ভাগ্যে কতদূর সফল হইয়াছিল এবং অবশেষে বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণের ভাগ্যে শ্রীভগবানের মার কোন্ পথে আরম্ভ হইয়াছে, এই গ্রন্থে তাহাও সকলে দেখিতে পাইবেন।

অব্রাহ্মণগণকে সম্মোহিত করিয়াছিল—গুরু, পুরোহিত ও কথকঠাকুরের দল

অব্রাহ্মণগণ জন্ম হইতে ব্রাহ্মণকে দেবতার অধিক মান্য করিতে, ব্রাহ্মণকে দান করিয়া স্বর্গলাভ করিতে, ব্রাহ্মণের পদোদক পান করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইতে, ব্রাহ্মণের প্রসন্নতা লাভের জন্য সকল রকম অবিচার ও অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে যে শিখিয়াছিল, তাহার শিক্ষক ছিলেন,—গুরু, পুরোহিত ও কথক ঠাকুরের দল। অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ব্রাহ্মণ্য-প্রধান্যের উপাদান সকল শাস্ত্র মধ্যে লিখিত হইয়াছিল। পরে সেই সকল কথাই গুরু, পুরোহিত ও কথক ঠাকুরদের মুখে শুনিয়া শুনিয়া ব্রাহ্মণের সুখ সুবিধার অনুকূলে দেশবাসী সম্মোহিত হইয়া আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল।

বৌদ্ধ রাষ্ট্রে স্মৃতিরাষ্ট্র

ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর রাজ্যমধ্যে বসবাস করিয়াও ধর্ম্মের নামে শাস্ত্র সহায়ে রাষ্ট্রের মধ্যেও যে ভিন্ন রাষ্ট্র গঠন করা যায়, বৌদ্ধ-রাজগণের অধীনে ব্রাহ্মণগণ স্মৃতি প্রণয়ন করিয়া বেদপন্থী সমাজকে বৌদ্ধ উপ-প্লাবনের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বৌদ্ধ রাষ্ট্র মধ্যে যে স্মৃতিরাষ্ট্র (State within state) গঠন করিয়াছিলেন, প্রাচীন ইতিহাসে ইহার তুলনা একান্তই বিরল।

হিন্দু শব্দের উৎপত্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ

বৌদ্ধ যুগের প্রথম তিন শতাব্দীর মধ্যে গ্রীক্ বীর আলেক্জেণ্ডার

ভারত আক্রমণ করিতে আসিয়া সিন্ধুনদীর তীরবর্ত্তী ভারতবাসীকে প্রথম 'হিন্দু' নামে অভিহিত করেন। ঋগ্বেদে যে 'সপ্তসিন্ধুর' কথা আছে, পরাশীকদের জেন্দাবেস্তা গ্রন্থে তাহাই 'হপ্তহিন্দু' নামে লিখিত আছে। সুতরাং আলেক্জেণ্ডার যখন পারস্য জয় করিয়া ভারত আক্রমণে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি ভারতবাসীকে 'হিন্দু' নামেই অভিহিত করিয়াছিলেন। ভারতবাসী কিন্তু তখনও নিজকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে শিখে নাই। গ্রীকদের গ্রন্থে হিন্দু শব্দের অর্থ বীর্য্যবান্, শ্বেতকায়, অতিথি পরায়ণ, সত্যবাদী ভারতবাসী।

দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে রাজকার্য্যের সৌকর্য্যার্থ ভারতবাসীর নাম সরকারী কাগজপত্রে ধার্য্য হইল,—হিন্দু। তারপর ভারতবাসী, মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পরে ধার্য্য হইল,—অমুসলমান মাত্রেই হিন্দু। তখন পারশীক অভিধানে হিন্দু শব্দের অর্থ লিখিত হইল,—ক্রীতদাস, চোর, বঞ্চক। একদা বিজয়ী আর্য্যগণ ভারত জয় করিয়া ভারতবাসীর নামকরণ করিয়াছিল—দস্যু, দাস, নিষাদ, রাক্ষস প্রভৃতি। আর মুসলমানগণ ভারত জয় করিয়া আর্য্য ও অনার্য্যকে এক সূত্রে বাঁধিয়া নাম রাখিল,—কাফের, ক্রীতদাস, বঞ্চক। ইহাকেই বলে প্রকৃতির পরিহাস!

ভারতে কত বিদেশী আসিল, কেহ পলাইয়া গেল, কেহ বা হিন্দুর মধ্যে মিলাইয়া গেল, কেহ রাজ্য স্থাপন করিয়াও ডুবিয়া গেল। কিন্তু কোন রাজশক্তি সেই স্থবিরাষ্ট্র ভাঙ্গিতে পারিল না। শেষ মোগল, পাঠান, শিখ, মারাঠা, রাজপুত প্রভৃতি সকলেই ইংরাজের অধীনে আসিল। সেই সময় 'হিন্দু' নামটিকে শাস্ত্রীয় দেখাইবার জন্য মেরুতন্ত্রের ২৩ পটলে লিখিত হইল, ঃ—

> পশ্চিমাম্নায়মন্ত্রাস্তু প্রোক্তাঃ পারস্য ভাষয়া।
> অষ্টোত্তরশতাশীতির্যেষাম্ সংসাধনাৎ কালৌ॥

পঞ্চখানাঃ সপ্ত মীরা নব শাহা মহাবলাঃ।
হিন্দুধর্ম্ম প্রলোপ্তারো জায়ন্তে চক্রবর্ত্তিনঃ॥
হীনঞ্চ দূষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে প্রিয়ে।
পূর্ব্বাম্নায়ে নবশতঃ ষড়শীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
ফিরঙ্গ ভাষয়া মন্ত্রাস্তেষাং সংসাধনাৎ কলৌ।
অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতাঃ।
ইংরেজা নবষট্ পঞ্চ লণ্ড্রজশ্চাপি ভাবিনঃ॥

বলা বাহুল্য,—এই মন্ত্র প্রাচীন নহে। ইংরাজেরা এদেশে আসিবার পরে ইহা রচিত হইয়াছিল।

গোবধে বিরত করিবার অদ্ভূত উপায়

ইতিহাসের সহিত শাস্ত্র মিলাইয়া দেখিলে, ইহাই প্রতীত হইবে যে, ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ চুক্তি নামা স্বাক্ষরিত হইবার পরে ভারতের পশ্চিম প্রান্তস্থিত সিন্ধুপ্রদেশ গো-আবরণের যুদ্ধে মুসলমানগণ হস্তগত করিয়াছিল। অর্থাৎ যে সময় মুসলমানগণ একপাল গরু সম্মুখে রাখিয়া সিন্ধুদেশের হিন্দু নরপতিকে আক্রমণ করিয়াছিল, তখন হিন্দুগণ গাভীকে মাতা ও বৃষকে পিতা জ্ঞানে ভক্তি করিতে বিলক্ষণ শিখিয়াছিল এবং ইহাও দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছিল যে,—গোহত্যাকারীর ইহ-পর কোন কালেই কল্যাণ নাই। অনন্ত নরক ও অনন্ত দুঃখ তাহাকে অনন্তকাল গ্রাস করিয়া থাকিবে। কেমন করিয়া এমন অসম্ভব সম্ভব হইল, ভাবিতে গেলে ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তিনামায় যে মধুপর্কে গাভী বা বৃষ বধ„ অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ নিষিদ্ধ হইয়াছিল, তাহাই হইল মূল কারণ। এবং যাহাতে ভবিষ্যত ভারতে আর বৈদিক পশুযাগ প্রতিষ্ঠা না হইতে পারে, তাহার জন্য নূতন করিয়া রচিত হইয়াছিল,

কতগুলি প্রক্ষিপ্ত মন্ত্র, যাহা ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ও কথকঠাকুরগণ ক্রমাগত দেশবাসীকে শুনাইয়া ঐ প্রকার সংস্কার লাভ করিতে বাধ্য করিয়াছিল।১ সেই সকল মন্ত্র হইতে কয়েকটি মাত্র মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।ঃ—

১। মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ।
প্রনুবোচং চিকিতুষে জনায় মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ট ॥ ঋগ্বেদ ॥

অর্থাৎ—যিনি রুদ্রগণের মাতা, বসুগণের দুহিতা, আদিত্যগণের ভগিনী, অমৃতের আবাসস্থল, হে জনগণ! সেই নির্দোষ অদিতি গাভীকে বধ করিও না ॥৮।১০১।১৫॥

এই গ্রন্থের প্রথম দিকে সকলেই দেখিয়াছেন, ঋগ্বেদের কত মন্ত্রে গাভী, বৃষ, অশ্ব প্রভৃতি পশু মাংস ব্যবহারের উল্লেখ আছে এবং এই ঋগ্বেদেই শবর ঋষি বলিয়াছেন,—"গাভীগণ আপনার শরীর দেবতা দিগের যজ্ঞের জন্য দিয়া থাকে [১০।১৬৯।৩]," সে কথা রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা শুধু বলেন,—মাতা রুদ্রাণাং ইত্যাদি।

২। মধুপর্কে গোবধ প্রসঙ্গে বলেন,—আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে

১। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন,—শাস্ত্রের মধ্যে নরমেধ যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং গোমেধ যজ্ঞের কথা আছে। নরমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার একমাত্র অধিকারী হইলেন,—রাজা। নরমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ জনবল ও অর্থবল সাপেক্ষ। গো-মেধ যজ্ঞ ছিল,—জনসাধারণ হইতে রাজা পর্য্যন্ত সকলেরই জন্য। সুতরাং যে যজ্ঞ সকলের পক্ষে সম্ভব এবং যাহার উপকরণ গোমাংস, সেই গোমেধ যজ্ঞ যাহাতে এ ভারতে আর পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইতে না পারে, তাহারই জন্য গাভীকে মাতা বলিয়া ডাকিতে ও ভাবিতে নূতন করিয়া সমাজকে শিখান হইয়াছিল। সেই শিক্ষা এখন সংস্কারে এমনই পরিণত হইয়াছে যে, গোমাংসের নাম শুনিলেই হিন্দুমন ঘৃণা ও ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

আছে,—"মা গা-মনাগা নদিতিং বধিষ্ট" অর্থাৎ 'নিরপরাধা গাভীকে বধ করিও না' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বিশিষ্ট অতিথি বলিবেন,,— "উৎসৃজ গামত্ত তৃণানি পিবতুদকম্," 'গাভীর বন্ধন মুক্ত কর,, সে ঘাস জল খাউক।'

মধুপর্কের কথাটা খুলিয়া বলা প্রয়োজন। আর্য্যবর্ণের মধ্যে প্রথমে, এবং পরে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বর্ণের সময়েও বিশিষ্ট অতিথি গৃহে আগমন করিলে, পাদ্য অর্ঘ দ্বারা পূজা করিয়া দুইটি পাত্রে মধু ও দধি দিতে হইত। পরে অতিথির দৃষ্টিপথে একটি গাভী বা বৃষ রাখিতে হইত। বিশিষ্ট অতিথি মন্ত্র পাঠ করিয়া মধু ও দধি পান করিয়া গাভীর দিকে চাহিয়া মন্ত্র পাঠকরতঃ 'ওঁ কুরু' বলিলে, তখন গাভীটিকে বধ করা হইত। অতিথির আদেশে গোবধ হইত বলিয়া অতিথির অপর নাম,—গোঘ্ন। তারপর গোমাংস দ্বারা অতিথি-সৎকার হইত। এই জন্য ঐ আশ্বালায়ন গৃহ্যসূত্রেই আছে,—"নামাংসো মধুপর্কো ভবতি ভবতি," অর্থাৎ বিনা মাংসে মধুপর্ক হয় না, হয় না।

আশ্বালায়ন গৃহ্যসূত্রের 'নামাংসো মধুপর্কো ভবতি ভবতি মন্ত্রটি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ বেমালুম চাপিয়া রাখিয়া সমাজকে শুনাইয়াছিলেন,—উৎসৃজ গামত্ত তৃণানি ইত্যাদি' যে মন্ত্র একেবারেই প্রক্ষিপ্ত।

মহাভারতে গোমাংস ভক্ষণের বিধি

মহাভারতে রাজসূয় যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ, ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমিত্ত প্রতিদিন দ্বিসহস্র গো-বধ, মধুপর্কে গাভী বধ, শ্রাদ্ধ প্রকরণে মৎস্য, পক্ষী, হরিণ, অজ, বরাহ, মহিষ, গো প্রভৃতি মাংস ভক্ষণের কথা যেমন আছে, তেমন বৌদ্ধ প্রভাবে মাংস আহারের বিরুদ্ধে অনেক কথাও লিখিত আছে। আর আছে, গাভীকে মাতা ও বৃষকে পিতা বলিয়া জানিবে

রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বকার কথাগুলি চাপিয়া রাখিয়া দেশকে শুনাইয়াছেন—গো মাতা, বৃষ পিতা।

বৈদিক যজ্ঞ অচল করিবার জন্য মিথ্যা কলিযুগের দোহাই

মনুসংহিতায় গো মাংস, মহিষ মাংস, বরাহ মাংস প্রভৃতি ভোজনের কথা আছে। আর চুক্তির ফলে লিখিত হইয়াছিল,—গো হত্যায় কঠোরতম প্রায়শ্চিত্ত বিধি। ব্রাহ্মণগণ মধুপর্ক ও শ্রাদ্ধে বরাহ, মহিষ ও গোমাংসের কথা চাপিয়া রাখিয়া দেশকে মাত্র প্রয়াশ্চিত্ত বিধিই শুনাইয়াছিলেন। আরও শুনাইয়াছিলেন,—

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমূচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌযুগে ॥ ১।৮৬ ॥

অর্থাৎ সত্যযুগে তপস্যাই প্রধান ধর্ম্ম ছিল, ত্রেতায় জ্ঞানই প্রধান ধর্ম্ম ছিল, দ্বাপরে যজ্ঞই প্রধান ধর্ম্ম ছিল, কলিতে কেবলমাত্র দানই প্রধান হয়।

এই মন্ত্রটি এমন সুকৌশলে লিখিত হইয়াছে, যাহার অর্থ দুই ভাবেই গ্রহণ করা যাইতে পারে।ঃ—

(ক) তপস্যা, জ্ঞান, যজ্ঞ, দান এ সমস্ত কর্ম্ম বেদবিহিত হইলেও সত্যযুগে লোকের তপস্যায়, ত্রেতায় জ্ঞানলাভে এবং দ্বাপরে যজ্ঞে অনু-রাগ ছিল। কিন্তু কলিকালে লোকের দানে সমধিক অনুরাগ দৃষ্ট হয়।

(খ) তপস্যা, জ্ঞান, যজ্ঞ, দান এই সমস্ত কর্ম্ম বেদ বিহিত হইলেও যুগ ভেদে সত্যযুগের জন্য তপস্যা নির্দ্দিষ্ট ছিল, ত্রেতাযুগে জ্ঞানলাভ

করিতে হইবে ধার্য্য ছিল, দ্বাপরে যজ্ঞ ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু কলিকালে দানই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

যে কেহ সমগ্র বেদ ও মহাভারতাদি গ্রন্থের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই দেখিতে পাইবেন, ঋগ্বেদ যে সময়ে লিখিত হইয়াছিল, সেই সময় হইতে বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণ করিবার পরেও ভারতে অধিক সংখ্যক লোক পশুযাগে উৎসাহী ছিল এবং মুষ্টিমেয় লোক অরণ্যে থাকিয়া ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে তৎপর ছিল। তপস্যা বলিতে যাহা বুঝা যায়, উহা বৈদিক ধর্ম্মের অঙ্গ ছিল না, উহা ছিল বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই অঙ্গ। আরও দেখিতে পাইবেন,—

(১) বেদে যুগ বিভাগ নাই। অর্থাৎ অনন্তকালকে ভাগ করিয়া দেখাইবার মত দুঃসাহস বৈদিক ঋষিগণ দেখান নাই।

(২) যুগ-বিভাগ-জনিত কর্ম্মের বিভাগ হইবে, এমন কথাও বেদে নাই।

উপরোক্ত বিষয় দুইটি বেদ পাঠ না করিয়াও যদি কেহ অবগত হইবার জন্য বিশ্বস্থ লোকের অভিমত জানিয়া নিজ মত গঠন করিতে চাহেন, তিনি মনুসংহিতার ভাষ্যকার আচার্য্য মেধাতিথির ভাষ্য পড়িয়া দেখিলে অনেক কথাই জানিতে পারিবেন। উপরোক্ত তপঃ পরং কৃত-যুগে মন্ত্রের ভাষ্যে বেদজ্ঞ ভাষ্যকার আচার্য্য মেধাতিথি লিখিয়াছেন,—

"অয়মন্যো যুগ স্বভাবভেদঃ কথ্যতে। তপঃ প্রভৃতীনাং বেদে যুগভেদন বিধানাভাবাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বাণ্যনুষ্ঠেয়ানি ইত্যাদি।

বঙ্গানুবাদ ঃ—"অন্য অন্য যুগের স্বভাব ভেদ কথিত হইতেছে। তপঃ প্রভৃতি যুগভেদে আচরণ করিবার পার্থক্যের কথা বেদে না থাকায়, ঐ সকল কর্ম্ম সর্ব্বদা সকলের দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়া বিধেয়। [যাহা বেদে নাই তাহাই], ইতিহাসে সীমাবদ্ধ হইয়া বর্ণিত হইবার কারণ, সত্যযুগে মানুষ নীরোগ ও দীর্ঘায়ু ছিল বলিয়া তপস্যা করিতে

সক্ষম ছিল, এই জন্য সত্যযুগে তপস্যাই প্রধান ধর্ম্ম ছিল। [সত্য-যুগের তুলনায়] মানুষ ত্রেতাযুগে শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়াছিল—এই জন্য মনঃ সংযোগ করিয়া জ্ঞানের চর্চ্চাই আনয়াস সিদ্ধ হইল। দ্বাপরে শরীর ও মনের অপটুত্ব বিধায় যজ্ঞই প্রধান ধর্ম্ম হইল। সর্ব্বশেষ মানুষ কলিযুগে ক্ষীণজীবি ও দুর্ব্বল মন বিধায় একমাত্র দানই প্রশস্ত বলা হইয়াছে।"

যে কলিযুগের কথা বেদে নাই, যে যুগ-বিভাগ-জনিত কর্ম্ম পার্থক্যের কথাও বেদে নাই, অথচ বেদের বিরুদ্ধে সেই মতবাদ কি মতলব উদ্ধারের জন্য ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছিল, ও সেই বর্ণনাকে আপ্তবাক্য রূপে গ্রহণ করিয়া স্মৃতি ও পুরাণে লিখিত হইয়াছিল, তাহা এক কথায় বুঝিতে হইলে, বলিতে হইবে, যে জন্য মানুষ ব্রহ্মাকে দেবতা দাঁড় করাইয়া, তাঁহার মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদির উদ্ভব ও মুখজাত বলিয়া ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখান হইয়াছিল, ঠিক সেই জন্যই পশুযাগ যাহাতে প্রচলিত না হইয়া স্মার্ত্তকর্ম্মেরই প্রচলন থাকে, তজ্জন্য মিথ্যা কলিযুগের দোহাই ও মিথ্যা যুগ বিভাগ জনিত কর্ম্মভেদের কথা বলিতে হইয়াছিল। এমন অদ্ভুত অদ্ভুত ধাপ্পাবাজী শাস্ত্রে অনেকই আছে।

এই ধাপ্পাবাজীর অন্যতম নিদর্শন হইল বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে সনাতন বলিয়া প্রচার করা। সনাতন অর্থ হইল নিত্য। যাহা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমভাবে আছে ও থাকিবে। কিন্তু বর্ণাশ্রম যে সনাতন হইল কেমন করিয়া তাহা বুঝাইতে যাইয়া রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ বেদের পুরুষ সূক্তের দোহাই দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—যখন প্রাচীন-তম গ্রন্থ ঋগ্বেদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের কথা আছে, তখন জানিতে হইবে, উহা চির দিনই আছে ও থাকিবে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কদাচ সনাতন নহে

আমরা প্রথমতঃ ইতিহাস ও পুরাণ হইতে তিনটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সনাতন নহে। তারপর পুরুষসূক্ত বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব, উহা যে সকল স্মৃতি ও পুরাণের নজীর স্বরূপ লিখিত হইয়াছিল, সে সকল ধর্ম্মগ্রন্থে ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মা বা নারায়ণের মুখাদি হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে।ঃ—

১।ঃ—(ক) এক বর্ণমিদং পূর্ব্বং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির।
কর্ম্ম ক্রিয়া বিশেষেণ চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতং ॥মহাভারত॥

(খ) এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণোনান্যঃ একোঽগ্নি বর্ণ এবচ ॥ভাগবত॥

(গ) বর্ণানাং প্রবিভাগাশ্চ ত্রেতায়াং সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সংহিতাশ্চ ততো মন্ত্রা ঋষিভির্ব্রাহ্মণৈস্তুতে ॥বায়ুপুরাণ॥

উপরের তিনটি মন্ত্রের অর্থ হইল—প্রথমে এই বিশ্বে একবর্ণ ছিল, পরে ক্রিয়া কর্ম্ম পার্থক্যে চারিবর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বেদ ও বর্ণ বিভাগ ত্রেতাযুগে ঋষি ও ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছিল।

এই তিনটি মন্ত্রকে যদি রক্ষণশীলগণ প্রক্ষিপ্ত বলিতে চান, আমরা তাহাতে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করিব না, বরং সুখী হইয়া দেশবাসীকে বলিতে পারিব, শাস্ত্র মধ্যে যে প্রক্ষিপ্ত মন্ত্র আছে, এতকাল পরে রক্ষণশীলগণও তাহা স্বীকার করিতেছেন। আর যদি প্রক্ষিপ্ত না বলিয়া সত্য বলিয়া স্বীকার করেন, তবে ইহাও তাঁহাদগিকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কদাচ সনাতন নহে। কারণ পঞ্জিকায় দেখা যায়,—সত্যযুগের পরিমাণ ১৭২৮০০০ বৎসর। যে বর্ণাশ্রম সতর লক্ষ আটাশ হাজার বৎসর ছিল না, তাহা কখনই সনাতন হইতে পারে না।

পুরুষ সূক্তের প্রকৃত মর্ম্ম

পুরুষ সূক্তের দ্বাদশ মন্ত্রটি অতঃপর আলোচিত হওয়াই বিধেয় ঃ—

২। ব্রাহ্মণোঽস্যমুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃপদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ১০।৯০।১২ ॥

এই মন্ত্রটির একটু বিশদ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন বলিয়াই নিম্নে ইহার অন্বয় ও শব্দার্থ যুক্ত করিতে হইল ঃ

অন্বয় ও শব্দার্থ ঃ—ব্রাহ্মণঃ [মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক স্তোত্র পাঠকারী—সায়ন], অস্য [বিরাট পুরুষ পশুর], মুখং [মুখ], আসীৎ [হইয়াছিল], বাহূ [বাহুদ্বয়], রাজন্যঃ [রাজা], কৃতঃ [স্বীকৃত], উরূ [উরুদ্বয়], তৎ [সেই, তাহা], অস্য [বিরাট পুরুষ পশুর], যৎ [যাহার], বৈশ্যঃ [ঋগ্বেদ দৃষ্টে ইহার অর্থ যে কি তাহা বলা দুরুহ, কারণ এই স্থলে মাত্র একবার বৈশ্য শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, কিন্তু এ শব্দে যে কি বুঝায় তাহা ঋগ্বেদের মধ্যে নাই], পদ্ভ্যাং [পদদ্বয় হইতে], শূদ্রঃ [এই শব্দটিও মাত্র এই স্থলেই ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু শূদ্র অর্থ যে কি তাহা ঋগ্বেদের মধ্যে দৃষ্ট হয় না], অজায়ত [জন্মিয়াছিল]।

বঙ্গানুবাদ ঃ—ব্রাহ্মণগণ বিরাট পুরুষ পশুর মুখ, রাজা ইহার বাহু-দ্বয়, [অর্থহীন] বৈশ্য ইহার উরুদ্বয় হইয়াছিল। পাদদ্বয় হইতে [অর্থহীন] শূদ্র জন্মিয়াছিল।

এই ঋক্‌টি দেখিলেই মনে হইবে,—যখন দেব, ঋষি ও সাধ্যগণ বিরাট পুরুষকে পশু কল্পনা করিয়া যজ্ঞে আহুতি দিয়াছিল, তাহার পূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্মণ, রাজন্য ও অর্থহীন বৈশ্যের অস্তিত্ব ছিল। এবং তাহারাই সময় মত উপস্থিত হইয়া কেহ হইল, [আহুতি প্রদত্ত বিরাট পুরুষ পশুর] মুখ, কেহ হইল বাহু, কেহ হইল উরু। একমাত্র অর্থহীন শূদ্র

শব্দই সেই বিরাট পুরুষ পশুর পদদ্বয় হইতে জন্মিয়াছিল। পশুর দুই বাহু ও দুই পাদ—অদ্ভুত হইলেও নারায়ণ ঋষি যখন দেখিয়াছিলেন, তখন হইবেও বা! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,—ঋগ্বেদে প্রায় শতাধিক ঋষি রহিয়াছেন, তঁহারা কেহই কিন্তু বলিতে পারিলেন' না,—আর্য্যগণ কেমন করিয়া উদ্ভূত হইল, আর কেনই বা খণ্ডিত ও আহুতি দত্ত বিরাট পুরুষ পশুর কোন অঙ্গ হইতেই আর্য্যবর্ণ উৎপন্ন হইতে পারিল না?

দর্শন শাস্ত্রের মাপকাটিতে পুরুষ সূক্তের মূল্য কানাকড়িও নহে

হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ ও দর্শনশাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সংখ্যাতীত মতবাদ দৃষ্ট হইবে। এই সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গে বেদের সংহিতা ভাগ মধ্যে যত মতবাদ আছে, প্রায় সকল গুলিই ভ্রান্তমত। উপনিষদ্ মধ্যে যতগুলি সৃষ্টিতত্ত্বের মন্ত্র আছে, তন্মধ্যে কতক ভ্রান্ত, কতক অসম্পূর্ণ। সাংখ্য দর্শনের সৃষ্টিতত্ত্বের প্রথম আরম্ভের দিক ভ্রম পূর্ণ। বলা বাহুল্য এই সকল ভ্রম আচার্য্য শঙ্করই দেখাইয়াছেন, এবং সাংখ্য মতের ভ্রম সংশোধন করিয়া যাহা প্রকৃতই সৃষ্টিতত্ত্ব, তৎবিষয়ে আচার্য্য বলিয়াছেন,—এক নিষ্ক্রিয় চৈতন্য স্বরূপ পুরুষের পার্শ্বে জড় প্রকৃতির প্রথম পরিণম হইল,—'মহৎ।' মহতের পরিণাম 'অহঙ্কার।' অহঙ্কারের দ্বিবিধ পরিণাম :—(ক) মন ও দশ ইন্দ্রিয়, (খ) পঞ্চ তন্মাত্রা। পঞ্চতন্মাত্রার পরিণাম,—পঞ্চ মহাভূত। মন, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূতের মিশ্রণে জীব জগৎ প্রভৃতির উৎপত্তি। সুতরাং সৃষ্টিতত্ত্বের এই কষ্টি পাথরখানি হাতে লইয়া পুরুষ সূক্তের মূল্য নির্দ্দেশ করিবার শ্রম স্বীকার করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন, বেদ বর্ণিত পুরুষ সূক্তের মূল্য কানা কড়িও নহে। অথচ

শিক্ষিত মহামহারথী ব্রাহ্মণগণ এই পুরুষ সূক্তকে পাঠ করিয়া থাকেন। গরজ এমনই বালাই! শুধু পাঠ করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে কাহারও কিছু বলিবার থাকিত না। কিন্তু এই ঋক্‌টির দোহাই দিয়া রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ সত্যের কোন ধার না ধারিয়া, এতদিন ধরিয়া হিন্দু সমাজকে বলিয়া আসিয়াছেন,—"সেই বিরাট পরম পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ হইল," আর হিন্দু সমাজও তাহা মানিয়া বলিয়া আসিতেছিল, তা বটে, তা বটে!! ঋগ্বেদ হইল আর্য্যবর্ণের ইতিবৃত্তি। অথচ তাহাতে আর্য্যবর্ণের সহিত পরম পুরুষের কোন সম্পর্ক কেন দেখান হইল না, তাহার যুক্তিযুক্ত হেতু কোন রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ আজ পর্য্যন্তও দেখাইতে পারেন নাই।

আর্য্যকাঃ কুরবশ্চৈব বিবিশ্বা ভাবিনশ্চ যে।
বিপ্র ক্ষত্রিয় বৈশ্যাস্তে শূদ্রাশ্চ মুনি সত্তমা ॥ বিষ্ণুপুরাণ॥

নানা দিক দিয়া নানা ভাবে দেখিবার পরে পুরুষ সূক্ত সম্বন্ধে আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে,—এই পুরুষ সূক্ত যখন রচিত হইয়াছিল, তখন মূলবর্ণ ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্যবর্ণ তিনভাগে বিভক্ত হইয়া ভারতের শিক্ষা, শাসন ও বাণিজ্য নিজেদের হাতে রাখিয়াছিল এবং পজ্যাং অর্থাৎ ভারতজাত আদিম কৃষ্ণকায়গণকে শূদ্র আখ্যা প্রদান করিয়া দাসত্বে কায়েম রাখিয়াছিল। ব্যাকরণ সম্মত করিয়া মন্ত্রটি বিচার করিলে দেখা যাইবে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কেহই পরম পুরুষের মুখ, বাহু বা উরু হইতে উৎপন্ন হয় নাই। তাহারা পূর্ব্ব হইতেই ছিল এবং সময় মত উড়িয়া আসিয়া কেহ মুখ, কেহ বাহু কেহ উরু হইল, বা দখল করিয়া বসিল। কিন্তু একমাত্র শূদ্রের বেলায়ই বলা হইল—পদযুগল হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল। অর্থাৎ ভারত জাত [Son of the soil] আদিম মনুষ্যগণ, যাহাদিগকে ঋগ্বেদের ঋষিগণ দস্যু, দাস, তস্কর, পণি, শিম্যু, নিষাদ, রাক্ষস প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করিয়াছেন, তাহাদিগকেই এই মন্ত্রে শূদ্র বলা হইয়াছে।

তবুও পুরুষ সূক্তের 'ব্রাহ্মণোহস্যমুখমাসীৎ' মন্ত্রটিকে যদি বর্ণ বিভাগের বৈদিক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তবে একথাও মানিয়া লইতে হইবে যে, আর্য্যগণ পূর্ণ সতর লক্ষ আটাশ হাজার বৎসর অবিভক্ত থাকিবার পরে,, এই মন্ত্র রচিত হইয়াছিল। অন্যথায় মহাভারত, ভাগবত ও বায়ু পূরাণের উক্তিকে মিথ্যা বলিতে হইবে।

বায়ু পূরাণে লিখিত ত্রেতাযুগে বর্ণ বিভাগের কথা সমর্থন যোগ্য নহে এবং পুরুষ সূক্তের সংস্কৃত ভাষা দেখিয়া এই মন্ত্রকে প্রাচীন বলিয়াও স্বীকার করা যায় না। আমরা মনু সংহিতার ভাষ্য ও টীকার প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব—"লোকানান্ত বিবৃদ্ধর্থ্যং [১:৩১] মন্ত্রটির ভাষ্য রচনা করিবার সময় আচার্য্য মেধাতিথি বেদে পুরুষ সূক্ত দেখিতে পান নাই অর্থাৎ সে সময় পুরুষ সূক্ত রচিত হয় নাই। তাই তিনি ঐ মন্ত্রের ভাষ্য করিতে নিতান্ত ছেলে-মানুষী করিয়াছেন। টীকাকার চিরপ্রভাও বেদে পুরুষ সূক্ত দেখিতে না পাইয়া কৌশলে পাশ কাটাইয়াছেন। কিন্তু কুল্লুক ভট্ট যখন টীকা রচনা করেন, তাহার পূর্ব্বে বেদে পুরুষ সূক্ত স্থান লাভ করিয়াছিল বলিয়াই তিনি (মনু ১।৩১) টীকায় বৈদিক নজীর দেখাইতে যাইয়া সগর্ব্বে লিখিলেন,—"তথা শ্রুতি—ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদিত্যাদি।" মনু সংহিতায় আছে,—

লোকানান্ত বিবৃদ্ধ্যর্থ্যং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ ॥

কিন্তু এই মনূক্ত বচনের নজীর যে কেমন করিয়া 'ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীৎ' হইল তাহা পণ্ডিতগণ মধ্যে কেহ বুঝাইয়া বলিলে বাধিত হইব।

বৈদিক ধর্ম্ম অস্বীকার করিবার বিষময় ফল

নানা দিক দিয়া শাস্ত্ররক্ষকগণ চুক্তিনামাকে সার্থক করিবার জন্য

এমনই ভাবে নূতন নূতন মন্ত্র রচনা করিয়া দেশবাসীকে শুনাইতে লাগিলেন, যাহা শুনিয়া শুনিয়া দেশবাসী পূর্ব্ব আচার, ব্যবহার, রীতি নীতির কথা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইলেন। অধিকন্তু অতীতে যাহা সমাজে ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত ছিল, সে কথা কেহ বলিতে আসিলে তাহার সহিত হিন্দুগণ মারমুখো হইয়া কলহে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল। যাহার অন্যতম নিদর্শন হইল,—মুসলমানের গো কোরবানী লইয়া হিন্দুগণের চরম উত্তেজনা! আর তাহারই ফলে উভয় পক্ষে প্রায় প্রতি বৎসর লুট, তরাজ, খুন ও জখম।

যে গো মাংস না হইলে হিন্দুর দেবতা এতদিন তুষ্ট হইতেন না, যে গো বধ না হইলে বিশিষ্ট অতিথির সম্মান রক্ষা পাইত না, যে গোমাংস না হইলে বিবাহ কালীন বরের ভোজন সম্পূর্ণ হইত না, যে রক্তবর্ণ গোচর্ম্মে না বসিলে বিবাহ বাসরে বধূর আসন শাস্ত্র সম্মত হইত না, শ্রাদ্ধে যে গোমাংস প্রদান না করিলে পিতৃপুরুষগণ বারমাস তৃপ্ত থাকিতেন না, চুক্তিনামার ফলে সেই গো জাতি যে দিন হইতে হিন্দুর মা বাপ হইল, তদবধি গোমাংসের ছোঁয়াচে হিন্দুর ভাগ্যে পাতিত্য উপস্থিত হইল। অতিথির এক নাম যে 'গোঘ্ন' তাহাও সকলে ভুলিয়া গেল!

গো আবরণের যুদ্ধে ভারত বিজয়

যে গো হত্যার ভয়ে সিন্ধুরাজ পরাজয় বরণ করিয়াছিলেন, সেই গো হত্যার অনেক বেশী গরু মুসলমান ভারতে নিত্য হত হইয়াছে ও ইদানীং ইংরাজ-ভারতে নিত্য কসাইখানায় তাহার অনেক বেশী গো বধ হইতেছে। যে গো হত্যার ভয়ে হিন্দুরাজা রাজ্য ছাড়িয়া ছিলেন, ভারতে সেই গো হত্যা সমভাবেই চলিয়াছে, অধিকন্তু কত লক্ষ লক্ষ লোক যে এই গোমাংসের ছোঁয়াচে সমাজ হইতে পরিত্যক্ত হইয়া

মুসলমান হইতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার হিসাবও নাই, জানিবার কাহার প্রবৃত্তিও নাই। সংস্কার এমনই প্রবল!

অত্যাজ্যা নারী সম্বন্ধে স্বৈরাচার

নারীজাতি সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা যাইতে পারে। নারী যাহাকে ইচ্ছা কামনা করিতে পারে বলিয়াই যখন তাহার নাম 'কন্যা' সেই কন্যাকে বেদের বিরুদ্ধে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে, মাত্র চুক্তিনামার জন্য শাসন করিতে যাইয়া নূতন নূতন মন্ত্র রচনা করিয়া সতীর গুণ কীর্ত্তন ও অসতীর তীব্র নিন্দা যখন চলিতে লাগিল, তখন পুরুষ জাতি নারী জাতি সম্বন্ধে বড়ই সচেতন হইল। এমন কি পরপুরুষ স্পর্শিত নারীকে পর্য্যন্ত সমাজ পরিত্যাগ করিতে শিখিল, ধর্ষিতা নারীর কা কথা! অথচ হিন্দুর যাহা প্রমাণ্য ধর্ম্মগ্রন্থ, তাহাতে নিম্নলিখিত রূপ ব্যবস্থাই দৃষ্ট হইবে।ঃ—

১। হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব্বে সৌতি বলিতেছেন,—সূর্য্যের কিরণ, অগ্নির শিখা, যজ্ঞের বেদী, আহুতির অগ্নির ন্যায়, পরধর্ষিতা নারী কখন দূষিত হয় না। অতএব তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া পালন করাই বিজ্ঞের কর্ত্তব্য॥ ১৮৮ অধ্যায়॥

২। মনু সংহিতা ব্যভিচারিণী নারীকে ত্যাগ যোগ্যা বলেন নাই। ব্যভিচারিণী নারী প্রাজাপত্য কিম্বা চান্দ্রায়ণ [প্রায়শ্চিত্ত] করিলেই শুদ্ধ হয় বলিয়াছেন॥ ১১।১৭৭॥

৩। মৎস্য পুরাণ বলেন,—যদি কোন লোক পরস্ত্রী দূষিত করে, তাহার বধদণ্ড হইবে। কিন্তু স্ত্রীর ইহাতে কোন অপরাধ হইবে না॥ ২২৭।১২৭॥

৪। অত্রি সংহিতায় বলেন,—নারী উপপতী সংসর্গে দূষিত হয় না॥ ৮২ শ্লোক॥

৫। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বলেন,—দুর্ব্বল নারী বলবান কর্ত্তৃক ধর্ষিতা হইলে, সেই নিষ্কামা নারীর কোন বিচ্যুতি ঘটে না, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই সে শুদ্ধ হয়। উপপতি সংসর্গে নারী দূষিতা হয় না॥ প্রকৃতি খণ্ড, ৬১।৭৯ মন্ত্র॥

৬। স্কন্ধ পুরাণ বলেন, বলপূর্ব্বক উপভোগ করিলে কিম্বা চৌর হস্তগত হইলেও নারী দূষিতা হয় না [ত্যাগ যোগ্যা হয় না]। শাস্ত্রের বিধানে স্ত্রী ত্যাগ নাই। অম্লের দ্বারা তাম্রপাত্র, ভস্ম দ্বারা কাংসপাত্র, মাসিক আর্ত্তবের দ্বারা নারী শুদ্ধ হইয়া থাকে॥ কাশীখণ্ড, ৪০।৪৭, ৪৮ মন্ত্র॥

নারীর শুচিতা সম্বন্ধে স্কন্ধ পুরাণ বলেন,—"নারীগণ সর্ব্বদাই পবিত্র। ইহাদিগের কোনমতে দোষ হয় না। নারী প্রতিমাসে পুষ্প-মতী হন, তাহাই নারীর পাপ বিনষ্ট করে॥" কশীখণ্ড, ৪০।৩৭ মন্ত্র॥

প্রথমে চন্দ্র, গন্ধর্ব্ব ও অগ্নি নারীকে ভোগ করেন। পরে মনুষ্যগণ ভোগ করে, ইহারা কিছুতেই পাপভাগী হয় না॥ ৪০।৩৮॥

চন্দ্র নারী জাতিকে শুচিত্ব, অগ্নি সর্ব্বমধ্যে [সকল রকম পবিত্রতা] ও গন্ধর্ব্ব কল্যাণরাশি দিয়াছেন, অতএব নারীগণ সর্ব্বদাই পবিত্র॥ ৪০।৩৯॥

৭। অগ্নি পুরাণ বলেন,—অসবর্ণ পুরুষ কর্ত্তৃক স্ত্রী গর্ভবতী হইলে, যাবৎ শল্য (গর্ভস্থ শিশু) মোচন না হয়, ততদিন নারী অশুদ্ধা থাকে। কিন্তু প্রসবের পরে মাসিক রজো দর্শনে নারী শুদ্ধ হইয়া থাকে॥ ১৬৫।২০, ২১ মন্ত্র॥

৮। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণের কলির বেদ পরাশর স্মৃতি বলেন,—"রজসা শুধ্যতে নারী বিকলং যদি গচ্ছতি," অর্থাৎ পরপুরুষ সঙ্গে দূষিতা [বিকলং] নারী পুষ্পমতী হইলেই শুদ্ধ হয়॥ ৭।৪ মন্ত্র॥

এই সংহিতায় আছে বৃদ্ধা ও ষোড়শী নারী কদাচ দূষিত হয় না॥ ৭।৩৭ মন্ত্র॥

শাস্ত্র কেন স্ত্রী ত্যাগের ব্যবস্থা দেন নাই, পরন্তু ধর্ষিতা 'নারীকে গ্রহণ করিয়া পালন করা বিজ্ঞের কর্ত্তব্য' বলিয়া কেন নির্দ্দেশ করিলেন, তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত মাথা তাঁহাদেরই আছে, যাঁহারা সমগ্র দেশের মঙ্গলামঙ্গল ভাবিতে চেষ্টা করেন এবং প্রতি কার্য্যের ভবিষ্যতও ভাবিতে পারেন।

স্ত্রীত্যাগের ফলে বিপক্ষের বংশ বৃদ্ধি

একটি স্ত্রীকে ত্যাগ করা সমাজের পক্ষে কোন কষ্টকর কথা নহে। নির্ম্মম, নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোকের অভাবও কোন কালেই দৃষ্ট হয় না। এমত অবস্থায় যাহাকে ত্যাগ করা হইবে, সে নারী যে সমাজভূক্তা হইবে, তাহার ভাবি গর্ভজাত সন্তানগণ যে সেই সমাজই পুষ্ট করিয়া পুরুষানুক্রমে যে সমাজ তাহাদের আদি জননীকে ত্যাগ করিয়াছিল, সেই সমাজের শত্রু হইবে, একথা কেহই ভাবিতে চান না। কেন মুসলমান রাজত্বে ভারতে প্রায় সাত কোটি মুসলমান ও একশত আশিবৎসর ইংরাজ রাজত্বে প্রায় তিনি কোটি দেশী লোক খ্রীষ্টান হইল, এই অতি বৃদ্ধির সঙ্গে হিন্দু সমাজ পরিত্যক্তা লক্ষ লক্ষ নারীর কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত বিজ্ঞের অভাব যদি না হইত, তবে মুসলমান ও খ্রীষ্টান সমাজ এত দ্রুত স্ফীত হইতে পারিত কি ?

বাংলার সুপ্ত ব্রহ্মণ্য শক্তির ক্ষণিক জাগরণ

কিন্তু এই বঙ্গদেশেও এমন একদিন গিয়াছে, যে দিনে মুসলমান কর্তৃক ধর্ষিতা ব্রাহ্মণ কন্যা যখন সন্তান সহ ফিরিয়া আসিয়াছিলেন,

তখনকার দিনের সমাজপতিগণ সেই নারীকে শুধু অত্যাজ্যা জানিয়া যে গৃহে স্থান দিয়াছিলেন এমত নহে, পরন্তু ধর্ষিতা নারীর সেই সকল সন্তানগণকে ক্ষেত্রজ পুত্র বলিয়া গ্রহণ ও কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান করতঃ শাস্ত্রের মানরক্ষা ও জাগ্রত ব্রাহ্মণ্য শক্তির যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন অদ্যাপিও কুলীন ব্রাহ্মণের বংশাবলী গ্রন্থে দৃষ্ট হইবে।

হিন্দুর শাস্ত্রে যত উদার মতবাদ রহিয়াছে, তাহা মানিবার মত উদার বুদ্ধি ও শাস্ত্রে শ্রদ্ধা লোপ পাইবার পরে যে ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তিনামা রচিত হইয়াছিল, তদ্বারা আর্য্য অনার্য্যের বিবাহ পথে যে একতা ও সহানুভূতি ছিল, তাহা ছিন্ন হইবার পরে 'পাণিপথে' ভারতের বার বার তিনবার মর্ম্মান্তিক পরাজয় সম্ভব হইয়াছিল।

এ পর্য্যন্ত গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় হইতে সকলেই দেখিয়াছেন,—কি জাতীয় নাম, কি ধর্ম্মমত, কি আহার্য্য বস্তু, কি যৌন সম্বন্ধীয় বিষয়—কোন দিকেই সনাতন ধর্ম্মের কোন নিদর্শন দৃষ্ট হয় না। বরং ক্রম-পরিবর্ত্তনের ফলে 'তিন নকলে আসল খাস্তাই' হইয়াছে। তবুও যাঁহারা গায়ের জোরে বলিতে চান, অন্ততঃ পক্ষে বিবাহ পথে হিন্দুজাতি সনাতন প্রথা মানিয়া চলিতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিবার এবং পাঠকগণকে জানাইবার জন্য আর্য্য অনার্য্য যৌন বিধি ও নিষেধাত্মক মন্ত্রগুলি মনু সংহিতা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।:—

আর্য্য অনার্য্য সংমিশ্রণে মনু সংহিতার অভিমত

মনু সংহিতার দশম অধ্যায়ের ৬৬ শ্লোক হইতে ৭৩ শ্লোক পাঠ করিলেই মনে হইবে, একদা ভারতবর্ষে ব্যাপক ভাবে আর্য্য অনার্য্য মিলনের প্রয়োজন যেমন তীব্র অনুভূত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তি-নামার পরে ইহার বিরুদ্ধে তেমনই তীব্র কোলাহলও উত্থিত হইয়াছিল।:—

পক্ষে :—

প্রশ্ন উঠিয়াছিল,—ব্রাহ্মণ ও অনার্য্য মিশ্রণ প্রসঙ্গে। যথা :—

অনার্য্য স্ত্রীতে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণীতে শূদ্র জাত-সন্তান এই উভয় মধ্যে কে উত্তম হইবে ? ১

মীমাংসা হইয়াছিল,—আর্য্য অনার্য্য মিশ্রণ উদাহরণে। যথা,—

আর্য্য হইতে অনার্য্যা স্ত্রীজাত-সন্তান গুণযুক্ত হইলে আর্য্য হয়। [কিন্তু] অনার্য্য হইতে আর্য্যনারী-জাত-সন্তান নিশ্চিত অনার্য্য হয়। ২

এতৎ পক্ষে মহাভারতে বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ব্যাস, শুক, নারদের নাম দৃষ্ট হইলেও মনু সংহিতা যে নীতি ও উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।—

কেহ মাত্র বীজের প্রশংসা করেন, কেহ মাত্র ক্ষেত্রেরই প্রশংসা করেন, আবার কেহ কেহ বীজ ও ক্ষেত্র এতদুভয়েরই প্রশংসা করেন। ৩

উদাহরণ,—যে বীজ প্রভাবে তির্য্যগ্ গর্ভজাত সন্তানগণও ঋষি হইয়াছিলেন, সেই হেতু বীজ শ্রেষ্ঠ। ৪

উপরোক্ত শেষ বিধানের দ্বারা অনার্য্যা নারীবগর্ভে পুত্রোৎপাদন করিতে আর্য্যগণকে বিশেষ উৎসাহিত করা হইয়াছিল।

১। অনার্য্যায়াং সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণাত্তু যদৃচ্ছয়া।
ব্রাহ্মণ্যামপ্যনার্য্যাত্তু শ্রেয়স্ত্বংক্বেতি চেদ্ভবেৎ ॥ ১০।৬৬ ॥

২। জাতোনার্য্যামনার্য্যায়ামাধ্যাদার্য্যো ভবেদ্ গুণৈঃ।
জাতোঽপ্যনার্য্যাদার্য্যায়ামনার্য্য ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১০।৬৭ ॥

৩। বীজ মেকে প্রশংসন্তি ক্ষেত্রমন্যে মনীষিণঃ।
বীজ ক্ষেত্রে তথৈবান্যে তত্রেয়ন্তু ব্যবস্থিতিঃ ॥ ১০।৭০ ॥

৪। যস্মাদ্বীজ প্রভাবেন তির্য্যগ্‌জা ঋষয়োঽভবন্।
পূজিতাশ্চ প্রশস্তাশ্চতস্মাদ্বীজং প্রশস্যতে ॥ ১০।৭২ ॥

বিপক্ষে :—

ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তির ফলে যখন অসবর্ণ বিবাহ বাতিল হইয়া গেল, তখন আর্য্য অনার্য্য মিলনাত্মক বিধানগুলিকে বাতিল করিবার জন্য নূতন করিয়া রচিত হইয়াছিল,—

ধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যবস্থা মত ঐ উভয় সন্তানই সংস্কারের অযোগ্য। প্রথমের হেতু,—জন্ম বৈগুণ্য [আর্য্যের ঔরসে অনার্য্যার গর্ভে জন্ম হেতু জন্ম বৈগুণ্য বলা হইয়াছে]। পরবর্ত্তী সন্তান প্রতিলোম হেতুতে সংস্কারের অযোগ্য [অনার্য্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভসম্ভূত সন্তান প্রতিলোমজ]। ১

অনার্য্য যদি আর্য্যের কর্ম্ম গ্রহণ করে এবং আর্য্য যদি অনার্য্যের কর্ম্ম আশ্রয় করে, তবে ঐ উভয় সন্তান সমান ও নহে, অসমানও নহে ইহা ব্রহ্মা কহিয়াছেন। ২

অর্থাৎ—শ্বেতকায় আর্য্য যদি কৃষ্ণকায় অনার্য্যের ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তবে সে আর্য্য সমাজে নিন্দিত হইবে বটে, কিন্তু তাহাতে বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব নষ্ট হইবে না। আর অনার্য্য কাক যদি আর্য্য ধর্ম্মরূপ ময়ুর-পুচ্ছযুক্ত হয়,—তবুও সে স্বধর্ম্ম ত্যাগী আর্য্যের সমান হইতে পারে না।

উপরোক্ত বিধানদ্বয়ে আর্য্য অনার্য্য সংস্পর্শ যে শুভ নহে, তাহাই বলা হইয়াছে। মজা এই,—যে মন্ত্রে আর্য্য অনার্য্য মিলনে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, ঠিক পরে মন্ত্রে তাহাই আবার দোষাবহ বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইংরাজও দেশী খ্রীষ্টানগণকে এই চক্ষেই দেখিয়া থাকেন।

১। তাবুভাবপ্যসংস্কার্য্যাবিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ।
বৈগুণ্যাজ্জন্মনঃ পূর্ব্ব উত্তরঃ প্রতিলোমতঃ ॥ ১০।৬৮ ॥

অন্বয়ঃ—তৌ উভৌ অপি অসংস্কার্য্যঃ ইতি ধর্ম্মঃ ব্যবস্থিতঃ বৈগুণ্যাৎ জন্মনঃ পূর্ব্ব উত্তরঃ প্রতিলোমতঃ।

২। অনার্য্যমার্য্য কর্ম্মানমার্য্যং চানার্য্যকর্ম্মিণং।
সম্প্রধার্য্যাব্রবীদ্ধাতা ন সমৌ নাসমাবিতি ॥ ১০।৭৩ ॥

উপরোক্ত শ্লোকগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, কোন শ্লোকটি কখন রচিত হইয়াছিল।—

১। 'অনার্য্যায়াং সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণাত্তু যদৃচ্ছয়া' শ্লোকটি তখনই রচিত হইয়াছিল, যখন স্মার্ত্তকর্ম্মের প্রচলন সঙ্গে স্মার্ত্তকর্ম্মিগণ 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। এই সময় 'জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ' মন্ত্রটি রচিত হইয়াছিল।

২। 'জাতো নার্য্যামনার্য্যায়াং' শ্লোকটি তখনই রচিত হইয়াছিল, যখন বৌদ্ধ প্লাবনে ব্রাহ্মণ বর্ণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার হেতু উপস্থিত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে যে ভার্গবের দ্বারা ম্লেচ্ছ দেশীয় কৈবর্ত্তগণকে উপবীত প্রদান ও ব্রাহ্মণ পদে উন্নিত করিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই সময় ঘটিয়াছিল।

৩। 'তাবুভাবাপ্য সংস্কার্য্যাঃ' শ্লোকটি তখনই রচিত হইয়াছিল, যখন পরাজিত কিন্তু অতি অধিকসংখ্যক বৌদ্ধগণের সহিত স্বল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণগণের চুক্তিনামায় ধার্য্য হইয়াছিল, অসবর্ণা কন্যা আর্য্যগণ বিবাহ করিতে পারিবে না। এই বিধানটি যে কতদূর অযৌক্তিক তাহা জানিতে হইলে দেখা কর্ত্তব্য মূল শ্লোকের অন্বয় কি বলিতেছে। :—

তৌ উভৌ অপি অসংস্কার্য্যাঃ ইতি ধর্ম্মঃ ব্যবস্থিতঃ যাহার অর্থ হইল, ধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যবস্থায় সেই উভয় [সন্তানই] নিশ্চয় সংস্কারের অযোগ্য।

প্রশ্ন হইবে :—মনু যখন সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তখন কোন্ ধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যবস্থার কথা তিনি বলিতে চান, যাহা সেই উভয় সন্তানকে সংস্কারের অযোগ্য ধার্য্য করিয়াছে? সুতরাং এই মন্ত্র মনু সংহিতায় স্থান লাভ করিলেও ইহার রচনা তখনই সম্ভব হইয়াছিল, যখন এদেশে মনুর স্মৃতি ভিন্ন অনেক ধর্ম্মশাস্ত্রেরই (স্মৃতির) উদ্ভব হইয়াছিল। আর এই স্মৃতিশাস্ত্র সকল একযোগে বৈদিক ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ দ্বারা অনার্য্যকে আর্য্য করিবার বিপক্ষে বিধান সকল রচনা

করিয়াছিল। ১। উদাহরণ স্বরূপ ঋগ্বেদ হইতে নিম্নে তিনটি মন্ত্র উদ্ধৃত করা হইল। ঃ—

ঋগ্বেদে অনার্য্যকে আর্য্য করিবার কথা
বা
কৃণ্বংতো বিশ্বং আর্য্যং

(ক) বামদেব ঋষি বলেন,—শতক্রতু ইন্দ্র সেই অগ্রুর পুত্র পরা বৃত্তকে [অনার্য্য] স্তোত্রভাগী [বেদপাঠের অধিকারী] করিয়াছিলেন ॥ ৪।৩০।১৬ ॥

(খ) বামদেব ঋষি বলেন,—যজ্ঞপতি বিদ্বান ইন্দ্র অনভিষিক্ত [উপনয়ন বিহীন অনার্য্য] সেই তুর্ব্বশ ও যদুকে অভিষেকের যোগ্য [যজ্ঞ করিবার অধিকার প্রদান] করিয়াছিলেন ॥ ৪।৩০।১৭ ॥

(গ) নিধ্রুব ঋষি বলেন,—ইহারা [পবমান সোম দেবতা] ইন্দ্রের সম্বর্দ্ধনা করে, বৃষ্টি আনয়ন করে, বিশ্বকে আর্য্য করে [মূলে আছে,—কৃণ্বংতো বিশ্বং আর্য্যং] আর দান কুণ্ঠ কৃপণের সর্ব্বনাশ করে ॥ ৯।৬৩।৫ ॥

ধর্ম্ম বিষয়ে যে বেদকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র সকল একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, সেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ঋগ্বেদের মধ্যে উপরোক্ত তিনটি মন্ত্র থাকা সত্ত্বেও 'তাবুভাবাপি' শ্লোকটি যে বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ চুক্তিনামার গরজে লিখিত হইয়াছিল, আশাকরি তাহা পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন। বৌদ্ধ রাজগণও আর্য্য, ব্রাহ্মণগণও আর্য্য। যতদিন আর্য্যে আর্য্যে বিরোধ ছিল, ততদিন দল বাড়াইবার জন্য অনার্য্যের আদর ছিল। যখন আর্য্যে আর্য্যে মিলন হইয়া গেল, তখন

১। বিশ্বকোষ অভিধানে ব্রাত্য ও ব্রাত্যস্তোম শব্দ দ্রষ্টব্য।

দুধ ও আম মিলিত হইলে আঁটিটির অবস্থা যাহা হয়, অনার্য্যের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল।

৩। 'যস্মাদ্বীজ প্রভাবেন তির্য্যগ্‌জা ঋষয়োঽভবন্' শ্লোকটি, উপমা স্বরূপ যিনি লিখিয়াছেন, তিনি মনু বা শিষ্য ভৃগু যিনিই হউন লিখিয়াছেন, ইহাই রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বলিবেন। আমরা কিন্তু এই কথা সমর্থন করিতে পারি না। কারণ বংশাবলী দৃষ্টে দেখা যাইবে, মনু বা মনু-শিষ্য ভৃগু হইতে রাজা দশরথ প্রায় ত্রিশ পুরুষ নিম্নে অবস্থিত। রক্ষণশীলগণ হয়ত বলিবেন মনু ও ভৃগু ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইতেন। আমরাও না হয় বিরোধ বাঁচাইবার জন্য তর্কস্থলে মানিয়া লইতেছি, মনু ও ভৃগুর ভবিষ্যত দৃষ্টি অতীব প্রখর ছিল। কিন্তু এই শ্লোকের ব্যাকরণ সম্মত অর্থ যিনিই করিতে যাইবেন, তিনিই 'ঋষয়ঃ অভবন্' কথাটি ধরিয়া নিশ্চয়ই অর্থ করিবেন। আর এইরূপ অর্থ করিতে গেলে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, তির্য্যগ্‌জা ঋষয়ঃ অর্থাৎ তির্য্যগ্ যোনি সম্ভূত ঋষিগণের উৎপত্তির পরেই এই মন্ত্র উপমা স্বরূপে রচিত হইয়াছিল। অন্যথায় অতীত কাল বাচক 'অভবন্' শব্দটি কদাচ যুক্ত হইত না।

এখন 'তির্য্যগ্' শব্দটির কি অর্থ হইবে, তাহাই দেখা কর্ত্তব্য। এই শব্দের অর্থ মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন, স্বর্গীয় ভরতচন্দ্র শিরোমণি প্রভৃতি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ 'হরিণ' বলিয়াছেন। প্রথমতঃ হরিণীর গর্ভে কখন মানুষ হয় না। এই জন্য 'হরিণ' অর্থ সঙ্গত নহে। দ্বিতীয়তঃ হরিণ অর্থ করিলে এক ঋষ্যশৃঙ্গ হওয়াই বিধেয়। কিন্তু মূলে আছে ঋষয়ঃ—বহু বচন। সুতরাং বহু ঋষি হরিণীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন, এমন কোন কাহিনী ইতিহাস বা পুরাণে দৃষ্ট হয় না। তবে তির্য্যগ্ শব্দের অর্থ কি হওয়া বিধেয়—ইহাই হইবে প্রধান প্রশ্ন।

এ বিষয়ে 'বিশ্বকোষ' অভিধান শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া অর্থ করিয়াছেন—'কুটিল লোক।' ভাগবতে আছে,—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তিচ দেবমায়াং
স্ত্রী শূদ্র হূন শবরা-অপি পাপ জীবাঃ।
যদ্যদ্ভুত ক্রম পরাবণ শীল শিক্ষাঃ
তির্য্যগ জনা অপি কিমুশ্রুত ধারণা যে ॥ ২।৭।৪৫ ॥

অর্থাৎ—যদি ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ দ্বারা তাঁহাদের চরিত্র শিক্ষা করে, তাহা হইলে স্ত্রী, শূদ্র হূন, পাপজীবি শবর এবং কুটিল লোকেরাও [অনার্য্যেরা] তাঁহার মায়া জানিতে পারে এবং তাহা হইতে মুক্ত হইতে সক্ষম হয়।

সুতরাং তির্য্যগ্ অর্থ যদি কুটিল বা অনার্য্য হয়, তবেই ঋষয়ঃ শব্দের সহিত মহাভারত ও পুরাণের সঙ্গতি রক্ষা পায়। অন্যথায় উহার কোন সঙ্গত অর্থই হয় না। অতএব বীজ প্রাধান্যের যে উদাহরণ মনু সংহিতায় আছে, উহা যেমন মনুর রচনা হইতে পারে না, তেমন তির্য্যগ্ অর্থও হরিণ হইতে পারে না। কথা উঠিয়াছে আর্য্য অনার্য্যের সংমিশ্রণ প্রসঙ্গে। সুতরাং তির্য্যগ্ অর্থ অনার্য্য হইতে বাধ্য, হরিণ হইবে কেন?

৪। 'অনার্য্যামার্য্য কর্ম্মাণম্' শ্লোকটিতে যে 'ধাতার' কথা আছে, তিনি খুব সম্ভব মিলিত ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধগণেরই ধাতা হইবেন। অথচ মনু সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়েই কিন্তু লেখা আছে,—স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।" অর্থাৎ দুষ্কুল [অন্ত্যজ বা অনার্য্য] হইতেও কন্যা গ্রহণ করিবে ॥২।২৩৮॥

দুষ্কুল হইতে কন্যা গ্রহণের নিদর্শন

এই নিকৃষ্ট কুল বা অস্পৃশ্য বর্ণের কন্যাগ্রহণ প্রসঙ্গে মনু সংহিতায় আছে,—"নদী যেমন সমুদ্রে মিলিত হইয়া সমুদ্রের গুণ প্রাপ্ত হয়, তেমন নারী পতির সহিত মিলিত হইয়া পতির গুণ প্রাপ্ত হয় ॥ ৯।২২ ॥

[এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে,] অক্ষমালা [নামে নিকৃষ্ট বর্ণের কন্যা] বশিষ্ঠের সহিত এবং শারঙ্গী মহর্ষি মন্দপালের ভার্য্যা হইয়া পূজ্যা হইয়াছিলেন ॥ ৯।২৩ ॥

এই অক্ষমালা প্রভৃতি পুরাণ বর্ণিত নিকৃষ্ট বর্ণের কন্যাগণ উৎকৃষ্ট ভর্ত্তার সহবাসে ভর্ত্তার উৎকৃষ্ট গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৯।২৪ ॥

পুরাণে লিখিত আছে,—পরাশর ঋষির পুত্র ব্যাসদেব কৈবর্ত্ত বা দাস রাজের কুমারী কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন * ॥ মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৬৩ অধ্যায়।

এতদ্ভিন্ন ঋষি কবষ ও কক্ষীবান্, নারদ, সত্যকাম, বিদুর প্রভৃতির ন্যায় কত দাসীপুত্র নিজ কর্ম্মবলে যে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছিলেন, এমন কি বেশ্যা পুত্র হইয়া বশিষ্ঠ যেমন ঋষিশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন, তেমন বেশ্যা গর্ভজাত সন্তানও সূর্য্যবংশের রাজ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন [মহাভারত, বনপর্ব্ব ১৯২]। যেখানে আর্য্য রাজা ও ঋষিগণ অনার্য্যা কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেখানে আর্য্য জনসাধারণ অনার্য্যা কন্যা যে কত গ্রহণ করিয়াছে, তাহা বর্ণ হিন্দুর কৃষ্ণবর্ণই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইহা ছাড়া জানিবার অন্য কোন উপায় নাই।

* জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্তাঃ শ্বপাক্যাশ্চ পরাশরঃ।
শুক্যাঃ শুকঃ কণাদশ্চ তথোলুক্যাঃ সুতোঽভবৎ ॥ ২২ ॥
মৃগীজোঋষি শৃঙ্গোপি বশিষ্ঠো গণিকাত্মজঃ।
মন্দপালো মুনিশ্রেষ্ঠো নাবিকা পত্য মুচ্যতে ॥ ২৩ ॥
মাণ্ডব্যো মুনিরাজস্তু মণ্ডূকীগর্ভ সম্ভবঃ।
বহবোঽন্যেঽপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তয়ে পূর্ব্ববৎ দ্বিজাঃ ॥ ২৪ ॥

বহ্ম পুরাণ, ব্রাহ্ম পর্ব্ব, ৪২ অধ্যায় ॥

আর্য্য অনার্য্য সংমিশ্রণে শ্বেতকায় আর্য্য বংশধরগণের কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্তি

বলা বাহুল্য, মনু সংহিতার ১০।৬৭ ও ২।২২৮ ব্যবস্থার দ্বারা আর্য্য অনার্য্যের মধ্যে যে রক্তের বিনিময় ঘটিয়াছিল, তাহারই ফলে আর্য্যের শ্বেতকায় যে ক্রমশঃ কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইয়াছিল, এবং অনার্য্যের ঘোর কৃষ্ণবর্ণ যে ক্রমশঃ শ্যামবর্ণে উন্নিত হইয়াছিল, ইহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। বর্ত্তমান ভারতে যে সকল পরিবারে স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা সকলেই শ্বেতকায়, তাহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইলেও মনে হয় তাহারই আর্য্যরক্ত অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছে। কিন্তু যে গৃহে একটি মাত্র সন্তানও কৃষ্ণকায় দৃষ্ট হইবে, সেইখানে অনার্য্য রক্তের মিশ্রণ ঘটিয়াছে নিশ্চিত জানিতে হইবে। যে সকল লোক বলিতে চান, গরম দেশের লোক কাল হয়, তাহারা ভারতীয় ফিরিঙ্গি ও খাঁটি ইংরাজ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, গরম দেশে রং কাল হয় না, কাল হয় কৃষ্ণকায়ের সহিত রক্তের বিনিময়ে। সুতরাং বর্ত্তমান ভারতে আজও যাহারা নিজকে আর্য্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন, তাঁহারা দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইলেই বুঝিতে পারিবেন এবং পিতা মাতা ভ্রাতাগণের দিকে চাহিলেই ধরিতে পারিবেন,—অনার্য্যের সহিত রক্তের বিনিময় তাহাদের কতখানি ঘটিয়াছে।

মনু সংহিতাই যৌন সম্বন্ধ ক্রমঃ পরিবর্ত্তনের প্রধান সাক্ষী

যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত বলিয়া থাকেন,—হিন্দু-বিবাহ ধর্ম্মমূলক, চুক্তি মূলক নহে এবং বর্ত্তমান পদ্ধতিতে যে বিবাহ হিন্দু সমাজে প্রচলিত, সেই পদ্ধতিই সৃষ্টির প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত সমভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাঁহারা হয় শাস্ত্র পড়েন নাই অথবা পড়িয়া থাকিলেও শাস্ত্র-

মর্ম্ম গোপন করিয়া মিথ্যা কথাই বলিয়া থাকেন। এই যৌন সম্বন্ধের মূলোচ্ছেদকারী পরিবর্ত্তনের প্রধান সাক্ষী যে মনু সংহিতা! মনু-সংহিতার যৌন কথা আলোচিত হইলেই এই পরিবর্ত্তন ধরা পড়িবে।

মনু সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে মাত্র দুইটি মন্ত্র যৌন' বিষয়ে লিখিত আছে। ইহার কোনটির মধ্যেই বিবাহের কোন উল্লেখ নাই, যেমন তৃতীয় ও নবম অধ্যায়ে বিবাহ ও কন্যাদানের কথার উল্লেখ রহিয়াছে।

(ক) স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শৌচ, হিতকথা, এবং বিবিধ শিল্প সকলেই সকলের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারে॥ ২।২৪০ ॥

এখানে সকলে অর্থ আর্য্যগণের মধ্যে জানিতে হইবে। কারণ অনার্য্যের কথা পূর্ব্বে রহিয়াছে। যথা,—স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি অর্থাৎ [আর্য্যগণ] দুষ্কুল [অন্ত্যজ বা অনার্য্য] হইতে কন্যারত্ন গ্রহণ করিতে পারিবে ॥ ২।২৩৮ ॥

অতঃপর মনু সংহিতার যৌন বিষয়ক মন্ত্রগুলি ঋগ্বেদ ও মহাভারতের আদর্শে সাজাইয়া দেওয়া গেল, যাহা দেখিয়া সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে,—পরিবর্ত্তন প্রকৃতই মূলোচ্ছেদকারী হইয়াছে।

প্রথমে সমাজে যে অবাধ যৌন সম্বন্ধ প্রচলিত ছিল, তাহা উপরোক্ত দুইটি মন্ত্রে দেখান হইল। কিন্তু নারীর ভাগ্যে বহু পতিলাভ যেমন ঋগ্বেদ ও মহাভারতে দৃষ্ট হইবে, মনু সংহিতায় তেমন কোন ব্যবস্থা নাই। তারপরের স্তরে স্বয়ম্বর প্রথা। যথা,—কন্যা পুষ্পবতী হইয়া তিন বৎসর পরে স্বয়ম্বরা হইবে [মনুসংহিতা ৯।৯০]। এই ব্যবস্থা যতদিন প্রচলিত ছিল, ততদিন কন্যার কর্ত্তৃত্বে বর মনোনীত হইত। ইহার পরের স্তর হইল,—পুরুষের প্রার্থনা ও কন্যার সম্মতি। ইহার নাম হইল,—গান্ধর্ব্ব প্রথা [মনু সংহিতা, ৩।৩২]। এ পর্য্যন্ত যৌন-বিষয়ে কন্যার কর্ত্তৃত্ব ও সম্মতির একটা মূল্য ছিল। পরের ব্যবস্থায় তাহা একেবারে

লোপ পাইয়াছিল। এই সময় রাক্ষস, আসুর ও পৈশাচ নামে তিনটি প্রথায় কন্যাগ্রহণ করা সম্ভব ছিল।:—

(ক) বলপূর্ব্বক কন্যাগ্রহণের নাম রাক্ষস প্রথা ॥ মনু সংহিতা, ৩।৩৩॥

(খ) অর্থদ্বারা কন্যার অভিভাবককে বাধ্য করিয়া কন্যাগ্রহণের নাম আসুর প্রথা ॥ মনু সংহিতা, ৩।৩১ ॥

(গ) নিদ্রিতা বা মদ্যপানে বিহ্বলা কন্যাগমনের নাম পৈশাচ প্রথা ॥ মনু সংহিতা, ৩।৩৪ ॥

আমাদের মনে হয়, খুব সম্ভব গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও আসুর প্রথার বৈধতা সম্বন্ধে কখন প্রশ্ন উঠিয়াছিল। তাই নজীর স্বরূপ বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে নূতন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দুইটি যুক্ত করিতে হইয়াছিল।

গুরুদ্রোহী ঋষির পুষ্পমতী নারী ধর্ষনে অনুজ্ঞা

(১) যদি কখনও জলমধ্যে আপনার প্রতিচ্ছায়া [কেহ] দর্শন করে, তবে "ময়ি তেজঃ ইন্দ্রিয়ম্" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। [জলাশয়ের নিকটে কোন রজস্বলা নারী দেখিলে] এই নারী স্ত্রীগণের মধ্যে লক্ষ্মীরূপা যেহেতু ইনি রজস্বলা বস্ত্রপরিহিতা, সেই হেতু তাহাতে গমন করিয়া মন্ত্র জপ করিবে, আমাদিগকে পুত্র সমুৎপাদন করিতে হইবে। ৬।৪।৬ ॥

(২) সেই নারী যদি এই পুরুষকে দেহদান না করে, তাহা হইলে ইচ্ছানুসারে তাহাকে বস্ত্রালঙ্কারাদির দ্বারা বশীভূত করিবে। তাহাতেও যদি নারী অঙ্গদান না করে, তবে ইচ্ছামত যষ্ঠি বা হস্ত দ্বারা তাড়না করিয়া "আমি ইন্দ্রিয়রূপ যশঃদ্বারা তোমার যশঃ [সৌভাগ্য] গ্রহণ করিতেছি" বলিয়া সেই নারীতে উপগত হইবে ॥ ৬।৪।৭ ॥

মনু সংহিতার ব্যবস্থার সহিত ইতিহাস ও পুরাণের সামঞ্জস্য

মনু সংহিতায় স্বয়ম্বর, গান্ধর্ব্ব, আসুর ও রাক্ষস বিধানের অনুকূলে মহাভারত হইতে নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল।—

দৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতির স্বয়ম্বরের কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু কলিযুগে রাজা জয়চাঁদের কন্যা সংযুক্তা যে হিন্দু সূর্য্য পৃথ্বীরাজের মূর্ত্তির গলায় মালা দিয়া স্বয়ম্বরা হইয়াছিলেন, সে কথা হয়ত জনসাধারণ জানেনই না।

গান্ধর্ব্ব মিলন প্রসঙ্গে যযাতি, দেবযানী, আর্য্য যযাতি ও অনার্য্যা শর্ম্মিষ্ঠা, দুষ্মন্ত শকুন্তলার ইতিহাস মহাভরতে আছে।

সীতার সহিত শ্রীরামচন্দ্রের মিলন ঘটিয়াছিল,—বীর্য্যশুল্কে। এই প্রথা মনু সংহিতায় দৃষ্ট হয় না.

রাক্ষস প্রথায় কৃষ্ণ রুক্মিণী মিলন ইতিহাস প্রসিদ্ধ কাহিনী।

আসুর প্রথায় আর্য্য শান্তনু ও অনার্য্যা সত্যবতীর মিলন।

পৈশাচ প্রথার কোন উদাহরণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না।

পুরুষ প্রাধান্যে মনু সংহিতায় কন্যা দানের বস্তু ধার্য্য হইলেও প্রথমে পুষ্পমতী কন্যার বিবাহই প্রশস্ত ছিল

পুরুষের প্রাধান্যের মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে [বৌদ্ধ যুগে] বিবাহ নামক প্রথার প্রচলন হইল। কন্যা তখন দানের বস্তু বলিয়া ধার্য্য হইলেও মনু সংহিতায় পূর্ব্ব বর্ণিত পাঁচ রকম যৌন সম্বন্ধের সহিত নিম্ন লিখিত চারি প্রকার বিবাহ প্রথাও প্রচলিত হইল।:—১। ব্রাহ্ম, ২। দৈব, ৩। আর্য, ৪। প্রাজাপত্য। এই প্রকার বিবাহে যে কন্যাদান তাহার লক্ষণ সম্বন্ধে মনু সংহিতায় লিখিত আছে,—বরং কন্যা পুষ্পমতী

হইয়া আমরণ গৃহে থাকিবে সেও ভাল, তবুও বিদ্যাদি গুণ রহিত পাত্রে কন্যা দান করিবে না ॥ ৯।৮৯ ॥

এই বিধানের ভাষ্যে আচার্য্য মেধাতিথি লিখিয়াছেন,—অঋতুমতী কন্যা দান করিবে না। পুষ্পমতী হইলেও যে দান করিবে এমত নহে। যাবৎ গুণবান বর না পাওয়া যায়, তাবৎ কন্যাদান করিবে না। সুতরাং যখন এই মন্ত্র রচিত হইয়াছিল তখন ধার্য্য হইয়াছিল,—

(ক) অঋতুমতী কন্যা দান করা হইবে না।

(খ) পুষ্পমতী হইলেও যে যেমন তেমন পাত্রে দান করিবে তাহা নহে। যাবৎ গুণবান বর না পাওয়া যাইবে, তাবৎ কন্যা পুষ্পমতী হইয়া গৃহেই থাকিবে।

পুষ্পমতী কন্যার বিবাহ পক্ষে শাস্ত্রীয় অভিমত

ঋগ্বেদের কথা ও ইতিহাস পুরাণের কাহিনী মিলাইয়া দেখিলে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে,—নাবালিকা কন্যার বিবাহ কিম্বা নাবালিকা কন্যার সহবাস আর্য্য সভ্যতার অঙ্গ নহে এতৎ প্রসঙ্গে ঋগ্বেদে দুটি উল্লেখ যোগ্য মন্ত্র আছে।ঃ—

১। নাবালিকা ভ্রমে সম্ভোগ-কুণ্ঠ ঋষি ভায়ব্যকে নারী ঋষি লোমসা কহিতেছেন,—"নিকটে আসিয়া বিশেষরূপে স্পর্শ কর। আমার অঙ্গে লোম অল্প মনে করিও না, আমি গান্ধার দেশীয় মেষীর ন্যায় লোমপূর্ণা ও পূর্ণাবয়বা ॥ ১।১২৬।৭ ॥

উপরোক্ত মন্ত্র হইতে দুইটি বিষয় প্রকাশ পাইতেছে। (ক) প্রণয় বার্ত্তা পুরুষকে কন্যাই জানাইতেছে। (খ) সাবালিকা কন্যাই সহবাস যোগ্যা।

২। শিশু ঋষি বলেন,—সুন্দর ভাবে বহন করিতে পারে, এতাদৃশ রথে যোজিত হইতে অশ্ব কামনা করে, নর্ম্ম সচিবেরা [মোসাহেব]

হাস্য পরিহাস কামনা করে, পুরুষাঙ্গ রোম বিশিষ্ট দ্বিধাভিৎ প্রার্থনা করে ॥ ৯।১১২।৪ ॥

৩। সূর্য্যা ঋষি বলেন,—নিতম্বিনী কন্যা বিবাহ যোগ্যা॥ ১০।৮৫।২২॥

৪। ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ণ গৃহ্যসূত্র বলেন,—পুষ্পমতী কন্যা-বিবাহই প্রশস্ত ॥১।৮।১০—১১॥

৫। যজুর্ব্বেদীয় পারস্কর গৃহ্যসূত্র বলেন,—পুষ্পমতী কন্যা-বিবাহই প্রশস্ত ॥১।৮।২১॥

৬। যজুর্ব্বেদীয় জৈমিনি গৃহ্যসূত্র বলেন,—পুষ্পমতী কন্যা-বিবাহই প্রশস্ত ॥২০।১,২০।৬,২০।৭॥

৭। যজুর্ব্বেদীয় বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র বলেন,—পুষ্পমতী কন্যা-বিবাহই প্রশস্ত ॥১।৭।১১॥

৮। মহাভারতে পুষ্পমতী কন্যা বিবাহ পক্ষে দুই রকম বিধান আছে। :—(ক) ত্রিংশদ্বর্ষং ষোড়শাব্দাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাম্।
অতঃ প্রবৃত্তে রজসি কন্যাং দদ্যাৎ পিতা স্বকৃত ॥

(খ) কন্যা পুষ্পমতী হইয়া তিন বৎসর পরে স্বয়ম্বরা হইবে। যে কন্যা এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হয়, পতির সহিত সেই কন্যার প্রীতি অবিচলিত থাকে ও সন্তান সন্ততি পরিবর্দ্ধিত হয়। আর যে কন্যা এই নিয়মের অন্যথা করে, জন সমাজে তাহাকে নিশ্চয় নিন্দনীয় হইতে হয় ॥ অনুশাসন পর্ব্ব, ৪৪ অধ্যায় ॥

মহাভারতের উপরোক্ত দুইটি বিধানের মধ্যে প্রথমটি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবে অবাধ যৌন সম্বন্ধের গতি বা ব্যভিচার রোধ করিবার জন্য কন্যার সকল স্বাধীনতা হরণ করিয়া যখন তাহাকে দানের বস্তু বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছিল, সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবে প্রভাবিত বেদপন্থী সমাজকে মহাভারতে উক্ত বিধানটি যুক্ত করিতে হইয়াছিল। আর দ্বিতীয় বিধানটি প্রাচীনতম প্রথা। স্বয়ম্বরের কথা ঋগ্বেদেও আছে।:—

৯। বসুক্র ঋষি বলেন,—কত যোষিৎ আছে, যাহারা কেবল অর্থেই প্রীত হইয়া নারী সহবাসে অভিলাষী পুরুষের প্রতি অনুরক্ত হয়,

যে ভদ্রা, যাহার শরীর সুগঠিত, সে ঐ অনেক লোকের মধ্য হইতে আপনার মনোমত মিত্রকে বরণ করে ॥১০।২৭।১২॥

১০। মনু সংহিতায় গান্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস, পৈশাচ, স্বয়ম্বর প্রথা, ও যে মন্ত্রে কন্যাকে দানের বস্তু ধার্য্য করা হইয়াছে (৯।৮৯)— এই সকল মন্ত্রে পুষ্পমতী কন্যার বিবাহ ও পুরুষ সহবাস প্রশস্ত বলা হইয়াছে।

এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে,—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি আর্য্যা কন্যাগণের পরিণয়, প্রাপ্ত বয়সেই হইয়াছিল। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ রামায়ণের কথাকে বেমালুম চাপা দিয়া, পদ্ম পুরাণের কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিতে চান যে, সীতার ছয় বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল। রামায়ণে কিন্তু লিখিত আছে,—বিবাহের পরে রামচন্দ্রাদি চারি ভ্রাতা অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া—রেমিরে মুদিতাঃ সর্ব্বা ভর্ত্তৃভিঃ সহিতা রহঃ।* ছয় বৎসরের খুকী কন্যার পক্ষে যুবা স্বামীর সহবাস কি সম্ভব পর কথা?

১১। বিষ্ণু সংহিতা বলেন,—তিনবার পুষ্পমতী হইবার পরে কন্যা স্বয়ম্বরা হইবে ॥২৪।৪০॥

১২। গৌতম সংহিতা বলেন,—তিনবার পুষ্পমতী হইবার পরে কন্যা স্বয়ম্বরা হইবে ॥ ১৮ অধ্যায় ॥

১৩। বশিষ্ঠ সংহিতা বলেন,—পুষ্পমতী হইবার তিনবৎসর পরে কন্যা স্বয়ম্বরা হইবে ॥ ১৭ অধ্যায় ॥

* মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রবর শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয় অনুদিত রামায়ণে লিখিত আছে,—***তখন কৌশল্যা সুমিত্রা কৈকেয়ী ও অন্যান্য রাজপত্নীরা *** মহাভাগা সীতা, উর্ম্মিলা ও কুশধ্বজের দুই কন্যাকে গ্রহণ করিলেন। সেই সকল রাজ-কুমারীরা দেবালয়ে পূজা করিলেন এবং ভর্ত্তাদিগের সহিত প্রমোদ সহকারে একান্তে রমণ করিতে লাগিলেন ॥ আদিকাণ্ড, ৭৭ সর্গ।

১৪। হারিত সংহিতা বলেন,—সর্ব্বাবয়ব সম্পূর্ণা কন্যায় বিবাহই প্রশস্ত ॥৪।১—২॥

১৫। কাত্যায়ন সংহিতা বলেন,—কন্যার রোম, রজঃ ও কুচ প্রকাশ পাইবার পরেই বিবাহ প্রশস্ত ॥২৮।৪॥

বলা বাহুল্য ইতিহাস ও পুরাণ যে সকল মহিয়সী নারীকে আদর্শ-রূপে গ্রহণ করিতে সমাজকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে একজনও নোলক পরা খুকী বধূ ছিলেন না। প্রাপ্ত বয়স্কা হইবার পরেই সকলের বিবাহ হইয়াছিল এবং তাঁহারা সকলেই বীর পত্নী ও বীর প্রসবিনী ছিলেন।

যদিও ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তিনামার মধ্যে 'খুকী কন্যার বিবাহ দিতে হইবে' এমন কথা ছিল না, তবুও কেমন করিয়া যে সমাজে এমন মূলোচ্ছেদকারী পরিবর্ত্তন সম্ভব হইয়া খুকী বিবাহ প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার কোন শাস্ত্রীয় কারণ দৃষ্ট হয় না। তবে দুইটি মন্ত্র দেখিয়া জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে,—ইহা কন্যার স্বাধীন চিন্তাকে খর্ব্ব করিবার জন্য এবং পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি হইতে কুমারীগণকে রক্ষা করিবার জন্য খুকী বিবাহ প্রচলন করা প্রয়োজন হইয়াছিল। †

অঋতুমতী ও খুকী কন্যা বিবাহের পক্ষে শাস্ত্রীয় অভিমত

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে [এই গ্রন্থের ৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] যে একবর্ণও একবেদকে ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছিলেন। সেই বিভাগের ফলে,—ব্রাহ্মণের ভাগে সামবেদ, ক্ষত্রিয়ের ভাগে যজুর্ব্বেদ ও বৈশ্যের ভাগে ঋগ্বেদ ধার্য্য হইয়াছিল। এইজন্য সামবেদীয় গোভিল

---

† ১। পিতা রক্ষতি কৌমারে ইত্যাদি ॥ মনু সংহিতা, ৯।৩ ॥

২। এই গ্রন্থের ৯১ পৃষ্ঠায় "গুরুদ্রোহী ঋষির পুষ্পমতী নারী ধর্ষণে অনুজ্ঞা" বিষয় দ্রষ্টব্য।

গৃহ্যসূত্রের কথা একটু বলা প্রয়োজন। গোভিল গৃহ্যসূত্রে বিবাহ পদ্ধতির দ্বিতীয় প্রপাঠক, দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম মন্ত্রে লিখিত আছে,—চতুর্থ হোমের পরে বরের বাম হস্ত কন্যার পৃষ্ঠ বেষ্টন করিয়া বাম স্কন্ধে এবং কন্যার দক্ষিণ হস্ত বরের পৃষ্ঠ বেষ্টন করিয়া দক্ষিণ স্কন্ধে রাখিয়া উভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইবে। এই দ্বিতীয় প্রপাঠকের তৃতীয় খণ্ডের চতুর্দ্দশ মন্ত্রে লিখিত আছে,—যে দিবস বিবাহ কার্য্যে প্রথম প্রবৃত্ত হইবে, সেদিন লইয়া তিন দিন বর ও বধূ ক্ষার লবণ বর্জ্জিত আহার করিবে, পৃথক শয্যায় ভূমিতে উভয়ে শয়ন করিয়া সংযত থাকিবে। চতুর্থী কর্ম্মের পরে সহবাস করিবে।

উপরোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের প্রথম মন্ত্রে যদিও স্পষ্ট বিবাহিত কন্যার বয়স বুঝা যায় না কিন্তু দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাইবে যে,—অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যার পক্ষে বিবাহের চতুর্থ দিনে স্বামী সহবাস সম্ভবপর নহে। অথচ এই গোভিল গৃহ্যসূত্রের অন্যত্র লেখা আছে,—নগ্নিকা তু শ্রেষ্ঠা। অর্থাৎ—বিবাহে অঋতুমতী কন্যাই শ্রেষ্ঠা। গৃহ্যসূত্রের সমস্ত মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের মনে হয়,—গোভিল গৃহ্যসূত্রে অনগ্নিকা তু শ্রেষ্ঠা ছিল। পরবর্ত্তী সময়ে অনগ্নিকার 'অ' টি বাদ দেওয়া হইয়াছে।

এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে,—সংযমাত্মক ব্যবস্থা বৌদ্ধধর্ম্মের কথা। সুতরাং বিবাহের পরে যে তিন দিন সংযম করিয়া থাকিতে বর ও বধূকে বলা হইয়াছে, উহা বৌদ্ধ প্রভাবে বেদপন্থী সমাজকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ক্ষার লবণ বর্জ্জিত আহারের ব্যবস্থাও বৌদ্ধ প্রভাবে বলিতে হইবে। কারণ, এই বিবাহ পদ্ধতিতেই দৃষ্ট হইবে,—বধূকে গো-চর্ম্মে বসিতে হইবে এবং বিবাহের তিন দিনের মধ্যে বরকে গো সাধন মধুপর্কের দ্বারা আপ্যায়িত করিতে হইবে বলা হইয়াছে ॥২।৩।১৪॥

২। সামবেদীয় হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্রে লিখিত আছে,—সমানবর্ণা, অসমান গোত্রা, পুরুষ-সঙ্গ-বর্জ্জিতা, সহবাস যোগ্যা, অঋতুমতী কন্যা সহবাস করিবে। ভার্য্যাং উপগচ্ছেৎ স্বজাতাং নগ্নিকাং ব্রহ্মচারিণী অসগোত্রা।

মনুষ্যত্ব বলিয়া যে বস্তুটি তাহা হিরণ্যকেশীকে ত্যাগ করিয়াছিল বলিয়াই যাহা পশুর মধ্যেও প্রচলিত নাই, এমন ব্যবস্থা দিতে তিনি উৎসাহ বোধ করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থার ফলে কত লক্ষ লক্ষ অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যাকে যে পতির পাশবিক অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় নিশ্চিতই পুরুষের হইয়া উঠে নাই। হইলে, কদাচ ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের নামে এমন সয়তানী কর্ম্ম কেহ করিত না বা প্রশ্রয়ও দিত না।

৩। যম সংহিতা বলেন,—অপুষ্পমতী কন্যার বিবাহই প্রশস্ত।

৪। সংবর্ত্ত সংহিতা বলেন,—কন্যা অষ্টম বর্ষে গৌরী, নবমে রোহিনী ও দশমে কন্যা, ইহার ঊর্দ্ধে রজস্বলা। রজস্বলা হইবার পূর্ব্বে কন্যাদান প্রশস্ত ॥ ৬৭ শ্লোক ॥

[মন্তব্য :—দশ বৎসর বয়সের ঊর্দ্ধ হইলেই যদি রজস্বলা স্বীকার করিতে হয়, তবে মনু সংহিতায় যে লিখিত আছে,—ত্রিশ বৎসরের যুবা দ্বাদশ বৎসরের কন্যা বিবাহ করিবে (৯।৯৪), তাহা কি তবে অসঙ্গত ও অশাস্ত্রীয় বলিতে হইবে ?]

৫। বৃহস্পতি সংহিতা বলেন,—আট বৎসরের কন্যা দানের ফল সাত জন্ম ভোগ হয় ॥ ৩৪ শ্লোক ॥

৬। পরাশর সংহিতা বলেন,—অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে গৌরী নবম বর্ষীয়া কন্যাকে রোহিনী, দশম বর্ষীয়া বালিকাকে কন্যা বলে ইহার ঊর্দ্ধ বয়স হইলে রজস্বলা কহে। কন্যায় বার বৎসর বয়স হইলেও যদি সম্প্রদত্তা না হয়, তবে কন্যার পিতৃগণ মাসে মাসে কন্যার

মাসিকের রক্ত পান করিয়া থাকে। অবিবাহিত অবস্থায় কন্যাকে রজস্বলা দেখিলে, মাতা, পিতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তিনজনেই নরকগামী হয় ॥ ৭।৬—৮ ॥

৭। ব্যাস সংহিতা বলেন,—কন্যা পুষ্পমতী হইবার পূর্ব্বে দানই প্রশস্ত ॥ ২।৭ ॥

পরাশর সংহিতার ন্যায় অন্যান্য খান কতক সংহিতা খুকী কন্যা বিবাহের হেতুতে বলিয়াছেন,—

(ক) খুকী কন্যা দানের ফল সাত জন্ম থাকে।

(খ) বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা রজস্বলা হইলে মা, বাবা ও দাদাদের পরকালে নরক হয়।

(গ) আর মাসে মাসে অবিবাহিতা কন্যার যে মাসিক আর্ত্তব, সেই রক্ত অভিভাবকগণকে পান করিতে হয়।

পরাশর সংহিতার বিশেষ দ্রষ্টব্য অংশ

নাবালিকা কন্যা বিবাহ চালাইবার জন্য ইতরামী যে কত দূর চরমে উঠিয়াছিল, মাত্র তাহাই দেখাইবার জন্য এমন জঘন্য মন্ত্র উদ্ধৃত করিতে হইল। তবুও সকল দিক দিয়া দেখিলে একমাত্র পরাশর সংহিতার নাবালিকা কন্যা বিবাহই বরং সমর্থন করা যায়। কারণ, পরাশর সংহিতায় খুকী বিবাহের ব্যবস্থা থাকিলেও বিধবা বিবাহের বিধিও (৪।২৬) রহিয়াছে। কোন অবস্থায় যুবতী ও বৃদ্ধা যে, দূষিতা হয় না (৭।৩৭), পরপুরুষের সহিত মিলিত স্ত্রী যে পুষ্পমতী হইলেই শুদ্ধ হয় (৭।৪), অন্যত্র প্রায়শ্চিত্ত করিলেও মুক্ত হয় (১০ ২৬), একথাও যেমন লিখিত আছে, বিধবার পক্ষে সহমরণের (৭।২৮) ও আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালনের ব্যবস্থার (৭।২৭) সহিত তেমনই ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধানও (৪।১৯) রহিয়াছে। ইহা ছাড়া বিধবা চরিত্রহীনা

নারীকে সমাজ হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থাও রহিয়াছে। ১০।৬৮ ।

প্রতি ধর্ম্মগ্রন্থে যে কোন বিষয়ে 'হাঁ, না, এও বটে, ওও বটে আবার তাও বটে' দেখিতে পাওয়া যায়

এক মনু সংহিতার মধ্যে যে কোন বিষয়ে একস্থানে 'হাঁ' ও অন্যত্র 'না' থাকিবার একমাত্র হেতু হইল, ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তি নামার পূর্ব্বে যে সকল বিধি দ্বারা সমাজ শাসিত হইতে ছিল সেই সকল বিধান গুলিকে মনু সংহিতা হইতে বাদ না দিয়াই পরের বিধানগুলি যুক্ত করায় এমন একধারে হাঁ ও নার সমাবেশ হইয়াছে। ইহার মধ্যে মজা হইল এই যে, রক্ষণশীল ব্রহ্মণগণ ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ চুক্তি নামার মূলে যে সকল ব্যবস্থা হইয়াছিল, কোন কথা উঠিলে দেশবাসীকে তাঁহারা মনু, পরাশর, মহাভারত, পুরাণ বা যে কোন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে ঐ না আর না ই শুনাইয়াছেন ; হাঁর কথা ভ্রমেও উল্লেখ করেন নাই। আমরা সংক্ষেপে মনুসংহিতা হইতে নিম্নে তাহারই কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম।

অতীতের প্রাচীন প্রথা ছিল কন্যা প্রাধান্য। তাই মনু সংহিতায় স্বয়ম্বর প্রথা (৯।৯০) রহিয়াছে। তারপরে আসিল পুরুষ প্রাধান্যের যুগ। তখন পুরুষের পছন্দে কন্যা গ্রহণের (২।২৩৮) প্রথা আরম্ভ হইল। ইহার পরে যখন আর্য্যগণ অনার্য্য কন্যা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি (২।২৪০) লিখিত হইল। তার পরে যখন আর্য্যগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণে গুণগত ভাবে বিভক্ত এবং ভারতের আদিম অধিবাসীদিগকে (অনার্য্য) নির্গুণ শূদ্র আখ্যা প্রদান করিল, তখন অনুলোম প্রথায় চারিবর্ণের সবর্ণা কন্যা গ্রহণ চলিতে (৩।১২-১৩) লাগিল। এই সময়ে পুরুষের

পক্ষে বহু বিবাহ প্রচলিত হইল। এই বিবাহ প্রসঙ্গে মনু সংহিতায় লিখিত আছে, দ্বিজাতি জীবনের প্রথম ভাগ গুরুগৃহে, দ্বিতীয় ভাগে কৃতদার হইয়া গৃহে বসতি করিবে। যখন এই মন্ত্র রচিত হইয়াছিল, তখন বেদপন্থী সমাজের উপরে বৌদ্ধ প্রভাব বিলক্ষণ আপতিত হইয়া স্মৃতিশাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমের পত্তন হইয়াছিল, অবশ্য কাগজে কলমে। সন্ন্যাস যে প্রাচীন প্রথা নহে, তাহা বেদজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিবেন। সমগ্র মহাভারতের মধ্যে মাত্র সুলভা সন্ন্যাসিনীর কথা রহিয়াছে। বাধ্যতা মূলক গুরুগৃহও নাই, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসও নাই! এই মত যদি প্রাচীন হইবে, তবে ঋষি ও ক্ষত্রিয় রাজাগণ মধ্যে সকলকেই চারি আশ্রম স্বীকার করিতে দৃষ্ট হইত।

ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তি নামার পরে যখন সবর্ণা কন্যা বিবাহ ধার্য্য হইল, তখন মনু সংহিতায় লিখিত হইল, সমাবর্ত্তন পরে দ্বিজাতি সুলক্ষণা সবর্ণা কন্যা বিবাহ করিবে ॥ ৩।৪ ॥ সবর্ণা কন্যা বিবাহ প্রথার সঙ্গে গোত্রও প্রচলিত হইল। তখন মনু সংহিতায় লিখিত হইল,—

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
স প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দার কর্ম্মণি মৈথুনে ॥ ৩।৫ ॥

অর্থাৎ—যে কন্যা মাতার সপিণ্ডা ও পিতার সগোত্রা না হয়, সহবাসের জন্য এমন কন্যা বিবাহই প্রশস্ত।

হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্রেও গোত্রের কথা আছে। কিন্তু ইহা প্রাচীন মত নহে। মহাভারতে কিন্তু জ্ঞাতি কন্যা বিবাহই প্রশস্ত দৃষ্ট হয়।

মহাভারতে দেখা যায়, রাজর্ষি যযাতির যদু, তুর্ব্বসু, অনু, দ্রুহ্য ও পুরু নামে পাঁচ পুত্র ছিলেন এবং ইহাও দেখা যায় যে, এই পাঁচ ভ্রাতার

সন্তানগণ মধ্যেই উত্তর কালে যৌন সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। বসুদেব + দেবকী, ধৃতরাষ্ট্র + গান্ধারী, পাণ্ডু + কুন্তী, অর্জ্জুন + সুভদ্রা, যুধিষ্ঠির + দ্রৌপদী—যত নাম মহাভারতে আছে, প্রায় সকলেই জ্ঞাতি কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আর্য্য সভ্যতা বা বৈদিক ধর্ম্ম প্রবৃত্তি মার্গে প্রতিষ্ঠিত। সেই ধর্ম্ম বৌদ্ধদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া বিবাহিতের পক্ষে চতুর্থী কর্ম্ম-রূপে আংশিক ভাবে আত্ম প্রকাশ করিল। চতুর্থী কর্ম্মের কথা ঋগ্বেদে নাই কিন্তু গৃহ্যসূত্রগুলির মধ্যে উক্ত আছে যে, বিবাহের পরে পতি পত্নী তিন দিন পৃথক শয্যায় ভূমিতে শয়ন করিবে অক্ষার-লবণ আহার করিবে এবং তিন দিন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে। চতুর্থ দিনে চতুর্থী কর্ম্ম সমাধা করিয়া স্ত্রী সহবাস করিবে। বিবাহের সদ্য উদ্দেশ্যই যখন স্ত্রী সহবাস, তখন নাবালিকা কন্যা বিবাহের কথা উঠিতেই পারে না। কিন্তু গরজ যখন বালাই হইয়া আসে, তখনই হিরণ্যকেশীর মত গৃহ্যসূত্র প্রণেতারও ধূমকেতুর মতনই আবির্ভাব হইয়া থাকে। আর তখনই অপুষ্পমতী কন্যা-সহবাসের ব্যবস্থাও হইয়া থাকে। হিরণ্যকেশী চতুর্থী কর্ম্মের সহিত সঙ্গতি রাখিতে যাইয়া যে মৌলিকতা দেখাইয়াছেন, তাহা বস্তুতই অমানুষিক।

স্ত্রী প্রাধান্য ও স্ত্রী স্বাধীনতা এতদুভয়ই আর্য্য সভ্যতার অঙ্গ

কেমন করিয়া আর্য্যগণের মধ্যে স্ত্রী প্রাধান্য ও স্ত্রী স্বাধীনতা স্থিতি লাভ করিয়াছিল, সে কথা ঋগ্বেদ সহায়ে বলিবার কোন উপায় না থাকিলেও, স্ত্রী প্রাধান্য ও স্ত্রী স্বাধীনতা যে আর্য্যগণের সভ্যতার এক উজ্জ্বল দিক, একথা ঋগ্বেদ সহায়ে অনায়াসে দেখান যাইতে পারে। মহাভারতে উল্লেখ যোগ্য যত কাহিনী, তাহাতে স্ত্রী প্রাধান্য ও স্ত্রী

স্বাধীনতাই কীর্ত্তিত আছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে মদনোৎসব বা বসন্তোৎসব স্ত্রী স্বাধীনতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পর্দ্দা প্রথা মুসলমান সভ্যতার অঙ্গ। মুসলমান রাজত্বে রাজধর্ম্মের অনুশরণ ও হিন্দু নারীগণকে মুসলমানের চক্ষুর অন্তরালে রাখিবার জন্য হিন্দুসমাজকে অবরোধ প্রথা ও মাথায় ঘোমটা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ইংরাজ রাজত্বে যে হিন্দুর ঘরে অবরোধ প্রথা, উহা মুসলমান আমলের জের টানা ছাড়া আর কিছুই নহে।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু সমাজে স্ত্রী স্বাধীনতা যে কিছু কিছু দেখা যাইতেছে, তাহার মূলে রহিয়াছে রাজধর্ম্ম। ইহা ছাড়া মেয়েদের স্কুল ও কলেজে যাওয়া ও চাকুরী গ্রহণের ফলে সে স্বাধীনতার মাত্রা ক্রমশঃই বাড়িতেছে। আর এক সঙ্গে সমস্ত ভারতে যে নারী জাগরণ—তাহা মহাত্মা গান্ধীর বিগত আইন অমান্য আন্দোলন উপলক্ষ্যেই সম্ভব হইয়াছিল।

অতীতের স্ত্রী প্রাধান্য ও স্ত্রী স্বাধীনতার কথা রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ মানিতে অথবা স্বীকার করিতে চান না। তাঁহারা বলেন, আজ যে শিক্ষিত ভারতবাসী স্ত্রী স্বাধীনতা প্রবর্ত্তনে উৎসাহী, ইহা নিছক পাশ্চাত্য শিক্ষারই কুফল। সনাতনীগণ বলেন, "সনাতন হিন্দু ধর্ম্মে, সনাতন অবারোধ (?) প্রথার সহিত স্ত্রীজাতি সতত পুরুষেব অধীনে থাকিয়া হিন্দুধর্ম্মের যে বৈশিষ্ট রক্ষা করিতেছে, তাহাই পরম মঙ্গল জনক। পাশ্চাত্য সভ্যতা যৌবনের পূজা। অতএব উহা ব্যভি-চারেরই নামান্তর।" আমরা কিন্তু আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিলাম,—

রক্ষণশীলগণ কদাচ সনাতনধর্ম্মী নহেন। তাঁহারা নিছক সনাতন মিথ্যাশ্রয়ী মাত্র।

ঋগ্বেদে দেখা যায়, অফুরন্ত উৎসাহ লইয়া আর্য্যগণ অনার্য্য ধ্বংস করিয়া ভারতকে আর্য্যের অধীনতায় আনিতে উৎসাহী ছিল।

মহাভারতে দেখা যায়, ক্রমাগত যুদ্ধ দ্বারা অনার্য্যগণকে বশ করিতে চেষ্টা করা অপেক্ষা অনার্য্য কন্যা গ্রহণ করিয়া অনার্য্যের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে আর্য্যরাজগণ সচেষ্ট। ঘটনা পরম্পরা দেখিয়া নিঃসন্দেহে মনে হইবে, শস্ত্র প্রয়োগ অপেক্ষা অনার্য্যের সহিত যৌন সম্বন্ধ স্থাপনের ফলেই বৃহত্তর বা মহাভারতের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ পুনরায় বলা যাইতে পারে যে, মহাভারতে রাজর্ষি যযাতির সহিত অনার্য্যা কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার মিলনের কথা যেমন লিখিত আছে, তেমন অনার্য্য দাস রাজের দুহিতা সত্যবতীর সহিত শান্তনুর পরিণয়ের কথাও লিখিত আছে। অন্যদিকে 'অসীতাঙ্গ পরাশর' কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ, শুক প্রভৃতি ঋষিগণের মাতৃকুল যে অনার্য্য [অসবর্ণ] ছিল, তাহাও উক্ত আছে।

মনু সংহিতায় অসবর্ণা কন্যা বিবাহের বিধান ও দায়ভাগে শূদ্রা পুত্রকে পিতৃ বিষয়ের অংশ দেওয়ার যেমন ব্যবস্থা রহিয়াছে, তেমন অসবর্ণা [অনার্য্যা] কন্যা বিবাহের বিপক্ষে বিধান ও দায়ভাগে শূদ্রা পুত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইবারও ব্যবস্থা রহিয়াছে। একই গ্রন্থে এমন বিপরীত ব্যবস্থা দেখিয়া জানিতে হইবে, প্রথমে অসবর্ণা কন্যা বিবাহ ও শূদ্রা পুত্রকে পৈত্রিক বিষয়ের অংশ দেওয়ার যে ব্যবস্থা ছিল, ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তির ফলে অসবর্ণা কন্যা বিবাহ বাতিল হওয়ায় দায়ভাগেও শূদ্রা পুত্রের ভাগে শূন্য খবরা লিখিতে হইয়াছিল।

মনুসংহিতায় অসবর্ণা-কন্যা-বিবাহ-পক্ষে

১। দ্বিজাতিগণের প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যাই প্রশস্ত। কিন্তু কামাধীন হইয়া বিবাহ করিলে অসবর্ণা কন্যাও বিবাহ করিতে পারিবে ॥ মনু সংহিতা, ৩।১২ ॥

২। ব্রাহ্মণ প্রথমে ব্রাহ্মা কন্যা বিবাহ করিবে। পরে ইচ্ছা হইলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে॥ ৩।১৩॥

[মন্তব্যঃ—পাঠক লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, মনু সংহিতায় তৃতীয় অধ্যায়র ১২,১৩ শ্লোকে শূদ্রকন্যা বিবাহ স্বীকৃত হইবার ঠিক পরের শ্লোকেই উহা অস্বীকৃত হইয়াছে।]

মনুসংহিতায় অসবর্ণা কন্যা বিবাহের পুত্রগণ মধ্যে পৈত্রিক ধন বিভাগ—

১। যেখানে এক ব্রাহ্মণ, এক ক্ষত্রিয়, এক বৈশ্য ও এক শূদ্র পুত্র, সেখানে পিতৃধন সাড়ে সাত ভাগে বিভক্ত হইয়া ব্রাহ্মণীপুত্র তিন ভাগ ও শূদ্রা পুত্র এক ভাগ পাইবে॥ ৯।১৫১॥ অন্য মতে,—

২। ব্রাহ্মণীপুত্র চারি ভাগ, ক্ষত্রিয়া পুত্র তিন ভাগ, বৈশ্যাপুত্র দুই ভাগ ও শূদ্রাপুত্র এক ভাগ পাইবে॥ ৯।১৫৩॥

ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তি নামার পরে মনু সংহিতায় অসবর্ণা-কন্যা-বিবাহের বিরুদ্ধে মন্ত্র সমাবেশ

দ্বিজাতিগণের সবর্ণা স্ত্রীর অভাব হইলেও কোন কালে বা কোন পুরাবৃত্তে মহর্ষিগণ শূদ্রা কন্যা ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিতে বলেন নাই॥ মনুসংহিতা, ৩।১৪॥

২। মোহবশতঃ দ্বিজাতি শূদ্রকন্যা বিবাহ করিলে, সেই স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তানের সহিত অবিলম্বে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়॥ মনু সংহিতা, ৩।১৫॥

৩। মহর্ষি অত্রির মতে দ্বিজাতি শূদ্রকন্যা বিবাহ করিলেই পতিত হয়। মহর্ষি শৌনকের মতে তাহাতে সন্তান উৎপাদন করিলে পতিত হয়। মহর্ষি ভৃগুর মতে সেই সন্তানের সন্তান জন্মিলে পতিত হইবে॥ মনু সংহিতা, ৩।১৬॥

আমাদের মনে হয়, মনু সংহিতার ৩।১৬ মন্ত্র রচিত হইবার ফলে ভ্রূণ হত্যা ও জন্ম শাসন বিদ্যা ব্রাহ্মণগণকে বাধ্য হইয়া আশ্রয় করিতে হইয়াছিল। জন্ম শাসনের উপায় বৃহদারণ্যক উপনিষদের [৬।৪।১০] মধ্যে ব্যক্ত আছে।

চুক্তিনামার ফলে অসবর্ণা কন্যা বিবাহের বিরুদ্ধে দায়ভাগ রচনা

১। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের নির্গুণ শূদ্রা পুত্রের ধনভাগ হয় না। জীবিতাবস্থায় পিতা যাহা দিবেন, তাহাই উহার ধন হইবে ॥ ৯।১৫৫ ॥

মূলে 'কুমারী' শূদ্রাপুত্রের কথা না থাকিলেও কুল্লুক ভট্টের টীকায় আছে,—অনূঢ়শূদ্রাপুত্র বিষয়োঽয়ং দশমভাগ নিষেধঃ। এবম্প্রকার মূল উল্লঙ্ঘন করিয়া টীকা করায় নিঃসন্দেহে মনে হইবে,—টীকাকারের সম সাময়িক বাঙ্গলা দেশে অনূঢ়া শূদ্রকন্যাতে পুত্রোৎপাদন করিবার উৎসাহ ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যে বিলক্ষণই ছিল এবং সেই . সেই ভিক্ষা স্বরূপ কিছু দিতেও সম্মত ছিল, কিন্তু বিষয়ের দশমাংশ দিতে তাহারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

মহাভারতে লিখিত আছে—প্রাচীন ভারতে বিবাহ বলিয়া কোন প্রথা ছিলনা। মনু সংহিতার মধ্যেও তাহার প্রমাণ আছে। তারপর যখন বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল, তখন ইহা চুক্তি মূলকই হইয়াছিল।

মনু সংহিতায় বিবাহ চুক্তি মূলক, ধর্ম্ম মূলক নহে

ঋগ্বেদে—পত্নীর পতি-ত্যাগ দৃষ্ট হইবে। আর এই ত্যাগের উপলক্ষ্য—পাশা খেলা ॥ ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ৩৪ সূক্ত ॥

মনু সংহিতায়ও পতির পক্ষে পত্নী ও পত্নীর পক্ষে পতি ত্যাগের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

পত্নীর পক্ষে পতি ত্যাগের হেতু :—

(ক) পতি ধর্ম্মের জন্য গৃহত্যাগ করিলে, স্ত্রী পতির জন্য আট বৎসর প্রতীক্ষা করিবে। পতি বিদ্যা ও যশোপার্জ্জনের জন্য বিদেশে গেলে, পত্নী পতির জন্য ছয় বৎসর প্রতীক্ষা করিবে। পতি (পত্নী ভিন্ন) অন্য কোন স্ত্রীর জন্য দেশ ত্যাগ করিলে, তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিবে ॥ ৯।৭৬ ॥

পতির পক্ষে পত্নী ত্যাগের হেতু :—

(খ) পত্নী পতিকে বিদ্বেষ করিলে [মনু সংহিতায় ব্যভিচারের জন্য পতির পক্ষে পত্নী কিম্বা পত্নীর পক্ষে পতি-ত্যাগের বিধান নাই] পতি এক বৎসর দেখিবে। এক বৎসর পরেও যদি পত্নী পতিকে পূর্ব্ববৎ বিদ্বেষ করিতে থাকে, তখন পতি যাহা পত্নীকে দিয়াছিল, সেই স্ত্রীধন হস্তগত করিয়া পত্নীকে ত্যাগ করিবে ॥ ৯।৭৭ ॥

এই উভয় অবস্থার পরে পতি পত্নী সম্বন্ধ দূরীভূত হইলে, পত্নী কি করিবে, তাহাও এই মনু সংহিতাতেই ব্যক্ত আছে :—

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূর্ত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে ॥ ৯।১৭৫ ॥

অর্থাৎ—পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা ইচ্ছা হইলে পরপুরুষ সহায়ে পুত্রোৎপাদন করাইবে। ঐ পুত্র উৎপাদকের পৌনর্ভব পুত্র বলিয়া কথিত হইবে।

ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তিনামার পূর্ব্বে বিধবার নিয়োগ ও পুরুষান্তর গ্রহণের বিধি

মনু সংহিতার নবম অধ্যায়ে নিয়োগ প্রথায় গুরুজনের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া বিধবার পক্ষে পুত্রোৎপাদনের বিধির সহিত স্বেচ্ছায় পুরুষান্তর

গ্রহণ করিয়া পুত্র লাভ করিবার ব্যবস্থা যেমন আছে, ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তিনামার পরে তাহার নিষেধাত্মক ব্যবস্থাগুলিও তেমনই লিখিত হইয়াছে :—

পক্ষে :—১। সন্তানের অভাবে স্ত্রী পতি প্রভৃতি গুরুজন কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া দেবর অথবা অন্য কোন সপিণ্ড হইতে সন্তান লাভ করিবে ॥ ৯।৫৯ ; ১।১৬৭ ॥

২। বিধবা অথবা অক্ষম পতির পত্নী গুরুজন কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া দেবরের দ্বারা একটী পুত্র উৎপাদন করাইবে। কদাচ দ্বিতীয় পুত্র উৎপাদন করাইবে না ॥ ৯।৬০ ॥

৩। কোন কোন আচার্য্য এক পুত্র অপুত্রের মধ্যে কহিয়াছেন। এই জন্য [বিধবা] দ্বিতীয় পুত্র উৎপাদন করাইতে পারিবে ॥ ৯।৬১ ॥

৪। বাগদত্তা কন্যার ভাবী পতির মৃত্যু হইলে, নিম্ন বিধানানুসারে নিজ দেবরকে গ্রহণ করিবে ॥ ৯।৬৯ ॥

৫। শুক্ল বস্ত্র পরিহিতা বিধবা প্রতি মাসে পুষ্পমতী হইবার পরে দেবরের সহবাস করিবে। এই মিলনের সন্তান মৃত স্বামীর ক্ষেত্রজ পুত্র বলিয়া গণ্য হইবে ॥ ৯।৭০ ॥

৬। পতি পরিত্যক্তা বা বিধবা স্বেচ্ছায় পর পুরুষ সহায়ে পুত্র লাভ করিতে পারিবে ॥ ৯।১৭৫ ॥ এই মন্ত্রের কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

বিপক্ষে :—(ক) দ্বিজাতি কখন অন্যের স্ত্রীতে পুরুষ নিয়োগ করিবে না। এইরূপ নিয়োগে অনাদি পরম্পরাগত সনাতন ধর্ম্ম নষ্ট হয় ॥ ৯।৬৪ ॥

(খ) বিবাহে যে সকল মন্ত্র আছে, তাহাতে এমন প্রকাশ নাই যে, একের স্ত্রীতে অন্যের নিয়োগ হইতে পারে এবং বিবাহ বিষয়ক শাস্ত্রে লিখিত নাই যে,—বিধবার পুনর্বিবাহ বা নিয়োগ হইতে পারে ॥ ৯।৬৫ ॥

মন্তব্য :—এই মন্ত্রের রচনা হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে,—বিবাহ বিষয়ক ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তিনামার পরে রচিত হইয়াছিল বলিয়াই উহার মধ্যে বিধবার নিয়োগ বা বিবাহ কিছুই স্বীকৃত হয় নাই। বিধবার পক্ষে নিয়োগ ও পুনরায় বিবাহ যে প্রচলিত ছিল, তাহা মনুর বিধানে যেমন আছে, তেমন মহাভারতের কথা ও কাহিনীর মধ্যেও আছে। সে কথা পরে প্রকাশ পাইবে।

(গ) একের স্ত্রীতে অন্যের যে নিয়োগ তাহা মাননীয় ধর্ম্ম নহে, সুতরাং মানুষের পক্ষে এই পশু ধর্ম্ম গর্হিত কর্ম্ম ॥ ৯৷৬৬ ॥

অতএব মন্বাদি শাস্ত্রে লিখিত হইল :—(১) যে ব্রাহ্মণ শূদ্রা বা বিধবা বিবাহ করিবে, তাহাকে দেব [হব্য] ও পিতৃকার্য্যে [কব্যে] নিমন্ত্রণ করিবে না ॥ ৩৷১৫৫ ॥

(২) বিধবার স্বামীকে হব্য কব্যে নিমন্ত্রণ করিবে না ॥ ৩৷১৬৬ ॥

(৩) পৌনর্ভব [বিধবার পুত্র] দ্বিজকে হব্য কব্য দান করিলে নিষ্ফল হইবে ॥ ৩৷১৮১ ॥

(৪) শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণকে দান করিলে নিষ্ফল হয় ॥ ৩.১৭৮ ॥

মন্তব্য :—নিয়োগ ও বিধবা বিবাহ প্রথা রোধ করিবার জন্য মনু সংহিতার নবম অধ্যায়ে ৬৪, ৬৫, ৬৬ শ্লোক যুক্ত করিয়াই চুক্তিনামা সমর্থনকারীর দল নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহারা 'দেব ও পিতৃকার্য্যে বিধবার পুত্রকে হব্য কব্যে নিমন্ত্রণ করিবে না' বলিয়া তৃতীয় অধ্যায়ে তিনটি বিধান যুক্ত করিলেন। অধিকন্তু যাহাতে ভূতপূর্ব্ব শূদ্র শশুর কুলের যজন যাজন ব্রাহ্মণগণ আর না করেন, তৎজন্য ৩৷১৭৮ শ্লোকটিও যুক্ত করিতে হইল। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ পরে রচিত নিষেধাত্মক বিধিগুলিই সমাজকে শুনাইতেছেন। পূর্ব্বকার ব্যবস্থার কথা ভ্রমেও সমাজকে শুনান নাই। বরং কেহ বলিলে,—তাহার

সহিত মারমুখো হইয়া কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং এখনও হইতেছেন।

নিয়োগ ও পত্যন্তর গ্রহণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মহাভারতে লিখিত আছে,—

১। জননী সত্যবতী পুত্র ব্যাসকে কহিতেছেন,—"বৎস! পুত্র পিতা মাতা উভয়েরই সাধারণ ধন। পুত্রের প্রতি পিতার যেরূপ প্রভুত্ব, মাতারও তদপেক্ষা কম নহে। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, বিচিত্রবীর্য্য কনিষ্ঠ। ভীষ্ম যেমন পিতৃ সম্বন্ধে বিচিত্রবীর্য্যের ভ্রাতা, তুমিও তদ্রূপ মাতৃ সম্বন্ধে তাহার ভ্রাতা। ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি দার পরিগ্রহ করিবেন না। অতএব হে অনঘ! ভীষ্ম এবং আমি তোমাকে নিয়োগ করিতেছি—তুমি ভ্রাতার প্রতি অনুকুল ও পৃথিবীস্থ প্রাণিগণের প্রতি দয়াবান হইয়া আমাদিগের বংশ রক্ষার্থ নিয়োগ বাক্য রক্ষা কর তাহা হইলে প্রীত হইব। রূপযৌবনা তোমার ভ্রাতৃ জায়ারা অতিশয় পুত্রার্থিণী হইয়াছেন, তুমি তাহাদের গর্ভে অনুরূপ পুত্রোৎপাদন করিয়া তাহাদিগের মনোরথ সিদ্ধ কর। ব্যাসদেব কহিলেন,—হে প্রাজ্ঞে! তুমি বিশেষরূপে সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত আছে এবং ধর্ম্মের প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি ও একান্ত অনুরাগ আছে। এই নিমিত্ত তোমার অভিলষিত কার্য্য ধর্ম্মমূলক বিবেচনা করিয়া ভ্রাতার ক্ষেত্রে [বিধবা অম্বিকায়] মিত্রাবরুণ সদৃশ পুত্রোৎপাদন করিব॥" আদি পর্ব্ব, ৬৫ অধ্যায়॥

মনুক্ত ৯।৬৬ বিধান সনাতন বলিয়া মানিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, রাণী সত্যবতী পুত্র ব্যাসদেবকে পশুধর্ম্ম পালনে আদেশ করিয়া ছিলেন এবং মহর্ষি ব্যাসদেবও সেই পশুধর্ম্ম পালন করিয়া মনুর ঐ

বিধান মতে নিন্দিত হইয়া ছিলেন। মহাভারতে কিন্তু কোন নিন্দার কথাই লিখিত হয় নাই।

২। পাণ্ডুর আদেশে নিয়োগ প্রথায় কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরাদি তিন পুত্র ও মাদ্রীর যমজ পুত্র [নকুল ও সহদেব] লাভ হইয়াছিল॥ আদি পর্ব্ব, ১২৩—১২৪ অধ্যায়॥

(ক) পত্যভাবে যথৈব স্ত্রী দেবরং কুরুতে পতিম্।
আনন্তার্য্যত্তথা ক্ষত্রং পৃথিবী কুরুতে পতিম্॥
শান্তি পর্ব্ব, ৭২ অধ্যায়॥

(খ) নারী তু পত্যভাবে বৈ দেবরং কুরুতে পতিম্।
পৃথিবী ব্রাহ্মণালাভে ক্ষত্রিয়ং কুরুতে পতিম্॥
অনুশাসন পর্ব্ব, ৮ অধ্যায়॥

উক্ত বিধানদ্বয়ে প্রকাশ আছে, পতির অভাব ঘটিলে বিধবা যেমন দেবরকে পতি করে।

৩। অর্জ্জুনের সহিত বিধবা উলুপীর সহবাস ও সেই সহবাস জাত সন্তান অর্জ্জুনের পুত্র বলিয়া খ্যাত॥ আদি পর্ব্ব, ২১৪ অধ্যায়।

৪। গৌতম নামে এক যুবা ব্রাহ্মণের বিধবা শূদ্রাস্ত্রীর পাণিগ্রহণ॥ শান্তি পর্ব্ব, ১৭১ অধ্যায়॥

বিধবার পুরুষান্তর গ্রহণ যে প্রচলিত ছিল, তাহার অকাট্য প্রমাণ দায়ভাগে পৌনর্ভবের পিতৃধনে অধিকার

মনু সংহিতার দায়ভাগের একটি বিধান হইতে পরিষ্কার প্রমাণিত হইতেছে যে, মনুক্ত বিবাহ পদ্ধতি চুক্তি মূলক ছিল এবং পৌনর্ভব পুত্রও পিতৃধনের অধিকারী হইত। যথা,—ঔরস পুত্র উৎপন্ন করিয়া ধনীর মৃত্যু হইলে, পত্নী নাবালক পুত্রের হস্তে পতিধন অর্পণ না করিয়া যদি আপনি গ্রহণ (রক্ষা) করে ও অন্য পুরুষ সহায়ে এক

পৌনর্ভব পুত্র উৎপাদন করে, পরে পৌনর্ভবের পিতার মৃত্যু হইলে ঐ ধনও ঐ স্ত্রী যদি রক্ষা করে, তারপরে কোন এক সময় ঔরস পুত্র ও পৌনর্ভব পুত্র ধন গ্রহণের জন্য বিবাদী হইলে, উহাদিগের বিবাদ পরিহারার্থ ঔরসের পিতার ধন (রাজা) ঔরসকে দিবেন, পৌনর্ভবের পিতার ধন পৌনর্ভব সন্তানকে দিবেন ॥ ৯।১৯১ ॥

মনু সংহিতা হইতে পাঁচ রকম আপদে নিপতিতা নারীর পত্যন্তর গ্রহণ-বিধানটি অপহৃত

প্রাচীন মনু সংহিতায় একদা একটি উল্লেখযোগ্য মন্ত্র ছিল, যাহা বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত মনুসংহিতায় নাই। মন্ত্রটি হইল,—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পাতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎস্বনারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥

অর্থাৎ বাক্‌দত্তা কন্যার ভাবী পতির মৃত্যু [নষ্টে] হইলে, বিবাহিতা নারীর পতি বিয়োগ [মৃতে] হইলে, পতি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, পতি ক্লীব হইলে, পতি পাতিত্য কর্ম্ম দ্বারা পতিত হইলে—এই পাঁচ প্রকার আপদে নিপতিতা নারীর অন্য পতি গ্রহণ করিবার বিধি আছে।

উপরোক্ত মন্ত্রটি যে মনু সংহিতা হইতে অপহৃত হইয়াছে, তৎপক্ষে দুইটি অকাট্য প্রমাণের উল্লেখ আছে।—

(ক) উপরোক্ত মন্ত্রটি পরাশর সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের ছাব্বিশ শ্লোকে আছে। এই পরাশর সংহিতার টীকাকার মাধবাচার্য্য উক্ত মন্ত্রের টীকায় বলিয়াছেন,—'নষ্টে মৃতে' মন্ত্রটি পরাশর সংহিতার নিজস্ব মৌলিক অভিমত নহে। সংহিতাকার মনু সংহিতা হইতে উক্ত [৪।২৬] মন্ত্রটি গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, মাধবাচার্য্য যখন পরাশর সংহিতার টীকা লিখিয়াছিলেন, তখন তিনি 'নষ্টে মৃতে' মন্ত্রটি মনু সংহিতায় নিশ্চয়ই দেখিয়াছিলেন।

(খ) শুধু যে মাধবাচার্য্যই ঐ মন্ত্রটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন এমত নহে। বীরমিত্রোদয় গ্রন্থে ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের —"তস্মাৎ * * * নৈকস্যৈ বহবঃ সহ পতয়ঃ [ঋগ্বেদে কিন্তু এক নারীর বহু পতির কথা উক্ত আছে] ৩।১২ মন্ত্রে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া মিত্রমিশ্র লিখিয়াছেন,—"পুরুষের বহু জায়া হইতে পারে [ঋগ্বেদে কিন্তু পুরুষের বহু জায়ার একটিও উদাহরণ দেখা যায় না, বা তৎ অনুকূলে কোন মন্ত্রও লিখিত হয় নাই] কিন্তু নারীর সহ পতি হইতে পারে না। *। শ্রুতির এই 'সহ' শব্দের জন্য ক্রমে পত্যন্তর হইতে পারে [পতির অভাবে অন্য পতি হইতে পারে] বুঝা যাইতেছে।" কেন বুঝা যাইতেছে, তাহার হেতু দেখাইতে যাইয়া মিত্রমিশ্র লিখিয়াছেন,—"এই জন্যই নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে বচনের দ্বারা মনু নারীর পত্যন্তরের ব্যবস্থা দিয়াছেন।"

অতএব যতক্ষণ উপরোক্ত অকাট্য প্রমাণের বিরুদ্ধে কেহ কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে না পারিবেন যে,—নষ্টে মৃতে মন্ত্রটি মনু সংহিতার নিজস্ব ছিলনা, ততক্ষণ মাধবাচার্য্য ও মিত্রমিশ্রের উক্তিই গৃহীত হইবে। অর্থাৎ যে মনু সংহিতায় একদা নষ্টে মৃতে মন্ত্রটি ছিল, তাহা যে শুধু অপহৃত হইল, এমত নহে। তৎস্থলে নূতন করিয়া লিখিত হইল,—ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।

* ঋগ্বেদে নারীর বহু পতির কথা আছে। যথা,—

তুভ্যমগ্রে পর্যবহন্ত সূর্য্যাং বহতুনা সহ
পুনঃ পতিভ্যো জায়াং দা অগ্নে প্রজয়া সহ ॥ ১০।৮৫।৩৮ ॥

অর্থাৎ—* * * তুমি সন্তান সন্ততি সহ জায়াকে পতিদিগের নিকট সমর্পন করিলে। মহাভারতে দ্রৌপদী, বার্ক্ষী ও জটিলার বহু পতির কথা লিখিত আছে।

কন্যা কখন স্বাধীনা নহে

যে কন্যা শব্দের ধাতুগত অর্থই তাহাকে চির স্বাধীনা স্বীকার করিয়াছে, সেই চির স্বাধীনা কন্যাকুলের যৌন প্রসঙ্গে ইচ্ছামত পুরুষ সহবাসের কথা বেদ ও মহাভারতে লিপিবদ্ধ থাকিবার পরেও ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তি নামার বলে অসবর্ণ কন্যা বিবাহ ও বিধবা বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য রচিত হইল,—

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রো ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি ॥ ১০৩ ॥

অর্থাৎ—কন্যাবস্থায় নারীকে পিতা, যৌবনে ভর্ত্তা, বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রেরা রক্ষা করিবে। কোন অবস্থায় স্ত্রী স্বাধীনা থাকিবে না।

এই যে 'কোন অবস্থায়ই নারী স্বাধীনা থাকিবে না', প্রচারিত হইল, ইহার ফলে স্বয়ম্বর প্রথা ও গান্ধর্ব্ব প্রথা প্রথমেই বাতিল হইল, আর হাজার বৎসর নারীকে এই মন্ত্র শুনাইবার ফলে ও নারীর প্রতি সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখাতে নারী জাতিটাই হইল, এক জীবন্ত লটবহর বা Living Luggage ! অথচ মহাভারতে লিখিত আছে,—সূর্য্য কুন্তীকে কহিতেছেন; তোমার পিতামাতা বা অন্যান্য গুরুজন তোমার প্রভু নহেন, * * * কন্যা স্বাধীনা, কদাচ পরাধীনা নহে॥ বনপর্ব্ব, ৩০৬ অধ্যায়॥

রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ, কন্যা শব্দের ধাতুগত অর্থ বা সূর্য্যের উক্তি কখন সমাজকে শুনান নাই। তাঁহারা শুনাইয়াছেন,—পিতা রক্ষতি কৌমারে ইত্যাদি। ইহাই হইল রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণের সনাতন ধর্ম্মের সনাতনী ব্যাখ্যা !

নারী কখনও স্বাধীনা নহে, ইহা যদি সনাতন ধর্ম্ম হইত, তবে বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত মনু সংহিতা-মধ্যে দ্বাদশবিধ পুত্রের পরিচয়

থাকিয়া প্রমাণ করিত না,—কন্যা চিরদিনই কন্যা এবং সেই কন্যাগণ মধ্যে নিজ নিজ প্রকৃতি বশে যে যে ভাবে পুরুষ আশ্রয়ে সন্তান লাভ করিত, সমাজ আনন্দের সহিত সেই সকল পুত্রকে সমাজে স্থান দিত। মনু সংহিতার 'পুত্রের পরিচয়' নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

মনু সংহিতায় দ্বাদশ বিধ পুত্রের পরিচয়

১। সবর্ণা পত্নীতে পতি স্বয়ং যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহার নাম **ঔরস পুত্র**, এই পুত্র সকল পুত্র মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৯।১৬৬ ॥

২। অপুত্র মৃত ব্যক্তির অথবা ক্লীব কিম্বা শক্তিবিহীনের পত্নী গুরুজন দ্বারা নিযুক্ত হইয়া যে পুত্র লাভ করে, তাহার নাম **ক্ষেত্রজ পুত্র** ॥ ৯।১৬৭ ॥ ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুর, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা ইহাঁরা সকলেই ক্ষেত্রজ পুত্র ছিলেন।

৩। নিঃসন্তান দম্পতি অপরের নিকট হইতে যে পুত্র প্রাপ্ত হয়, তাহাকে দত্তক পুত্র কহে ॥ ৯।১৬৮ ॥

৪। শ্রাদ্ধাদি করিলে কি গুণ, না করিলে কি দোষ হয়, যে পুত্র জানে এবং মাতা পিতার শুশ্রূষাতে রত, এতাদৃশ পুত্রকে গ্রহণ করিলে তাঁহাকে কৃত্রিম পুত্র কহে ॥ ৯।১৬৯ ॥

৫। আপনার ভার্য্যাতে স্বজাতীয় অজ্ঞাত পুরুষ কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্রকে গূঢ়োৎপন্ন পুত্র কহে ॥ ৯।১৭০ ॥ কংস গূঢ়োৎপন্ন পুত্র। যুধিষ্ঠির মহারথী কর্ণকে কুন্তীর গূঢ়োৎপন্ন পুত্র বলিয়াছিলেন ॥ মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, প্রথম অধ্যায়, ২১ শ্লোক ॥

৬। মাতা পিতার ত্যাজ্য পুত্রকে অপর কেহ গ্রহণ করিলে ঐ পুত্র গ্রহীতার অপবিদ্ধ পুত্র হয় ॥ ৯।১৭১ ॥

৭। কুমারী অবস্থায় যে কন্যা সন্তান লাভ করে, বিবাহ হইলে সেই পুত্র পতির কানীন পুত্র হয় ॥ ৯।১৭২ ॥ কুমারী কন্যার পুত্র

পৃথুশ্রবার কথা ঋগ্বেদে এবং মহাভারতে কুমারী পুত্র ব্যাসদেব ও মহারথী কর্ণের কথা উক্ত আছে॥ যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার মতে, কানীনঃ কন্যকাজাতো মাতামহসুতো মতঃ (২।১৩২)। অর্থাৎ কানীন পুত্র মাতামহের পুত্র ধার্য্য হয়॥ *

৮। জ্ঞাত গর্ভা বা অজ্ঞাত গর্ভা কন্যাকে যে বিবাহ করে, ঐ গর্ভজাত সন্তান পরিনেতার সহোঢ় পুত্র হয়॥ ৯।১৭৩॥

৯। মূল্য দ্বারা যে পুত্র ক্রয় করা হয়, উহা ক্রেতার ক্রীত পুত্র নামে কথিত হয়॥ ৯।১০৪॥

১০। পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা স্ব ইচ্ছায় পুরুষ সহায়ে যে পুত্র লাভ করে, সেই পুত্র উৎপাদকের পৌনর্ভব পুত্র হয়॥ ৯।১৭৫॥ বলা বাহুল্য,—ক্ষেত্রজ পুত্র গুরুজনের আদেশ সাপেক্ষ। পৌনর্ভব পুত্র পতি পরিত্যক্তা কিম্বা বিধবার ইচ্ছা সাপেক্ষ। প্রভেদ— প্রথমা স্ত্রী অধীনা, দ্বিতীয়া স্ত্রী স্বাধীনা।

১১। যে পুত্র স্বয়ং আপনাকে দান করে, সে গ্রহীতার স্বয়ংদত্ত পুত্র নামে অভিহিত হয়॥ ৯।১৭৬॥

১২। ব্রাহ্মণের পরিণিতা শূদ্রা-গর্ভজাত পুত্র পারশব নামে অভিহিত হয়॥ ৯।১৭৭॥ এই বিধানটি চুক্তি নামার অসবর্ণ কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার পরে রচিত হইয়াছিল। এতদপক্ষে অন্য হেতুবাদ পরে দর্শান হইবে।

---

* যতদিন কন্যা প্রাধান্য ছিল, ততদিন কানীন পুত্র মনু সংহিতার বিধানে কন্যার স্বামীর পুত্র হইত। পুরুষ প্রাধান্যে কানীন পুত্র মাতামহের পুত্র হইল। কুমারীর পুত্র হওয়া কখনই দোষাবহ বিবেচিত হয় নাই। বিচার্য্য বিষয় হইয়াছিল,—কুমারীর সন্তানকে কে পালন করিবে---কন্যার পতি কিম্বা কন্যার পিতা ?

দ্বাদশ বিধ পুত্রের সামাজিক অধিকার নির্ণয়ে নিরপেক্ষ অভিমত

মনু সংহিতায় ভৃগু কহিতেছেন,—স্বায়ম্ভুব মনু যে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের কথা বলিয়াছেন তন্মধ্যে,—

(ক) ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, ও অপাপবিদ্ধ— এই ছয় প্রকার পুত্র বান্ধব ও বটে এবং দায়াদও—বটে। অর্থাৎ ইহারা বান্ধবত্ব প্রযুক্ত পিতার ন্যায় পিণ্ড, তর্পণ করিবে, সগোত্রের ধনও পাইবে।

(খ) আর কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত, পারশব— এই ছয় প্রকার পুত্র বান্ধব হইবে। অর্থাৎ—পিণ্ড, তর্পণের অধিকারী হইবে। কিন্তু পৈত্রিক বিষয় পাইবে না ।। ৯।১৫৮।। অথচ মনু সংহিতার ৯.১৯১ মন্ত্রে লিখিত অছে,—পৌনর্ভব পুত্র তাহার পিতার ধন পাইবে।

যে মনু সংহিতার মধ্যে দ্বাদশ বিধ পুত্রের পরিচয় রহিয়াছে এবং পৌনর্ভব পুত্রের পরিচয়ে যে মনু সংহিতায় (৯.১৭৫) লিখিত আছে,—

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া। উৎপাদয়েৎ পূনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে, সেই মনু সংহিতার মধ্যেই আবার নিম্ন লিখিত মন্ত্রগুলিও দেখিতে পাওয়া যাইবে :—

সদাচার হীন, পরস্ত্রীগামী, মূর্খ পতি দেবতার জন্য স্ত্রীর মান, ইজ্জৎ ও প্রকৃতি ত্যাগের আদেশ

১। পতি সদাচার বিহীন, পরস্ত্রীতে অনুরাগী, বিদ্যাদি গুণ হীন হইলেও সাধ্বী-স্ত্রী পতিকে সর্ব্বদা দেবতার ন্যায় সেবা করিবে ।। ৫।১৫৪ ।।

২। পতি মৃত হইলে অল্পাহার দ্বারা দেহ ক্ষীণ করিবে। ব্যভিচার বুদ্ধিতে কদাচ পরপুরুষের নাম গ্রহণ করিবে না ॥ ৫।১৫৭ ॥

৩। সাধ্বী স্ত্রী বিধবা হইবার পরে মধু, মাংস, রতি পরিত্যাগ করতঃ দেহত্যাগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে ॥ ৫।১৫৮ ॥

৪। সন্তান না থাকিলে স্বর্গাদি প্রাপ্তি হয় না, এমত নহে। বালখিল্যাদি ঋষিগণ অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা স্বর্গলাভ করিয়াছেন ॥ ৫।১৫৯ ॥

৫। সদাচারশালিনী স্ত্রী বিধবা হইবার পরে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে। পরপুরুষ সংযোগে পুত্রোৎপাদন করাইবে না ॥ ৫।১৬০ ॥

৬। ব্যাভিচার দ্বারা স্ত্রীলোক পুত্রোৎপাদন করাইবে না, তাহা হইলে ইহলোকে নিন্দা ও পরলোকে সেই পুত্রের দ্বারা স্বর্গলাভ হয় না ॥ ৫।১৬১ ॥

উপরোক্ত মন্ত্রগুলি যিনি বুদ্ধি খরচ করিয়া রচনা করিয়াছিলেন, তিনি বোধ হয় জানিতেন না যে,—এই মনু সংহিতায়ই আছে,—নারী সৌন্দর্য্য দেখে না, যুবা বা বৃদ্ধ, সুরূপ বা কুরূপ কিছুই বিচার করে না, পুরুষ পাইলেই উহার সহিত সম্ভোগ করে (৯।১৪)। পুরুষ দর্শন-মাত্রেই স্ত্রীদিগের তাহার সহিত ক্রীড়ার ইচ্ছা জন্মে, নারীজাতি স্নেহশূন্যতা প্রযুক্ত স্বামী কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইলেও ব্যভিচার করে (৯।১৫)। তবুও সম্ভোগাসক্তা নারীকে সাধ্বী-স্ত্রীতে পরিণত করিবার কি উৎকট উদ্যম! উদ্যম যতই উৎকট হউক না কেন, যুক্তিগুলি কিন্তু নিতান্তই অসার। কেননা স্বর্গের লোভ ও বালখিল্য ঋষিদের উদাহরণ এই দুইই যে বিচারসহ নহে, তাহাই এখন বলিতে হইবে :—

যে ভগবান স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল ও তৎস্থিত দেব ও প্রস্তর, মানব ও কীট—চেতন ও অচেতন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মনুতেই যখন আছে,—'সেই বিধাতা কর্ত্তৃক স্ত্রীদিগের এইরূপ [পুরুষ আসক্তি] স্বভাব যখন সৃষ্ট (৯।১৫) হইয়াছে', তখন নারী যদি তাহার বিধাতা দত্ত স্বভাবের

বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহাতে ভগবান কেন যে বিদ্রোহিনী নারীকে সাজা না দিয়া পুরস্কৃত করিয়া স্বর্গে থাকিতে দিবেন, তৎপক্ষে কোন সদ্যুক্তিই দেখা যায় না। বরং মুসলমান রাজত্বে বিদ্রোহীকে কুকুর দিয়া খাওয়ান, ইংরাজ রাজত্বে বিদ্রোহীকে ফাঁসীকাষ্টে ঝুলান দেখিয়া মনে হয়, ভগবানও বিদ্রোহীকে দয়া করেন না। সুতরাং বিধাতার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য করিয়া স্বর্গের আশা দূরাশা মাত্র। শেষ কথা বালখিল্য ঋষিদের উদাহরণ। শাস্ত্রে আছে,—বালখিল্যগণ ব্রহ্মার যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মাই যখন মিথ্যা দেবতা, তখন তাহার দ্বারা যে যজ্ঞ তাহাও যেমন মিথ্যা, স্ত্রী ভিন্ন মানুষের জন্ম হওয়াও তেমনই মিথ্যা। এই মিথ্যার বেসাতি লইয়া যাহারা নারী জাতিকে মিথ্যা প্রবোধ দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা যে কত বড় মিথ্যাবাদী, আশা করি পাঠকগণ তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন।

অসবর্ণ বিবাহ বাতিল হওয়ার বিষময় পরিণাম

ঋগ্বেদে আর্য্যের পক্ষে অনার্য্য কন্যা-সহবাসের কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে, প্রথমে আর্য্য অনার্য্যের মিলন সম্ভব ছিলনা। মহাভারতে কিন্তু আর্য্য অনার্য্যের মিলন বেশ উল্লেখযোগ্য ভাবেই ব্যক্ত আছে। এবং ইহাও প্রকাশ আছে যে, গুণগত বর্ণ বিভাগের পরেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—ইহারা সকলেই শূদ্র কন্যা বিবাহ করিতেন।

'অসবর্ণা কন্যা বিবাহ করিবে না'—এই বিধান প্রাচীন নহে। অন্যথায় মহাভারতে অসবর্ণ মিলন এত ঘটা করিয়া লিখিত হইত না।

আর্য্যগণ পরবর্ত্তীকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য নামে যে বিভক্ত হইয়াছিল, সে কথা আচার্য্য সায়ন বিষ্ণুপুরাণ (২।৪।১৯) ও ব্রহ্মপুরাণ (২০।১৭।১৯) দেখিয়াই আর্য্য শব্দের এক অর্থ যে ত্রৈবর্ণিক লিখিয়াছেন,

ইহা বলাই বাহুল্য। উক্ত উভয় পুরাণে কিন্তু এই একই কথা লিখিত আছে :—"ইজ্যন্তে তত্র ভগবাংস্তৈর্বর্ণৈরার্য্যকাদিভি."।

কোন দেশই প্রাচীন প্রথা একদিনে পরিত্যাগ করিতে পারেনা। অনেকে আবার নূতন প্রথা সহজে গ্রহণ করিতেও চাহে না। এইজন্য আইন অমান্যকারীদের শাসনে ও বশে রাখিবার প্রথাও সকল দেশেই প্রচলিত আছে। ভারতের ভাগ্যে অসবর্ণ কন্যা বিবাহকারীর জন্য যে শাসনের ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেই কথা বলিবার পূর্ব্বে মনু সংহিতার বর্ণ ও যৌন প্রসঙ্গে মূল নীতি প্রথমে বলিতে হইবে। মনু সংহিতায় আছে,—"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি। চতুর্থ শূদ্র-জাতি, পঞ্চম বলিয়া (কোন বর্ণ বা জাতি) নাই ॥ ১০।৪ ॥

কেন ছিলনা, তাহার দুইটি হেতুও দেখিতে পাওয়া যায় :—(ক) বীর্য্য প্রাধান্য বা সন্তানের পিতার বর্ণ প্রাপ্তি। যেমন শক্তি, পরাশর, ব্যাস, শুক প্রভৃতি। (খ) ক্ষেত্র প্রাধান্য বা সন্তানের মাতার বর্ণ প্রাপ্তি। যেমন,—কংস, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা। সুতরাং একদা যৌন মিলন পথে আর্য্য অনার্য্যের সামাজিক জীবন যেরূপ স্বচ্ছ গতিতে চলিয়া 'মহাভারত' গঠন করিয়াছিল ও যাহার ফলে লক্ষ লক্ষ বীরের উদ্ভব হইয়াছিল,—'অসবর্ণ কন্যা বিবাহ করিও না' বলিয়া সমাজে যে গণ্ডি দেওয়া হইল, তাহার পর হইতে এদেশের সমাজ আর স্বচ্ছ গতিতে চলিল না, তেমন বীর পুরুষও জন্মিল না। এই গেল একদিকের কথা। এইবার অন্যদিকের কথাও বলিতে হইবে।

চুক্তি ভঙ্গ কারীর জন্য কঠোরতম ব্যবস্থা

যে মনু সংহিতায় বীর্য্যপ্রাধান্য (৯।৩৬) ও ক্ষেত্র প্রাধান্য (৯।৩৪) রহিয়াছে, ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তিনামা ভঙ্গকারীদের জন্য সেই মনু সংহিতায় নূতন করিয়া লিখিত হইল,—

যাহারা আনুলোম্যে দ্বিজাতি হইতে উৎপন্ন, তাহারা শাস্ত্র মতে অপসদ্ এবং যাহারা প্রাতিলোম্যে উৎপন্ন তাহারা অপধ্বংসজ ॥ ১০।৪৬ ॥

এই জন্য মনুসংহিতায় লিখিত হইল,—"পরিণীতা অক্ষতা ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাতে বৈশ্য, এবং শূদ্রাতে শূদ্র জাত সন্তান—যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রবর্ণ হইবে। অনুলোম প্রথায় উৎপন্ন সন্তান পিতা বা মাতার বর্ণ লাভ করিবে না, জাত্যন্তর হইবে ॥ ১০।৫ ॥

অবিচার এর আগাগোড়া

পিতা	মাতা	জাতি	বীর্য্যপ্রাধান্যে	ক্ষেত্রপ্রাধান্যে
ব্রাহ্মণ	ক্ষত্রিয়া	মূর্দ্ধাবসিক্ত	ব্রাহ্মণবর্ণ	ক্ষত্রিয় বর্ণ
ক্ষত্রিয়	বৈশ্যা	মাহিষ্য	ক্ষত্রিয় বর্ণ	বৈশ্য বর্ণ
বৈশ্য	শূদ্রা	করণ	বৈশ্য বর্ণ	শূদ্র বর্ণ
ব্রাহ্মণ	বৈশ্যা	অম্বষ্ঠ	ব্রাহ্মণ বর্ণ	বৈশ্য বর্ণ
ব্রাহ্মণ	শূদ্রা	পারশব	ব্রাহ্মণ বর্ণ	শূদ্র বর্ণ
ক্ষত্রিয়	শূদ্রা	উগ্র বা নিষাদ	ক্ষত্রিয় বর্ণ	শূদ্র বর্ণ

ব্রাহ্মণের পরিণীতা ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রাস্ত্রী-জাত, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ও শূদ্রা-জাত এবং বৈশ্যের শূদ্রাতে উৎপন্ন এই ছয় সন্তান সবর্ণ পুত্র হইতে অপকৃষ্ট হয় ॥ মনুসংহিতা, ১০।৬—১০ ॥ পূর্ব্বে ত হইত না। প্রমাণ,—বীর্য্য প্রাধান্য।

মাতা	পিতা	জাতি	ক্ষেত্র প্রাধান্যে	বীর্য্য প্রাধান্যে
ব্রাহ্মণী	ক্ষত্রিয়	সূত	ব্রাহ্মণ বর্ণ	ক্ষত্রিয় বর্ণ
ক্ষত্রিয়া	বৈশ্য	মাগধ	ক্ষত্রিয় বর্ণ	বৈশ্য বর্ণ
ব্রাহ্মণী	বৈশ্য	বৈদেহ	ব্রাহ্মণ বর্ণ	বৈশ্য বর্ণ
বৈশ্যা	শূদ্র	আয়োগব	বৈশ্য বর্ণ	শূদ্র বর্ণ

ক্ষত্রিয়া	শূদ্র	ক্ষত্তা	ক্ষত্রিয় বর্ণ	শূদ্র বর্ণ
ব্রাহ্মণী	শূদ্র	চণ্ডাল	ব্রাহ্মণ বর্ণ	শূদ্র বর্ণ

শূদ্র হইতে বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণীতে যে সন্তান, ইহারা প্রতিলোম সঙ্কর জাতি হয়॥ ১০।১১-১২॥ ক্ষেত্র প্রাধান্যে কিন্তু এইরূপ হইত না।

সূত, মাগধ, বৈদেহ, আয়োগব ইহারা স্পর্শাদি [জলচল] যোগ্য। কেবল চণ্ডাল স্পর্শাদি যোগ্য নহে।। ১০।১৩।। ইহাও নূতন কথা!

বর্ণ সঙ্কর ও বর্ণের মিশ্রণে নূতন জাতির সৃষ্টি

মাতা	পিতা	জাতি	ক্ষেত্র প্রাধান্যে	বীর্য্য প্রাধান্যে
উগ্রা	ব্রাহ্মণ	আবৃত	ক্ষত্রিয় বা শূদ্র	ব্রাহ্মণ বর্ণ
অম্বষ্ঠা	ব্রাহ্মণ	আভীর	ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য	ব্রাহ্মণ বর্ণ
অয়োগবী	ব্রাহ্মণ	ধিগ্বণ	বৈশ্য বা শূদ্র	ব্রাহ্মণ বর্ণ

প্রতিলোম প্রথায় সঙ্কর জাতি কেহই পিতৃকার্য্যে সক্ষম নহে॥ ১০।১৫—১৭॥ মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ মাতৃবর্ণের সংস্কারের যোগ্য হইবে॥ ১০।১৪॥

তথা কথিত

বর্ণহীন ও সঙ্কর জাতির সহিত সঙ্কর জাতির মিলনে উৎকট সঙ্কর জাতির উদ্ভব

মাতা	পিতা	জাতি	ক্ষেত্রপ্রাধান্য	বীর্য্যপ্রাধান্য
শূদ্রা	নিষাদ	পুক্কস	ব্রাহ্মণ	শূদ্র
নিষাদী	শূদ্র	কুক্কুটক	ব্রাহ্মণ বা শূদ্র	শূদ্র
উগ্রা	ক্ষত্তা	শ্বপাক	ক্ষত্রিয়	শূদ্র
অম্বষ্ঠা	বৈদেহ	বেণ	ব্রাহ্মণ	বৈশ্য

মনু সংহিতা, ১০।১৮-১৯।

ব্রাত্য পিতার সন্তানের পরিচয়

ব্রাত্য পিতা	মাতা	সন্তানের পরিচয়
ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়া	ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি (লিচ্ছবি) নট, করণ, খস্, দ্রবিড় [দেশভেদে নামভেদ মাত্র] ॥ ১০।২২ ॥
বৈশ্য	বৈশ্যা	সুধম্বাচার্য্য, কারুষ, বিজন্ম, মৈত্র, সাত্বত নামক পুত্রগণ ॥ ১০।২২

শূদ্র প্রতিলোমজ সন্তান নিকৃষ্ট। ইহা অপেক্ষা দ্বিজাতি প্রতিলোমজ সন্তান উৎকৃষ্ট ॥ ১০।২৮ ॥

মন্তব্য :—যাহারা বেদ বিরোধী স্মার্ত্তকর্ম্ম গ্রহণ বা বরণ করে নাই, তাহাদিগকে শাসন করিবার জন্য উপরোক্ত ব্যবস্থা আশ্রয় করিতে হইয়াছিল, তাহা ব্রাত্য কথাতেই প্রকাশ আছে।

আর্য্য অনার্য্যের

বর্ণশঙ্কর	পিতা	মাতা	অপ্রাকৃত পরিচয়	প্রকৃত পরিচয়
	দস্যু	আয়োগবী	সৈরিন্ধ্র ॥ ১০।৩২ ॥	ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র
	বৈদেহ	আয়োগবী	মৈত্রের ॥ ১০।৩৩ ।	,,
	নিষাদ	আয়োগবী	মার্গব বা কৈবর্ত্ত ॥১০।৩৪॥	,,
	নিষাদ	বৈদেহী	কাওরা [চর্ম্মকার] ॥	,,
	বৈদেহ	কাওরা স্ত্রী	অন্ধ্র ॥	,,
	বৈদেহ	নিষাদ স্ত্রী	মেদ ॥ ১০।৩৬ ॥	,,

কাওরা, অন্ধ্র, মেদ উহারা গ্রামের বাহিরে বাস করিবে ॥ ১০।৩৬ ॥

বর্ণ সঙ্কর	চণ্ডাল	বৈদেহী	পাণ্ডুসোপাক।	,,
	নিষাদ	বৈদেহী	হাড়ি [অহিণ্ডিক] ॥ ১০।৩৭ ॥	

কাওরা ও হাড়ির পিতামাতা এক হইলেও ইহাদিগের বৃত্তিভেদে নাম ভেদ ॥ ১০।৩৭ ॥

চণ্ডাল + নিষাদী { অন্ত্যাবসায়ী বা মুর্দ্দারফরাশ ॥ ১০।৩৯ ॥

যে মনু সংহিতায় লেখা আছে,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিনটি বর্ণ, চতুর্থ, শূদ্র এক জাতি, পঞ্চম [বলিয়া কোন বর্ণ বা জাতি] নাই, সেই মনু সংহিতায় আবার ইহাও লিখিত আছে যে,—শূদ্র-জাত আয়োগব, ক্ষত্তা ও চণ্ডাল ইহারা বাহ্য জাতি। এই তিন বাহ্য জাতির স্ববর্ণা কন্যা ও চারি বর্ণের (?) কন্যায় অর্থাৎ আয়োগব + আয়োগবী আয়োগব + ব্রাহ্মণী, আয়োগব + ক্ষত্রিয়া, আয়োগব + বৈশ্যা ও আয়োগব + শূদ্রা—এই পঞ্চবিধ মিলনে যে সন্তান উদ্ভূত হয়, তাহারা হীন হইতে উৎপন্ন বিধায় হীনতর হইয়াছে। আয়োগবের পাঁচ রকম সন্তানের ন্যায় ক্ষত্তা-জাত পাঁচ ও চণ্ডাল-জাত পাঁচ—মোট পনেরটি হীনতর বর্ণ (?) উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১০।৩১ ॥ গরজ এমনই বালাই !

চারি বর্ণের পরিণাম চৌত্রিশ বর্ত্তমান সমাজে সত্তর

মনু সংহিতার মধ্যে যে সকল বর্ণ ও বর্ণহীন অথবা জাত ও অজাতের নাম রহিয়াছে, ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত ইহাদের সংখ্যা মোট চৌত্রিশটি। কিন্তু ইং ১৯২১ সনের আদম স্নুমারীতে দেখা যায় সত্তরটি। এই জল-চল ও জল-অচল বর্ণ, বর্ণহীন ও অন্ত্যজগণ মধ্যে ধর্ম্মের নামে উচ্চ নীচ ভাগ রহিয়াছে, যাহার জন্য একের অন্ন অপরে গ্রহণ করিতে পারে না, জল পান করিলে জাতিচ্যুত হয়। এই একতা বিহীন, সহানুভূতি শূন্য বিবাদমান হিন্দুগণ পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও আক্রোশ বশতঃ

হিন্দু সমাজকে যেমন অধঃপাতের দিকে লইয়া চলিয়াছে; তেমন হিন্দুকে আঘাত করিবারও পর্য্যাপ্ত সুবিধা এবং উপযুক্ত সুযোগও মুসলমানগণকে জোগাইতেছে। শুনিয়াছি, হিন্দুধর্ম্ম বড়ই উদার! কিন্তু হিন্দু-গণের মধ্যে কোন উদারতাই ত দৃষ্ট হয় না। যা হইয়াছে,—বিধর্ম্মীর জন্য। তাহাও অনুকম্পা বশতঃ নহে। কঠিন আঘাতের ভয়ে। দুর্ব্বলের লক্ষণ হইল,—প্রবলের পদ লেহন। তাহাই হইল তার উদারতা।

উপরোক্ত ব্যবস্থার দাপটে ক্ষত্রিয়ের সংখ্যা যাহা ক্ষেত্র ও বীর্য্য প্রাধান্যে অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতে এবং বৈদশিক আক্রমণ হইতে দেশকে হেলায় রক্ষা করিতেও পারিত, তাহা একবারেই অসম্ভব হইয়া গেল। ইহা ছাড়াও শাস্ত্রে দেখা যায়,—মেকল, দ্রাবিড়, লাট, পৌণ্ড্র, কোন্নশীর, শৌণ্ডিক, দরদ, দর্ব্ব, চৌল, শবর, বর্ব্বর, কিরাত ও যবন প্রভৃতি দেশবাসী ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের কোপে [বংশগত ভাবে] শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ অনুশাসন পর্ব্ব, ৩৫ অধ্যায় ॥

মনু সংহিতায়ও আছে,—পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রাবিড়, কম্বোজ, যবন, শক, পারদ, অপহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খস এই সকল দেশের ক্ষত্রিয়গণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১০।৪৪ ॥

উপরোক্ত শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা দেখিয়া মনে হইবে, একদিন বৌদ্ধ ধর্ম্মের গতি রোধ করিতে যাইয়া ব্রাহ্মণগণ যে সকল অনার্য্যগণকে ক্ষত্রিয় পদবী দান করিয়াছিল, ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তিনামা স্বাক্ষরের পর ব্রাহ্মণ আর্য্য ও বৌদ্ধ আর্য্য মিলিত হইবার পরেই অনার্য্যের সেই ক্ষত্রিয়ত্ব কাড়িয়া লইয়া তাহাকে শূদ্রত্বে অবনমিত করা হইল। এতগুলি ক্ষত্রিয়কে শূদ্র করিয়া রাখায় ক্ষত্রিয়ের সংখ্যাও অসম্ভবরূপে ক্ষীণ হইয়াছিল এবং একমাত্র ক্ষত্রিয়ের উপর দেশ রক্ষার ভার ছিল বলিয়াই কোন বৈদশিক আক্রামণই ভারত প্রতিহত করিতে পারে নাই।

যাহাতে কোনদিন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য মিলিত হইতে না পারে মনু সংহিতায় তাহার ব্যবস্থা

নামের শেষে উপপদ বা ব্রাহ্মণের শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্ম, বৈশ্যের ভূতি ও শূদ্রের দাস শব্দের ব্যবহার। বর্ত্তমানে সেই এক শর্ম্মা বন্দ্যো, চট্টো, মুখো, ও গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত সান্ন্যাল, বাগচী প্রভৃতি অনেক উপপদই হইয়াছে (২।৩২)। মহাভারতে কিন্তু কাহারও নামের শেষে কোন উপপদ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে,—উপপদ প্রাচীন প্রথা নহে।

উপনয়ন পথে পার্থক্য

উপনয়ন কাল নির্দ্ধারণ পক্ষে ব্রাহ্মণের আট, ক্ষত্রিয়ের দশ বৎসর তিনমাস ও বৈশ্যের এগার বৎসর সময় ধার্য্য হইল (২।৩৬), আর ব্রাহ্মণের মেখলার জন্য মুঞ্জ, ক্ষত্রিয়ের কুশ ও বৈশ্যের শণ স্থির রহিল।। ২।৪১ ।।

শাসন-তারতম্য-পথে

অনূঢ়া শূদ্র-কন্যাতে পুত্রোৎপাদন করিবার অধিকার ব্রাহ্মণের ছিল। কিন্তু শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণ কন্যা গমনে কি ব্যবস্থা ছিল, তাহাও পাঠক জানিয়া রাখুন। অনুলোম বিবাহ দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বর্ণত্রয়ের ভূতপূর্ব্ব শ্বশুর যদি কখন ব্রাহ্মণ কন্যা গমন করিত—রাজার বিধানে তাহার লিঙ্গচ্ছেদ হইত। শুধু কি ইঁহাই ? মনু সংহিতার ৮ম অধ্যায়, ২৭৯-২৮৩ শ্লোক দেখুন। অনেক কিছু ছেদনেরই ব্যবস্থা রহিয়াছে দেখিতে পাইবেন। যথা :—

১। শূদ্র কর, চরণাদি দ্বারা শ্রেষ্ঠ জাতিকে প্রহার করিলে রাজা সই শূদ্রের সেই অঙ্গ ছেদন করিবেন—ইহা—"মনুর আজ্ঞা"।

মনুসংহিতায় "মনুর আজ্ঞা" বলিবার হেতু—ইহা মনুর নিজের লেখা নহে বুঝিতে হইবে।

২। শূদ্র যদি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে মারিবার জন্য হাত তোলে—সে হাত কাটা যাইবে—পা তুলিলে পা কাটা যাইবে।

৩। শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসে—রাজা সেই শূদ্রের কটিদেশে তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবেন।

৪। শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের গায়ে থুতু দেয় তাহার ওষ্ঠাধর কাটা যাইবে। ব্রাহ্মণের গাত্রে প্রস্রাব করিলে লিঙ্গ কাটা যাইবে।

৫। শূদ্র ব্রাহ্মণের কেশাকর্ষণ করিলে কিম্বা—হিংসা করিবার বুদ্ধিতে পাদদ্বয় গ্রহণ, চিবুক স্পর্শ বা অণ্ডকোষ ধরিলে সেই পাপে শূদ্রের হাত কাটা যাইবে।

৬। শূদ্র দ্বিজাতির প্রতি দারুণ অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহার জিহ্বা কাটা যাইবে। যেহেতু,—নিকৃষ্ট অঙ্গ—[ব্রহ্মার] পাদ হইতে শূদ্রের জন্ম ॥ ৮।২৭০ ॥

৭। শূদ্র হিংসা নিবন্ধন দ্বিজাতির নাম ধরিয়া ডাকিলে তাহার মুখের মধ্যে ১০ অঙ্গুলি পরিমাণ দগ্ধ লৌহ শলাকা প্রবেশ করাইবে ॥ ৮।২৭১ ॥

৮। দর্প করিয়া শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ করে, রাজা সেই শূদ্রের মুখে ও কর্ণে তপ্ত-তৈল নিক্ষেপ করিবেন ॥ ৮।২৭২ ॥

এই রকম ব্যবস্থা দেখিয়া মনে স্বতঃই উদয় হয় যে—এই ভীষণ অত্যাচার নিবারণের জন্যই ভগবান্ এদেশে মুসলমানকে আনিয়াছিলেন। এবং হিন্দু জাতির অবাধ জ্ঞানার্জ্জনের জন্য পরে ইংরাজকে আনিয়াছেন। যাহার ব্যবস্থায় আপামর হিন্দু বেদ, সংহিতা, পুরাণাদিতে কি আছে জানিতে ও পড়িতে পারিতেছে।

এই প্রকার স্বেচ্ছাচারপূর্ণ ব্যবহারেই শূদ্রের সহিত দ্বিজাতির সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গেল। হিন্দুজাতির অগ্রগমনের আশা চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইল। একথায় হয় ত কেহ কেহ হাসিবেন জানি, আমরা কিন্তু এ ব্যবস্থা দেখিয়া হাসিতে পারিলাম না।

শব-বহন-পথে

পাঠক! সংহিতাকার ভৃগু, শূদ্রকে দূরে রাখিবার জন্য যে মন্ত্রপাঠ করিতেছেন এবং সেই মন্ত্রের মধ্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে পৃথক করিবার যে ইঙ্গিত রাখিয়াছেন তাহা শ্রবণ করুন। সংহিতায় আছে :—শূদ্র মৃত হইলে তাহাকে বাড়ীর দক্ষিণ দ্বার দিয়া শ্মশানে লইয়া যাইবে। বৈশ্যের শব পশ্চিম দ্বার দিয়া, ক্ষত্রিয়ের শব উত্তর দ্বার দিয়া এবং ব্রাহ্মণের শব পূর্ব্ব দ্বার দিয়া লইয়া যাইবে॥ মনু, ৫ অধ্যায়—৯২ শ্লোক॥

আত্মীয় স্বজন থাকিতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মৃতদেহ শূদ্র দ্বারা বহন করাইবে না। যেহেতু শূদ্র-স্পর্শে মৃতের আত্মা অস্বর্গ-লোক প্রাপ্ত হয়। তবে যদি স্বজাতীয় না মিলে, তখন ব্রাহ্মণের শব ক্ষত্রিয়ের দ্বারা তদভাবে বৈশ্যের দ্বারা, তদভাবে শূদ্রের দ্বারা বহন করাইবে॥ ৫।১০৫॥

অর্থাৎ যদি স্বজাতি দ্বারা মৃতদেহ বহন করাইবার সুবিধা না থাকে, তখন শূদ্র বহন করিলে মৃত আত্মা অস্বর্গ-লোক প্রাপ্ত হইবে না! চমৎকার যুক্তি বটে!

অশৌচ-কাল-প্রভেদে

সপিণ্ড-মরণে ব্রাহ্মণ দশদিবস, ক্ষত্রিয় দ্বাদশদিবস, বৈশ্য পঞ্চদশ দিবস ও শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হয়॥ ৫।৮৩॥

কিন্তু এই মনু সংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে অশৌচ প্রসঙ্গে একটি অস্পষ্ট মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্র ও কুল্লুক ভট্টের অতি স্পষ্ট টীকা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

দশাহং শাবমাশৌচং সপিণ্ডেষু বিধীয়তে।

অর্ব্বাক্ সঞ্চয়নাদস্থ্নাং ত্র্যহমেকাহমেব চ ॥ ৫।৫৯ ॥

অর্থাৎ,—ব্রাহ্মণের সপিণ্ড মরণে দশ দিন, চারি দিন, তিন দিন ও এক দিন অশৌচ হইবে। কেন এমন রকমারী ব্যবস্থা হইল, সে কথা মনুসংহিতায় নাই। কিন্তু কুল্লুক ভট্টের টীকায় উল্লেখ দেখা যায়। যথা, "দশাহমিতি। * * * সপিণ্ডেষু শবনিমিত্তমশৌচং দশাহোরাত্রং * * *। অর্ব্বাক্ সঞ্চায়নাদস্থ্নাং চতুরহোপলক্ষণম্। 'চতুর্থে দিবসে অস্থি সঞ্চয়নং কুর্য্যাৎ' ইতি বিষ্ণু বচনাৎ। ত্র্যহমেকাহোরাত্রং বা। * * * যথহাদক্ষ :—

"একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো যোহগ্নিবেদসমন্বিতঃ।

হীনে হীনে ভবেচ্চৈব ত্র্যহশ্চতুরহস্তথা ॥" ৬।৬ ॥

"শ্রৌতাগ্নিমতো মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মককৃৎস্নশাখাধ্যায়িন একাহা শৌচং। তত্র শ্রৌতাগ্নিবেদাধ্যয়নগুণয়োরেকগুণরহিতো হীনঃ তস্য ত্র্যহঃ, উভয়গুণ-রহিতস্তু হীনতরঃ কেবল স্মার্ত্তাগ্নিমাংস্তস্য চতুরহঃ, সকলগুণরহিতস্য দশাহঃ। তদাহ পরাশরঃ—'নির্গুণো দশভির্দ্দিনৈঃ' ইতি।"

অর্থাৎ—"যে ব্রাহ্মণ শ্রৌতাগ্নির পূজন ও বেদ অধ্যয়ন করে, তাহার এক দিন অশৌচ। যে ব্রাহ্মণ শ্রৌতাগ্নি ত্যাগ করিয়া বেদাধ্যয়ন করে, সে হীন—অতএব তাহার তিন দিন অশৌচ। অগ্নি ও বেদ রহিত ব্রাহ্মণ কেবল স্মার্ত্তাগ্নির পূজা করে, সে হীনতর। সুতরাং তাহার চারি দিন অশৌচ। আর যে ব্রাহ্মণ শ্রৌতাগ্নি, বেদাধ্যায়ন ও স্মার্ত্তাগ্নি রহিত [ত্যাগী] তাহার দশ দিন অশৌচ। পরাশর সংহিতায় আছে,—

একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নি বেদ সমন্বিতঃ।

ত্র্যহাৎ কেবল বেদস্তু দ্বিহীনো দশভির্দ্দিনৈঃ ॥ ৩।৫ ॥

অর্থাৎ,—যে ব্রাহ্মণ অগ্নি ও বেদ সমন্বিত, তাহার এক দিন অশৌচ। যে ব্রাহ্মণ [অগ্নি ছাড়িয়া] মাত্র বেদ সমন্বিত তাহার তিন দিন অশৌচ, অগ্নি ও বেদ এই দুই হীন ব্রাহ্মণের দশ দিন অশৌচ।"

শুধু দক্ষ ও পরাশর সংহিতা নহে, একথা অত্রিসংহিতাও লিখিত আছে যে,—

একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নি বেদ সমন্বিতঃ।

ত্র্যহাৎ কেবল বেদস্তু নির্গুণো দশভির্দ্দিনৈঃ ॥ ৮৩ শ্লোক ॥

অর্থাৎ,—যে ব্রাহ্মণ অগ্নি ও বেদ সমন্বিত, তাহার এক দিন অশৌচ। যে ব্রাহ্মণ [অগ্নি ছাড়িয়া] মাত্র বেদ সমন্বিত, তাহার তিন দিন অশৌচ, অগ্নি ও বেদ সম্বন্ধে নির্গুণ [বেদ ও অগ্নি ত্যাগী] তাহার দশ দিন অশৌচ ॥

যে ব্রাহ্মণের দশ দিন অশৌচ সে শূদ্র, তাহার শাস্ত্রীয় কোন ব্যবস্থা দেওয়া অথবা গুরু পুরোহিত হইবার অধিকার নাই।

এই গ্রন্থে অগ্নি ও বেদ ত্যাগ করিলে ব্রাহ্মণ যে শূদ্র হয়, প্রমাণ সহ তাহা অনেক বার বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের দশ দিন অশৌচ অর্থ—ব্রাহ্মণ শ্রৌতাগ্নি, বেদ ও স্মার্ত্তাগ্নি ত্যাগী। অর্থাৎ—একেবারে শূদ্র। অথচ এই ব্রাহ্মণগণ মধ্যে অনেকেই পুরুষানুক্রমে গুরু ও পুরোহিতের কাজ করিয়া আসিতেছেন। অব্রাহ্মণগণ জানিতেন না, এই সকল ব্রাহ্মণ গুরু ও পুরোহিত হইবার পক্ষে উপযুক্ত কি না। কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাজে ত কোন দিনই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব হয় নাই! অথচ তাঁহারাও সমাজকে কখন বলেন নাই যে, এমন গুরু ও পুরোহিত

দিয়া কাজ করাইলে তাহাতে কোন ফল হয় না। যেহেতু বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থে এই সকল মত ব্যক্ত আছে,—

১। যে ব্রাহ্মণের বেদ বিদ্যার সহিত সম্পর্ক নাই, ধার্ম্মিক নরপতিগণ, তাহার দ্বারা শূদ্রের কার্য্য করাইয়া লইবেন॥ হরিবংশ, ভবিষ্য পর্ব্ব, ২১৪ অধ্যায়॥

২। সংহিতা শ্রেষ্ঠ মনুতে আছে,—ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের মধ্যে যাহারা বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্য গ্রন্থ পাঠ করে, তাহারা জীবিতাবস্থায় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়॥ ২। ১৬৮॥ এই কথার উদাহরণে মনু সংহিতায় লিখিত আছে, (ক) ক্লীব যেমন স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদনে অক্ষম, গাভী যেমন গাভীতে নিষ্ফল, তদ্রূপ বেদ অধ্যয়ন হীন ব্রাহ্মণ নিষ্ফল অর্থাৎ কোন কার্য্য কারক হয় না॥ ২।১৫৮॥

(খ) যেমন কাষ্ঠ নির্ম্মিত হস্তী ও চর্ম্ম নির্ম্মিত মৃগ কোন কার্য্যকরী হয় না, তদ্রূপ বেদ অধ্যয়ন না করিলে, ব্রাহ্মণ কোন কার্য্যকরী হয় না, তাহার ব্রাহ্মণ নাম নিরর্থক॥ ২।১৫৭॥

৩। ভীষ্ম কহিলেন,—ব্রাহ্মণ অসৎ কর্ম্ম পরায়ণ হইলে লোকে তাহাকে দাস, কুক্কুর, বৃক্ ও পশুর ন্যায় অবজ্ঞা করে॥ শান্তি পর্ব্ব, ৬২ অধ্যায়॥

৪। ইন্দ্র কহিলেন,—যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান ও আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে উহার বিপরীত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে শত্রুর ন্যায় শস্ত্র দ্বারা বধ করা কর্ত্তব্য॥ শান্তি পর্ব্ব, ৬৫ অধ্যায়॥

৫। ভীষ্ম কহিলেন,—স্বধর্ম্ম [অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ] বিহীন ব্রাহ্মণ শূদ্র তুল্য বলিয়া কীর্ত্তিত। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় নহে এবং যাহাদিগের [গৃহে] অগ্নি সঞ্চিত

নাই, ধার্ম্মিক নরপতি তাহাদিগের নিকট কর গ্রহণ ও তাহাদিগকে বিনা বেতনে কার্য্যে নিয়োগ করিবেন। ধর্ম্মাধিকারী, দেবল, নক্ষত্র যাজক, গ্রাম্য যাজক, শুল্ক গ্রাহক ব্রাহ্মণ চণ্ডাল তুল্য॥ শান্তিপর্ব্ব ৭৬ অধ্যায়॥

৬। ভীষ্ম কহিলেন,—যাহারা বৈদিক কর্ম্মে ব্যাঘাত করে, তাহারা দস্যু [অনার্য্য]॥ শান্তিপর্ব্ব, ৯১ অধ্যায়॥

উপরোক্ত শাস্ত্রবচনগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ভ্রমেও সমাজকে কখনও শুনান নাই। বরং শুনাইয়াছেন,—"ব্রাহ্মণ যদি নিন্দিত কার্য্য করে, তথাপি সকলের পূজ্য। যেহেতু ব্রাহ্মণ পরম দেবতা-স্বরূপ॥ মনু, ৯।৩১৯॥

ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জ্ঞাত আছেন,—ভারতে বৌদ্ধগণ হতমান হইবার পরে পুনরায় যে রাজশক্তি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সকল ক্ষত্রিয় রাজগণও স্মার্ত্তকর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন। এমত অবস্থায় মনু পরাশর প্রভৃতি সংহিতায় যে পরিষদের কথা দেখা যায়, ঐ বিধি অনুসারে সমাজে প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থার জন্য যে পরিষদ গঠিত হইত এবং সেই পরিষদের ব্যবস্থা যে রাজার মারফতে প্রদত্ত হইত, ইহাই এখন বলিতে হইবে।

পরিষদের কথা

ব্যবহারতত্ত্ব গ্রন্থে লিখিত আছে,—

যস্মিন দেশে নিষীদন্তি বিপ্রা বেদবিদস্ত্রয়ঃ।
রাজ্ঞঃ প্রতিকৃতো বিদ্বান্ ব্রাহ্মণস্তাং সভাং বিদুঃ॥

অর্থাৎ,—যে স্থলে রাজার প্রতিনিধি স্বরূপ তিনজন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট থাকেন, তাহাকে সভা বা পরিষদ্ কহে। বলা বাহুল্য, এই

পরিষদে রাজার প্রতিনিধি স্বরূপ যে সকল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইতেন, তাঁহারা রাজার দ্বারাই মনোনিত হইতেন।

মনু সংহিতায় পরিষদের কথায় প্রথমে লিখিত হইয়াছিল,—ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ—বিশেষজ্ঞ তিন জন দ্বারা পরিষদ্ গঠিত হইবে, তাঁহারা যাহা নিরূপণ করিবেন, তাহাই হইবে॥ ১২।১১২॥ আর সর্ব্বশেষে বিধান রচিত হইয়াছিল,—

যেখানে দশজন উপযুক্ত ব্যক্তি না মিলিবে সেখানে কমপক্ষে তিনজন বিদ্বান, সদাচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণই পরিষদ হইবে॥ ১২।১১০॥

পরাশর-সংহিতায়ও প্রায়শ্চিত্তের জন্য পরিষদ গঠন করিবার বিধি আছে এবং কিরূপ ব্রাহ্মণ সহায়ে পরিষদ গঠিত হইবে, তাহাও লিখিত আছে। পরিষদ গঠন প্রসঙ্গে—যত কথা আছে, তাহা দেখিয়া মনে হইবে, ইহা এক সময়ে রচিত হয় নাই। যতদিন ব্রাহ্মণবর্ণ সজীব ছিল, তখনকার মত ব্যবস্থা, যখন নির্জীব হইয়াছিল, তখনকার মত ব্যবস্থা ও যখন 'জ্ঞান পবন' প্রায় লোপ পাইয়াছিল, তখনকার মত ভিন্ন ব্যবস্থা—এই তিন রকমের ব্যবস্থাই রহিয়াছে।

সজীব পরিষদ ঃ—পরাশর-সংহিতায় আছে, "যে সকল ব্রাহ্মণ সাবিত্রী (বেদ) অথবা গায়ত্রী জ্ঞাত নহে, সন্ধ্যা উপাসনা জানে না ও অগ্নিতে হোম ক্রিয়া করে না, অথবা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত, তাহারা কেবল নাম মাত্র ব্রাহ্মণ। এইরূপ ব্রতরহিত এবং মন্ত্র ও জাতি-মাত্র-জীবী সহস্র ব্রাহ্মণ একত্র হইলেও, তাহাকে পরিষদ্ বলা যায় না। অজ্ঞানাভিভূত মূর্খ, ধর্ম্মতত্ত্ববিমূঢ় ব্যক্তিগণ যে কথা বলে তাহাতে কেবল সেই পাপ শতগুণে বিভক্ত হইয়া, সেই সকল বক্তাদিগকেই অশিয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম না জানিয়া, যাহারা প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দেয়, তাহাদের ব্যবস্থায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপ নাশ হয় বটে; কিন্তু ব্যবস্থা-দাতা সভ্যগণ সেই পাপ-ভাগী হন॥ ৮।১১-১৪॥

চারিজন কিম্বা শুধু তিনজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যে ব্যবস্থা দিবেন, তাহাই যথার্থ ধর্ম্মসম্মত বলিয়া জানিবে, অন্য সহস্র লোকের কথাও ধর্ম্ম বলিয়া গ্রাহ্য করিবে না ॥ ৮।১৫ ॥

যাহারা প্রমাণের পথ অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ সকল কথার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা দেন, সেই সকল বহুগুণ-বেত্তা পণ্ডিত-গণকেই পাপ ভয় করে। যেমন পাথরে জল থাকিলে বায়ু ও সূর্য্যের উত্তাপ দ্বারা ক্রমে শোষিত হয়, সেইরূপ উক্ত ব্রাহ্মণ সমিতি বা পরি-ষদের আদেশে সমস্ত পাতকই বিনষ্ট হয়, তাহা আর পাপকারী কিম্বা ব্যবস্থাদাতা পরিষদ কাহাকেও অর্শে না ॥ ৮।১৬-১৮ ॥

এই সকল পরিষদের ব্রাহ্মণগণ অগ্নি ও বেদ-পূজক ছিলেন। ইহার পরের যুগে যখন এক-মাত্র বেদই ব্রাহ্মণের সম্বল রহিল, তখন রচিত

নির্জ্জীব পরিষদ

"যাহারা বেদ-বেদাঙ্গ-পরায়ণ ধর্ম্মজ্ঞ অথচ আহিতাগ্নি (যে দিন ভূমিষ্ঠ হইবে, সেই দিন হইতে আঁতুর ঘরের আগুন মরণ পর্য্যন্ত যাহারা রাখে এবং সেই আগুনে দাহ করে, তাহাদিগকে আহিতাগ্নি বা সাগ্নিক ব্রাহ্মণ কহে) নহেন, তাঁহাদের পাঁচ জন বা তিন জন একত্র হইলেই তাহাকে পরিষদ্ কহে ॥ ৮।১৯ ॥

যিনি চারি বেদেই পণ্ডিত, নির্ব্বিকল্প হৃদয় বেদাঙ্গ-বেত্তা, ধর্ম্মপাঠক, তিনি একাই শ্রেষ্ঠ পরিষদ্ ॥" ৮।৩৪ ॥

মৃত পরিষদ :—

"কিন্তু যদি পাঁচ জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায়, যাঁহারা স্ববৃত্তি পরিপুষ্ট, তাঁহাদের পাইলেও পরিষদ্ বলা যাইবে ॥ ৮।২১ ॥

কিন্তু যাঁহারা মুনি, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন দ্বিজ, যজ্ঞ-যাজনকারী, দেবব্রত-পরায়ণ, স্নাতক ব্রাহ্মণ তাঁহাদের একজন হইলেও পরিষদ্ বলা যায় ॥ ৮।২০ ॥

"নতুবা দশজন সংসারাশ্রমী ব্রাহ্মণও মধ্যবিৎ পরিষদ্ হয় ॥" ৮.৩৪ ॥

উপরোক্ত দুইটি মন্ত্র তখনই লিখিত হইয়াছিল, যখন বেদ ও অগ্নি ইহার কোনটির ধারই ব্রাহ্মণগণ ধারিত না।

আবার এই অধ্যায়েই লিখিত আছে,—যে সকল বিপ্র কেবল নামমাত্র ব্রাহ্মণ, তাহারা যদি প্রায়শ্চিত্ত বিধি দেয়, তবে সেই পাপ কর্ম্মে দ্বিজগণ নরকে গমন করে। যে সকল ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করিয়া থাকেন, নিত্য পঞ্চযজ্ঞনিরত, তাঁহারাই পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিষয়াসক্ত লোকের আশ্রয়স্বরূপ** ॥ ৮।২৭-২৮ ॥

উপরোক্ত মন্ত্র সকল হইতে দেখা যাইতেছে, পরিষদ ইচ্ছা হইলেই গঠিত হইতে পারিত না, রাজার মঞ্জুরীর অপেক্ষা করিত। তাই পরাশর-সংহিতায় লেখা আছে,—দ্বিজগণ রাজার অনুমতি পাইলে, তবে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিবেন। প্রায়শ্চিত্ত-বিধি তাঁহারা নিজে কখন বলিবেন না। ॥ ৮।৩৫ ॥

পরিষদ গঠনের কথা অষ্টম অধ্যায়ে লিখিত আছে। উপরে যে বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে, উহা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয়কৃত। ইহা পড়িয়া মনে হইল,—কোন ব্যক্তির কোন অপরাধের কথা রাজা জানিতে পারিলে অপরাধী সম্বন্ধে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হওয়া বিধেয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য রাজা উপযুক্ত ব্রাহ্মণের দ্বারা পরিষদ গঠন করিতেন।

প্রথমে যে পরিষদ গঠিত হইত, তাহাতে অগ্নি ও বেদপূজক ব্রাহ্মণই স্থান লাভ করিতেন। ইঁহারা সংখ্যায় তিন হইতে চারিজন থাকিতেন।

দ্বিতীয় স্তরে,—অগ্নিত্যাগী মাত্র বেদপাঠকারী ও পঞ্চ মহাযজ্ঞে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ হইলেই চলিত।

তৃতীয় স্তরে,—মাত্র একজন আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মুনি হইলেই পরিষদ হইত। অন্যথায় দশজন ব্রাহ্মণ।

মন্তব্য :—মুনি! মুনির সঙ্গে বেদপন্থী সমাজের কি সম্পর্ক? হিন্দুর বেদ হইতে উপপুরাণ, তন্ত্র মন্ত্র যা কিছু সমস্তই ঋষিদের উক্তি বলিয়া লিখিত আছে। ঋগ্বেদের মধ্যে যেমন আর্য্যবর্ণের উৎপত্তির কথা না বলিয়া বলা হইয়াছে ব্রাহ্মণোঽস্যমুখমাসীৎ, তেমন ঋষিদের ক্ষমতার কথা না বলিয়া, বলা হইয়াছে দুইটি মন্ত্রে মুনির কথা, যাহার সহিত বেদ বা বেদপন্থীগণের কোন সম্পর্ক নাই। যথা,—যিনি মুনি হন, তিনি আকাশে উড়িতে পারেন, সকল বস্তু দেখিতে পান। যে স্থানে যত দেবতা আছেন, তিনি সকলের প্রিয় বন্ধু [মানবের বন্ধু কিনা তাহা কিন্তু বলা হয় নাই], সৎকর্ম্মের জন্যই তিনি জীবিত থাকেন (১০।১৩৬।৪)। অপর মন্ত্রে আছে,—যিনি মুনি হন, তিনি বায়ুপথে ভ্রমণ করিবার ঘোটক স্বরূপ, তিনি বায়ুর সহচর, দেবতারা তাহাকে পাইতে ইচ্ছা করেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিম—এই দুই সমুদ্রে তিনি বাস করেন ॥ ১০।১৩৬।৫ ॥

বলা বাহুল্য, শাক্য মুনি বা বুদ্ধদেবকে আশ্রয় করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাহিত্যে যে মুনি শব্দের ব্যবহার, ঐ মুনিশব্দ যে বৌদ্ধদের নিজস্ব নহে, উহাও যে বেদে আছে, তাহাই দেখাইবার জন্য ঐ দুইটি মন্ত্রকে ঋষি রচিত গ্রন্থে স্থান দিতে হইয়াছিল। কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইল,—এই দেবানাং প্রিয়, বায়ু পথের ঘোটক স্বরূপ, সমুদ্র-বাসী মুনি জীবটিকে প্রায়শ্চিত্ত বিধি দেওয়ার জন্য কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে, সে কথা কিন্তু পরাশর ঋষি বলেন নাই।

পূর্ব্বাপর ধার্য্য ছিল,—যাঁহারা অগ্নিপূজক, গায়ত্রীনিষ্ঠ ও ব্রহ্ম (মন্ত্র) তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারাই দ্বিজগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহার পরে ধার্য্য হইল,—দুঃশীল হইলেও দ্বিজ পূজ্য হইবে, আর শূদ্র সংযতেন্দ্রিয় হইলেও পূজনীয় হয় না ॥ পঃ সং ৮।৩২ ॥

প্রায় হাজার বৎসর ভারতবর্ষ পরাধীন। ব্রাহ্মণ কর্তৃক বংশগত বর্ণ বিভাগ, শূদ্র সংস্রব ত্যাগ ও গায়ের জোরে অনার্য্যগণকে বংশগত ভাবে মুচি, মেথর, ধাঙ্গর, মুরদাফরাস জাতিতে পরিণত করিয়া রাখা এবং সর্ব্বদার জন্য অনার্য্য ও অস্পৃশ্যকে সমভাবে ঘৃণার চক্ষে দেখা—ভারতে মুসলমান আক্রমণ সহজ হইয়াছিল। তারপরেই অত্যাচারিত অনার্য্যগণ দলে দলে মুসলমান হইতে লাগিল। এই ভাবে সাত শত বৎসর মুসলমান রাজত্বে ভারতের পাঁচ কোটি অত্যাচারিত, উৎপীড়িত, সমাজ পরিত্যক্ত অধিবাসী মুসলমান সমাজে স্থান লাভ করিয়াছিল।

এই হাজার বৎসরের মধ্যে দক্ষিণ ভারতে মহারাজা ছত্রপতি শিবাজী ও পাঞ্জাবে মহারাজা রণজীৎ সিংহ ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন নরপতি ছিলেন না। তারপরে ইংরাজ রাজত্ব আরম্ভ।

সুতরাং আজও যে গ্রামে গ্রামে ব্রাহ্মণগণ প্রায়শ্চিত্ত-বিধি দিতেছেন, ইহা কোন্ রাজার নির্দ্দেশ মত, আর এই যে লক্ষ লক্ষ লোক সমাজ হইতে পরিত্যক্ত হইল, তাহা হইয়াছিল কিরূপ পরিষদের বিচারে, সে কথা কি হিন্দুগণ ব্রাহ্মণ-সমাজকে জিজ্ঞাসা করিবেন না?

যে ব্রাহ্মণগণ অগ্নি ও বেদহীন হইয়া দশ দিন অশৌচ গ্রহণে বাধ্য আছে, যে ব্রাহ্মণগণ মধ্যে অজ্ঞের সংখ্যার সীমা নাই, যে ব্রাহ্মণগণ-মধ্যে সংযতেন্দ্রিয়ের সংখ্যা খুবই কম, যে ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করে না, পঞ্চমহাযজ্ঞের ধার ধারে না, শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মধ্যে যেখানে অনেক ব্রাহ্মণই শ্ববৃত্তি অর্থাৎ কুক্কুর বৃত্তি বা চাকুরী গ্রহণ করিয়াছে,

আর সকল দেশেই যখন ইংরাজই বিচার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, কদাচ ব্রাহ্মণগণকে পরিষদ করিয়া বিচার করিতে আহ্বান করেন না, তবুও বেদ ও অগ্নিহীন শূদ্র-ব্রাহ্মণগণ যে ধর্ম্ম ও সমাজ-সম্পর্কে অনধিকার চর্চ্চা করে, সমগ্র হিন্দু-সমাজ যদি এখনও তাহার গতিরোধ না করেন, তবে এই শূদ্রাচারী নামমাত্র ব্রাহ্মণের অদ্ভুত শাস্ত্র-ব্যাখ্যার ফলে দেশ রসাতলে যাইবে। কদাচ হিন্দুজাতি একতা লাভ করিয়া উন্নতি করিতে সক্ষম হইবে না। আর এই শূদ্রাচারী ব্রাহ্মণ যত বেশী দিন প্রশ্রয় পাইবে, ততদিনই সমাজে বর্ণ বিভাগ ও ছুঁৎমার্গ বা divide and rule প্রবল থাকিবে এবং দেশের দুর্দ্দশাও চরম অন্তিমে উপস্থিত হইবে।

শাস্ত্র হইতে এমন বাক্যের উদ্ধার—
যাহা মোটেই বিচার সহ নহে

উদাহরণ স্বরূপ রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণের তথা কথিত অস্পৃশ্যদের মন্দির প্রবেশের বিরুদ্ধে ব্যাস সংহিতা হইতে যে অকাট্য প্রমাণ (?) উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, সেই কথা বলা যাইতে পারে।:—

ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে যে সন্তান, তাহা চণ্ডাল হয়। চণ্ডালের সন্তানও চণ্ডাল হয়।

চণ্ডাল তিন প্রকার :—

১। কুমারীর (কন্যার) সন্তান চণ্ডাল হয়।

২। সগোত্রে বিবাহের সন্তান চণ্ডাল হয়।

৩। গো-মাংস ভক্ষণ করিলে অন্ত্যজ হয়।

অন্ত্যজের তালিকায় বলা হইয়াছে,—বর্দ্ধকী, মালী, বরট, মেদ, চণ্ডাল, শ্বপচ ও কোল—ইহারা অন্ত্যজ॥ ১।৯-১১॥

উপরোক্ত শাস্ত্র বাক্য জানাইয়া রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ হিন্দুগণকে ইহাও জানাইয়াছিলেন যে,—অন্ত্যজের উপস্থিতিতে মন্দির ও দেবতা অপবিত্র হয় বলিয়াই, তাঁহারা 'হরিজনের' মন্দির প্রবেশের বিরোধী। সাধু !

অতএব ব্যাস সংহিতার উক্ত বিধানগুলি বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন, উহা সমর্থন করা সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত কি না। ঃ—

কানীন পুত্র কখন চণ্ডাল হইতে পারে না

সত্যবতী-সুত-কৃত ব্যাস সংহিতায় অন্ত্যজের পরিচয়ের সহিত তাঁহার নিজের জন্ম ও কর্ম্মের কোন সঙ্গতিই রক্ষিত হয় নাই। অর্থাৎ—

১। কুমারী-পুত্র যদি চণ্ডাল হইত, তবে ব্যাসদেবও চণ্ডাল হইতেন। তিনিও যে কুমারীর গর্ভজাত সন্তান ! [মহা, আদি, ৬৩ অধ্যায়], আর গোমাংস আহারে মানুষ যদি চণ্ডাল বা অন্ত্যজ হইত, তবে ব্যাসদেবেরও চণ্ডাল হওয়া উচিৎ ছিল। কারণ, মাননীয় বলিয়া গো সাধন মধুপর্ক দ্বারা তিনিও যে পূজিত হইয়াছেন ॥ কালী সিংহ মহা, আদি, ৬০ অধ্যায় ॥ কিন্তু বর্দ্ধমান রাজ মহাভারতে অন্যরূপ আছে। *

কুমারী-পুত্র যদি চণ্ডাল হইত, তবে মনু সংহিতায় কানীন পুত্রের কথা কখনই থাকিতে পারিত না। অধিকন্তু নিম্ন মন্ত্রটিও দৃষ্ট হইত

* মহাভারতে (আদি পর্ব্ব, ৬০ অধ্যায়) জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞে ব্যাসদেবের উপস্থিতি প্রসঙ্গে লিখিত আছে,—"জনমেজয়" সেই পিতামহ কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে পাদ্য অর্ঘ্য ও (মধুপর্কের জন্য) গো নিবেদন করিলেন। ব্যাসদেব প্রীতমনে সেই সমস্ত পূজা গ্রহণ করিয়া অকারণে জীবহিংসা উচিৎ নয় বলিয়া গোবধ করিতে দিলেন না।

"জীবহিংসা" কথাটা বৌদ্ধদের নিজস্ব। সুতরাং উপরোক্ত কথা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, উহা ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তিনামার পরে লিখিত হইয়াছিল, যেমন শ্বেতকেতু ও দীর্ঘতমার নামে যৌন-শাসন কথা লিখিতে হইয়াছিল।

না:—অবিবাহিত অবস্থায় উৎকৃষ্ট জাতীয় পুরুষ সহবাসে কন্যার কোন দণ্ড হইবে না॥ ৮।৩৬৫॥

কুমারী কুন্তীর গর্ভজাত পুত্র মহারথী দাতাকর্ণ। ইনি সূত গৃহে প্রতিপালিত বলিয়া ইঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ, ইঁহাকে সূতপুত্র বলিয়া শ্লেষ করিলেও, তিনি দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক অঙ্গ দেশের রাজা হইয়াছিলেন এবং দুর্য্যোধনের সহিত সমভাবেই উঠা বসা করিতেন। চণ্ডাল হইলে বোধ হয় অদৃষ্টে কোন দিনই ঐ ভাবে রাজপদ লাভ হইত না।

মনু সংহিতায় কানীন পুত্রের কথায় লিখিত আছে,—কানীন পুত্র ভাবী পতিরই পুত্র হইবে॥ ৯।১৭২॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় লিখিত আছে,—কানীন পুত্র মাতামহের পুত্র হইবে॥ ২।১৩২॥

বশিষ্ঠ সংহিতায় আছে,—পণ্ডিতেরা বলেন, কানীন পুত্র মাতামহের পুত্র স্থানীয়॥ ১৭ অধ্যায়॥

বেদ ও মনু সংহিতার মতের বিরুদ্ধে অন্য শাস্ত্রের মত যখন গ্রহণ যোগ্য হইতেই পারে না, তখন ধার্য্য হইল,—কোন কুমারীর পুত্রই নিন্দনীয় নহে, চণ্ডাল হওয়া ত দূরের কথা।

স্বগোত্রে বিবাহের সন্তান চণ্ডাল হয় না

২। স্বগোত্রে বিবাহের সন্তান চণ্ডাল কি? আমরা কিন্তু মহাভারত বর্ণিত ক্ষত্রিয় বর্ণের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য রাজগণ মধ্যে জ্ঞাতি কন্যার সহিতই যৌন সম্বন্ধ দেখিতে পাই। পাঠকগণও আরও পরিষ্কার দেখিতে পাইবেন, যদি বংশাবলী মিলাইয়া দেখিতে পারেন। বংশাবলীতে আছে,—রাজা যযাতির পাঁচ পুত্র। তন্মধ্যে যদু ও তুর্ব্বসু ঋষি কন্যা দেবযানীর গর্ভজাত, অনু, দ্রুহ্যু, ও পূরু দৈত্যকন্যা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভজাত। মহাভারত বর্ণিত অধিক সংখ্যক রাজগণই এই পাঁচ বংশের মধ্যে যৌন

সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং যখন দেখা যাইতেছে যে,—জ্ঞাতি কন্যা বিবাহের সন্তান ক্ষত্রিয় ভিন্ন চণ্ডাল হয় নাই, তখন ধার্য্য হইল,—স্বগোত্রে বিবাহের সন্তান কখনও চণ্ডাল হইতে পারে না। অধিকন্তু বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণমতে ব্রাহ্মণ বর্ণ ক্ষত্রোপেত বা ক্ষত্রিয় বংশ-জাত। সুতরাং স্বগোত্র বিবাহের সন্তান চণ্ডাল হয় নাই। হইয়াছিল,—কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণ, হারিত ব্রাহ্মণ [মতান্তরে আঙ্গিরস ও হারিত একই], মৌদ্গল্য ব্রাহ্মণ, গার্গ্য ব্রাহ্মণ প্রভৃতি।

গো মাংস ভক্ষণে চণ্ডাল হয় না

৩। গো মাংস খাইলে যদি মানুষ চণ্ডাল হইত, তবে সমগ্র ভারতে এক চণ্ডাল বর্ণ ছাড়া, অতীত বা বর্ত্তমানে অন্য কোন বর্ণই দেখা যাইত না। কেন, তাহাই প্রমাণ সহ এখানে বলিতে হইবে।

এদেশে যাহা আর্য্যগণ মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহাই ক্ষত্রিয় বর্ণ ও পরে ব্রাহ্মণবর্ণও গ্রহণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে বেদপাঠ প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়াই ধার্য্য ছিল। এই বেদপাঠ পিতা বা গ্রামান্তরে গুরুর নিকট করিতে হইত। তারপর সেই পুত্র পাঠশেষ করিয়া বিবাহ করিতে যখন গৃহে ফিরিয়া আসিত, তখন তাহাকে গাভীর মাংস আহার করাইয়া আপ্যায়িত করা হইত। ইহাই হইল মধুপর্ক। এই প্রসঙ্গে মনু সংহিতায় উক্ত আছে,—

গো মাংস ব্যবহারে শাস্ত্রীয় আদেশ

তং প্রতীতং স্বধর্ম্মেণ ব্রহ্মদায়হরং পিতুঃ।
স্রগ্বিণং তল্প আসীনমর্হয়েৎ প্রথমং গবা॥ ৩।৩॥

অর্থাৎ—পিতা বা গুরু হইতে গৃহীত-বেদ ব্রহ্মচারীকে বিবাহের পূর্ব্বে গো-সাধন মধুপর্ক দ্বারা পিতা বা আচার্য্য আপ্যায়িত করিবেন।

মধুপর্কের কথা এই গ্রন্থের ৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। মনু সংহিতায় মধুপর্কের কথা পাঁচটি মন্ত্রে আছে। ঐ প্রসঙ্গে ভাষ্যকার মেধাতিথি যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

(ক) গবা মধুপর্কেন ॥ ৩।৩ ॥

(খ) গো বধো মধুপর্ক ইত্যাদি ॥ ৩।১১৯ ॥

(গ) গোর্মধুপর্কদানং বিহিতম ॥ ৩।১২০ ॥

(ঘ) তস্য নিয়মোক্তধর্ম্মার্থমেব দাতুস্তস্য হি গোরুৎসর্গ পক্ষে বিহিতো নামাংসো মধুপর্কস্যাদিতি ॥ ৫।২৭ ॥

(ঙ) মধুপর্কো ব্যাখ্যাতঃ তত্র গোবধো বিহিতঃ ॥ ৫।৪১ ॥

গৃহসূত্রে বিবাহের তিন দিনের মধ্যে যে মধুপর্কের কথা আছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

দৈনন্দিন আহারেও মনু সংহিতায় গো মাংসের উল্লেখ আছে। যথা :—সেধ, শল্যক, গোসাপ, গণ্ডার, কচ্ছপ ও শশারু এই পঞ্চনখযুক্ত ও উষ্ট্র বর্জ্জিত এক পাটী দন্ত বিশিষ্ট পশুর মাংস ভোজন করা যায় ॥ ৫।১৮ ॥

উষ্ট্র ভিন্ন বাকী এক পাটী দন্ত বিশিষ্ট পশুর কথায় ভাষ্যকার মেধাতিথি লিখিয়াছেন,—উষ্ট্র বর্জ্জিতা একতোদতো গোহব্যঞ্জনা মৃগা ভক্ষাঃ। অর্থাৎ—এক পাটী দন্ত উষ্ট্র ভিন্ন গাভী, শৃঙ্গহীন বরাহ প্রভৃতি ও মৃগ ভক্ষণ করা যায়।

শ্রাদ্ধে মাংসের ব্যবস্থার কথায় মনু সংহিতায় আছে,—তিল, ধান্য, ফল, জল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোক একমাস; বোয়াল, রোহিত প্রভৃতি ভক্ষ্য মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে দুই মাস; হরিণ মাংসে তিন মাস; মেষ মাংসে চারি মাস; পক্ষী মাংসে পাঁচ মাস; ছাগ মাংস ছয় মাস; বিচিত্র মৃগ মাংসে সাত মাস; এণ মাংসে আট মাস; রুরু মাংসে নয় মাস; বরাহ ও মহিষ মাংসে দশ মাস; সজারু ও কূর্ম্ম

মাংসে এগার মাস; গো মাংস ও গো-দুগ্ধের পায়সে বার মাস তৃপ্ত থাকেন ॥ ৩।২৬৭—২৭১ ॥

মহাভারত (অনুশাসন পর্ব্ব, ৮৮ অধ্যায়) ও বিষ্ণুপুরাণে (৩।১৬) লিখিত আছে,—শ্রাদ্ধে বরাহ, মহিষ, গাভী ও বৃষ মাংস ব্যবহার করিবে।

রাজা রন্তিদেব নিত্য দুই হাজার গাভী ও বৃষ-মাংস দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন একথা মহাভারত [বনপর্ব্ব ২০৭ ও শান্তিপর্ব্ব, ২৯ অধ্যায়] গৌরবের সহিত ঘোষণা করিতেছে।

গো মাংস ভক্ষণের উদাহরণ

ব্যাসদেবের পক্ষে মধুপর্কে গো মাংস ভোজনের কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এইবার শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিতে হইবে। মহাভারতে লিখিত আছে,—"তখন ধৃতরাষ্ট্রের পুরোহিতগণ শ্রীকৃষ্ণকে গো-সাধন মধুপর্ক দ্বারা অভ্যর্থনা করিলেন। গোবিন্দ আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কুরুদিগের সহিত পরিহাস ও কথোপকথন করিতে লাগিলেন॥" উদ্যোগপর্ব্ব, ৮৮ অধ্যায় ॥

রাজা যুধিষ্ঠিরও মহর্ষি বৃহদশ্বকে মধুপর্কের দ্বারা অর্চ্চনা করিয়াছিলেন ॥ বন পর্ব্ব, ৫২ অধ্যায় ॥

রামায়ণে দেখা যায়, শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে ভরদ্বাজ ঋষি গো-সাধন মধুপর্ক দ্বারা আতিথ্য গ্রহণ করাইয়াছিলেন ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৪ সর্গ ॥

উপরোক্ত ব্যবস্থা দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে,—বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রভাবে গুরুগৃহে নিরামিষ ভোজন প্রবর্ত্তিত হইলেও ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যগণ বেদ অধ্যয়ন শেষ করিয়া বিবাহের পূর্ব্বে যে গোমাংস দ্বারা জীবন আরম্ভ করিত, বিবাহে সেই গো মাংস, নিত্য আহারে সেই গোমাংস তাহাদের নিকট সম আদৃতই ছিল। এমন কি সেই গোমাংসের দ্বারা অবৈদিক পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত রচিত হইল।

এদেশের লোক শাস্ত্র জানে না। যদি বা জানে, সে ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তিনামাই বেদ বলিয়া জানে। তাই বাচালের ন্যায় রক্ষণশীলগণ যত মিথ্যা কথা বলিতেছে, আর শাস্ত্রজ্ঞান বর্জ্জিত হিন্দুগণ তাহাই বিশ্বাস করিয়া যাইতেছে। নতুবা আজও যদি কেহ **অশ্বমেধ যজ্ঞ,** গোমেধ যজ্ঞ, বিশিষ্ট অতিথির আগমনে মধুপর্কে গাভী বা বৃষ বধ, কিম্বা পিতৃশ্রাদ্ধে গোমাংস প্রদান করে বা করিতে পারে, তাহা যে অবৈদিক অর্থাৎ পাপজনক হইবে না, একথা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। কারণ,—মনু সংহিতায় লিখিত আছে,—যজ্ঞে পশুর মাংস ভক্ষণ করিবে, শ্রাদ্ধে ও মধুপর্কে নিযুক্ত হইলে মাংস ভক্ষণ করিবে ও খাদ্যাভাবে প্রাণ যায়, এমন সময় মাংস খাইতে পারিবে ॥ ৫।২৭ ॥ আর আছে,—

ভোক্তা ভোজনের উপযুক্ত প্রাণী সমূহ প্রতিদিন ভোজন করিলে দোষ হয় না। যেহেতু,—সৃষ্টিকর্ত্তা ভক্ষ্য বস্তু ও ভোক্তা এই উভয়কেই সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৫।৩০ ॥

জন্ম-বৈগুণ্যে কেহই অন্ত্যজ বা চণ্ডাল হইতে পারে না

৪। বার্দ্ধকী, নাপিত, গোপ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক, কিরাত, কায়স্থ, মালী, বরট, মেদ, কৈবর্ত্ত, শ্বপচ,—ইহারা ক্ষেত্র প্রাধান্যে মায়ের বর্ণ অথবা বীর্য্য প্রাধান্যে পিতার বর্ণই প্রাপ্ত হইবে। ইহাদের মধ্যে কেহই যে চণ্ডাল হইতে পারে না, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মবারি স্পর্শ ও প্রায়শ্চিত্ত বিধি পালন করিলে তথা কথিত সকল পাপ ক্ষয় হয়

৫। অগম্যা গমন কিম্বা সেই হেতুতে যে সন্তান, ইহারা কেহই চণ্ডাল হইতে পারে না। শাস্ত্রে লিখিত আছে,—চন্দ্র গুরুপত্নী তারাকে

হরণ করিয়াছিলেন ও তাহাতে বুধের জন্ম হয়। বুধের পুত্র পুরুরবা—এই পুরুরবা বংশই পুরাণে চন্দ্র বংশ বলিয়া কীর্ত্তিত। অগম্যাগমণ ও তৎহেতু যে পুত্র, এই উভয় যদি চণ্ডাল হইত, তবে আমরাও শাস্ত্রে চন্দ্র বংশকে ক্ষত্রিয় না দেখিয়া চণ্ডাল ও দেব সমাজে চন্দ্র ও বুধকে অপাংক্তেয়ই দেখিতাম। যে দেশের ধর্ম্ম গ্রন্থে এক বিন্দু গঙ্গাজলে অনন্ত পাতক স্খালনের কথা রহিয়াছে, যে সমাজের শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত বিধি রহিয়াছে, সে দেশে কোন পাপে কেহ চণ্ডাল হইতে পারে না।

ব্যাস সংহিতা বা অন্যান্য ধর্ম্ম গ্রন্থে চণ্ডালের উৎপত্তি প্রসঙ্গে ব্যাস সংহিতারই অনুরূপ যে অভিমত ব্যক্ত রহিয়াছে, ইহা যে মোটেই বিচারসহ নহে, তাহা সকলেই দেখিলেন। তবুও সংস্কার বশতঃ হয়ত অনেকেই ভাবিবেন, কেন এবং কখন এমন পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রহিত অভিমতগুলি শাস্ত্রে স্থান লাভ করিল? ইহার উত্তরে আমরা পূর্ব্বেও অনেকবার বলিয়াছি এবং এখানেও দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি,—সেই ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তিনামাই যত অঘটন ঘটাইয়া দেশকে কাঞ্চণ ফেলিয়া অঞ্চলে কাচ বাঁধিতে শিখাইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ মাংসাহার প্রসঙ্গে দুই চারিটি মজার কথা শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করা হইল।

মনু সংহিতায় লিখিত আছে,—

১। মাংস ভক্ষণ, মদ্যপান ও নারী সহবাসে (অবাধ যৌন সম্বন্ধে) দোষ নাই। কারণ,—মানবের জন্মগত প্রকৃতিতে এই তিন বস্তু ভোগ করিবার স্পৃহা রহিয়াছে। কিন্তু নিবৃত্তি আশ্রয়ে মহাফল ॥৫।৫৮॥

এই নিবৃত্তি, সংযম কথাগুলি বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিজস্ব। সুতরাং উপরোক্ত শ্লোক যে চুক্তিনামা প্রভাবে লিখিত হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। এই মন্ত্রটি যে প্রথমে রচিত হইয়াছিল, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য নিম্নে অপর কয়েকটি মন্ত্র উদ্ধৃত করা হইল, যাহা অবলম্বন করিয়া অনেক পণ্ডিতম্মন্যমানা মাসিকপত্রের সাহায্যে দেশবাসীকে

জানাইয়াছেন, মনু সংহিতা একমাত্র নিরামিষ ভোজনেরই ব্যবস্থা দিয়াছেন ! যথা,—

যে যাহার মাংস খায়, তাহাকে তাহার মাংসভোজী বলে, কিন্তু মৎস্যভোজীকে সর্ব্বমাংস ভক্ষক বলা যায় ; অতএব মৎস্য খাইবে না (৫।১৫)। কিন্তু ঠিক পরের মন্ত্রেই আছে,—বোয়াল, রোহিত ও রাজীব নামক মৎস্য এবং যে মৎস্যের সিংহের ন্যায় তুণ্ড (মুখ) ও যে মৎস্য আঁইশযুক্ত তাহা প্রশস্ত খাদ্য ॥ ৫।১৬ ॥

২। যজ্ঞ করিয়া মাংস ভক্ষণ করিবে। আপনার ভোজনের জন্য পশু মাংস ভোজন রাক্ষসী প্রবৃত্তি বলিয়া জানিবে ॥ ৫।৩১ ॥ ইহার পূর্ব্বের মন্ত্রে কিন্তু লিখিত আছে,—ভোক্তা ভোজনের উপযুক্ত প্রাণী সমূহ প্রতিদিন ভোজন করিলে দোষভাগী হয় না। কারণ, ধাতাই ভক্ষ্য বস্তু ও ভোক্তা এই উভয়কেই সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৫।৩০ ॥

৩। * * * অবৈধ মাংস ভোজন করিলে মৃত্যুর পরে, সেই সকল পশু অবৈধ মাংস ভোজনকারীকে ভক্ষণ করে ॥ ৫।৩৩ ॥

৪। মাংস ভোজনে সাতিশয় প্রবৃত্তি হইলে ঘৃতময় অথবা পিষ্টক নির্ম্মিত পশু নির্ম্মান করিয়া খাইবে। তথাপি দেব ও পিতৃ কার্য্য ভিন্ন পশু হিংসাতে ইচ্ছুক হইবে না ॥ ৫।৩৭ ॥

৫। যে ব্যক্তি পিশাচের ন্যায় মাংস ভক্ষণ না করে, সে লোক সমূহের প্রিয় হয় ও ব্যাধির দ্বারা পীড়িত হয় না ॥ ৫।৫০ ॥

৬। যাহার অনুমতিতে পশু হনন হয়, যে পশুকে বধ করে, যে মাংস ক্রয় বিক্রয় করে, যে মাংস পাক করে, যে মাংস পরিবেশন করে ও যাহারা ভক্ষণ করে, ইহাদিগকে ঘাতক বলা যায় ॥ ৫।৫১ ॥

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে ও ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তিনামার ফলে হিন্দুদের ধর্ম্মগ্রন্থের যে অবস্থা, তাহা এই গ্রন্থের আলোচনা হইতে সকলেই

দেখিতে পাইয়াছেন। এবার দেখিতে হইবে,—প্রভু বুদ্ধের চীন জাপানী ভক্ত উপাসকগণ, জীব হিংসা, চুরি, ব্যভিচার, মদ্যপান প্রভৃতি হইতে কতখানি দূরে থাকিয়া প্রভুর মুখ উজ্জ্বল রাখিয়াছেন।

চীনের গৃহ বিবাদের সময় প্রভু বুদ্ধের একদল ভক্ত অন্য দলের প্রাণ বধ করিয়াছে, বিপক্ষের স্ত্রীদের বলাৎকার করিয়াছে, লুণ্ঠন করিয়াছে। আর মদ্যপান করিয়াছে কি না তাহা আমাদের জানা না থাকিলেও আফিং, চণ্ডু, চরস ও শুঁটকী মাছ খাইতে চীনার জুড়ীদার যে জগতে নাই তাহা সকলেই জানেন।

জাপানে গাইসা কন্যা বলিয়া একশ্রেণীর কুমারী আছে, যাহারা নৃত্য গীত ও দেহদান দ্বারা অর্থোপায় করিয়া পিতামাতার সেবা করে। ইহাতে কোন দোষ হয় না। পরে এই কুমারীদের মধ্যে কাহারও ভাগ্যে রাজবংশীয় কুমারের সহিত পরিণয় হওয়া বিচিত্র বা অসম্ভব নহে। জীব হিংসায় জাপান বেশ অভ্যস্থ। সে যেমন আমিষ আহার করে, তেমন সামান্য কারণে চীনাদের গলাও কাটিয়া থাকে। আর চুরি, লুণ্ঠন প্রভৃতিতে জাপানী এমন হাত পাকাইয়াছে যে, দেখিলে সন্দেহ হইবে,—ইহারা সত্যই বুদ্ধদেবকে মানে কি না!

হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থে জৈন ও বৌদ্ধদের কপটাচারী আখ্যা দ্বারা আপ্যায়িত করা হইয়াছে। কথাটা যেমন সত্য, তেমন সর্ব্বদার জন্য নিত্য প্রত্যক্ষ। আজ সভ্য জগতে যে সকল বিষয়ে জঘন্য নীচতা ভীরুতা ও মিথ্যাবাদিতা বিদ্যমান, তাহার মূলে রহিয়াছে বুদ্ধদেব প্রবর্ত্তিত নীতিবাদের বিকট ব্যার্থতা।

উদাহরণ স্বরূপ এদেশের হিন্দু অবলা আশ্রম, নারী কল্যাণ আশ্রম ও বহু অনাথ আশ্রম ও পাশ্চাত্য দেশের নার্সিং হোম ও অরফ্যান চার্চ্চগুলির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

চলমান চিরন্তনীকে গোপন রাখিবার প্রচেষ্টা হইতে অবলা আশ্রম, অনাথ আশ্রম এবং ঘুস্কী সাহিত্যের উৎপত্তি

প্রাপ্ত বয়স্ক তরুণ তরুণীর মধ্যে যৌন ক্ষুধা চলমান জগতের চিরন্তনী সত্য। এবং যেখানে উভয়ের মিলন সম্ভব হইয়াছে, সেখানে সন্তানের শুভাগমনও অতি সত্য হইয়াছে। কিন্তু এ দেশ ও পাশ্চাত্য জগতের বয়স্থা কুমারীগণকে একা দেখিয়া কে সাহস করিয়া বলিবে,— ইহাদের মধ্যে কখনও যৌন ক্ষুধা জাগ্রত হইয়াছিল বা ইহারা কদাচ পুরুষ সহবাস করিয়াছে! কিন্তু অনাথ আশ্রম বা orphan church গুলির দিকে চাহিলেই ধরা পড়িবে নীতির ব্যর্থতা ও চিরন্তনী সত্যের জয় জয়কার। আর সাহিত্যের দিকে চাহিলে ধরা পড়িবে,—ঘুস্কী উপাসকগণের কলমে কেমন সুন্দর ঘুস্কী সাহিত্যের প্রচার!

মন ও মুখ এক করিয়া চলাই বৈদিক সভ্যতার বিশেষত্ব

এই কৃত্রিম জীবন যাত্রা ও কৃত্রিম সাহিত্যের হাত হইতে জগতকে বাঁচাইতে পারে একমাত্র বৈদিক সভ্যতা, যাহা চিরন্তনী সত্যকে স্বীকার করিয়াছিল বলিয়াই অনাথ আশ্রম গঠন ও ঘুস্কী সাহিত্য রচনা করিতে কোন ঋষিকে বৃথা শক্তি ক্ষয় করিতে দৃষ্ট হয় না। বরং একদিক কন্যাপুত্র পৃথুশ্রবার জ্ঞান ও দানের কথায় যেমন ঋগ্বেদ মুখর, ঋষি লোমশা [ভায়ব্যের প্রতি (১।১২৬।৭)] এবং প্রজাবান ঋষির (১০।১৮৩।৩) উক্তিও অন্যদিকে তেমনই ঋগ্বেদকে মুখর রাখিয়াছে।

সত্য কথা ঋষিগণ সহজ ভাষায় বলিয়াছেন। আর তাহারই জন্য ঋগ্বেদে ঘুস্কী সাহিত্যের কোন প্রভাবই দেখা যায় না। বরং আর্য্য ঋষিগণের কথা ও কাজ সম খোলাখুলি ভাষাতেই লিপিবদ্ধ আছে।

ভারতে বৌদ্ধ প্লাবন ধূমকেতুর মতন আসিয়াছিল, আবার ধূমকেতুর পলায়নেরই মতনই ভারতের গায়ে মিশিয়া গেল। কিন্তু তাহা হইতে উৎপত্তি হইয়াছিল,—ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তিনামা—যাহা বৈদিক ধর্ম্ম ও সভ্যতা কিছুতেই ভারতে পূনঃ প্রবর্ত্তিত হইতে দিল না। যদি দিত, তবে আজ বাবাজীর আখড়া, সন্ন্যাসীর মঠ ও গৃহস্থের ঘরের বয়স্থা কুমারী ও বাল বিধবার দিকে চাহিয়া সমাজকে হায় হায় করিতে হইত না। বরং বৈদিক ধর্ম্ম ও সভ্যতা আশ্রয় করিয়া সমাজ অতি সহজে বৃহত্তর ভারত গঠন করিয়া আপন মহিমায় জগতে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিচিত হইতে পারিত। উপরোক্ত কোন জটিলতাই সমাজে স্থান পাইত না। সুতরাং আক্ষেপ করিবার মত কিছুই দেখা যাইত না।

এই জটিলতার জন্য দায়ী কে

যদিও বুদ্ধদেবের শিক্ষাবাদ মাত্র ছয় শত বৎসর না যাইতেই ব্যাপকভাবে তাহার প্রতিকূলে চলিতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল, কিন্তু সেই প্রকৃতি বিরোধী, কার্য্যকালে যাহা অনেকের পক্ষে একান্ত অসম্ভব, সেই সংযমের মোহ ভারতবাসীকে এবং বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মণগণকে পাইয়া বসিয়াছিল। তাহারই জন্য পরবর্ত্তী কালে মহামানবগণের জীবন-আদর্শে সমাজকে চালিত করিবার উৎসাহ হইতেই যত বিপত্তির উৎপত্তি হইয়াছিল। এ বিষয়ে মহামানবগণের শিষ্য প্রশিষ্যগণও কম দায়ী নহেন।

দশ দিন অশৌচ পালন-রত অগ্নি ও বেদহীন ব্রাহ্মণ শাসিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহী বাসব

ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তিনামার পরে গুণগত বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়া যে বংশগত ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ ও বর্ণহীন এবং অন্ত্যজ জাতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, যাহার প্রভাবে ব্রাহ্মণ হইয়াছিল বর্ণ সকলের গুরু, সেই বংশগত বর্ণ ও বর্ণগত কর্ম্মের [জাতিধর্ম্ম] উপরে প্রথম আঘাত আসিয়াছিল এমন এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের নিকট হইতে, যে আঘাতে শূদ্রাচারী ব্রাহ্মণ শাসিত সমগ্র ব্রাহ্মণসমাজকে একেবারে স্তম্ভিত হইতে হইয়াছিল। আমরা দক্ষিণ ভারতের লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণ-কুমার বাসবের কথাই বলিতেছি। বিশ্বকোষ অভিধানে লিখিত আছে,—"বাসব হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত শিব ভিন্ন সূর্য্য, অগ্নি ও অন্যান্য দেবদেবীর পূজা, জাতিভেদ, পুনর্জ্জন্মবাদ, ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মসন্তান ও শুদ্ধাত্মা, তাঁহাদের স্বতন্ত্র প্রভাব ও অভিসম্পাতের আশঙ্কা, প্রায়শ্চিত্ত, তীর্থভ্রমণ, স্থান বিশেষের মাহাত্ম্য, স্ত্রীলোকদিগের অপ্রাধান্য ও অপদস্থতা, নিকট সম্পর্কীয় কন্যার পাণিগ্রহণ দোষাবহ * * * ব্রাহ্মণ-ভোজন ও উপবাস * * * অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আবশ্যকতা প্রভৃতি বিষম ভ্রমাত্মক বলিয়া অগ্রাহ্য করেন এবং তাহা পরিবর্জ্জন করিতে আদেশ দেন।"

বাসব বেদ ও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই। দক্ষিণ ভারতে লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় আজও তাহাদের বৈশিষ্ট বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। বাসব ১১৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। *

---

* স্বামী রামানুজাচার্য্য ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গুরুদত্ত মন্ত্র মুক্তিপ্রদ জানিয়া একদিন চিৎকার করিয়া আচণ্ডালে সেই মন্ত্র শুনাইয়া ছিলেন এবং উত্তরকালে শূদ্র শিষ্যকে নিত্য স্পর্শ করায় তিনি ব্রাহ্মণ সমাজের চক্ষুশূল হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় বিদ্রোহী নিমাই পণ্ডিত

বিগত ১৪০৭ শকে অর্থাৎ চারিশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাংলার বাণীপীঠ নবদ্বীপধামে নিমাই পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে জীবের দুঃখে কাতর হইয়া হরিনাম বিলাইবার জন্য তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তারপর হইতে তাঁহার নাম হইল শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। কিন্তু বাংলাদেশে তিনি চৈতন্যদেব নামে খ্যাত হন। শ্রীচৈতন্যদেবের আচণ্ডাল ও যবনে হরিনাম বিতরণের ফলে বাংলায় যে ধর্ম্মমত ও বৈরাগী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল, তাহারা না মানিল বেদ, পুরাণ, না মানিল তন্ত্র স্মৃতি, না মানিল শূদ্রাচারী ব্রাহ্মণ কথিত শাস্ত্র ব্যাখ্যা। এই জন্য তৎকালীন শূদ্রাচারী ব্রাহ্মণগণ চৈতন্যদেবকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। অধিকন্তু তাঁহারা চৈতন্যদেবের মধ্যে মস্ত বড় দুইটি অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম আবিষ্কার করিয়া চৈতন্য প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

(ক) চৈতন্যদেবের প্রথম অপরাধ, ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তিনামায় যে লিখিত হইয়াছিল 'কলিতে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ' সেকথা অমান্য করিয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(খ) দ্বিতীয় অপরাধ, তিনি অস্পৃশ্যতা স্বীকার না করিয়া বরং দৃঢ়তার সহিত বর্জ্জন করতঃ তথা কথিত অস্পৃশ্যদের আলিঙ্গন দিয়া হরিনাম বিলাইয়া ছিলেন।

শূদ্রচারী ব্রাহ্মণ সমাজ চৈতন্য প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ও বৈরাগী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। ধীরে ধীরে বৈরাগী ও গৃহীগণ শিখা, কণ্ঠি ও তিলক ধারণ করিয়া হরিনামে মাতোয়ারা হইয়া এক জাতীয়তা ঘোষণা এবং বেদ ও স্মৃতি বিরোধী কর্ম্ম করিয়াও বাংলা দেশে স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। ইহাতে মিথ্যা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিলক্ষণ ধাক্কা খাইল।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের তৃতীয় বিদ্রোহী গুরু নানক

গুরু নানক ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বয়সে চৈতন্যদেব হইতে প্রায় ষোল বৎসরের বড় হইলেও, ইহার ধর্ম্মমত খুব ধীরে ধীরে প্রসারতা লাভ করিয়াছিল। তাহার প্রধান হেতু,—নিমাই পণ্ডিতের তুলনায় নানকের পাণ্ডিত্য কিছুই ছিলনা। তাই চৈতন্যদেব যখন পুরী হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত তাঁহার মতবাদ প্রচার করিতেছিলেন, তখন পঞ্চনদে গুরু নানককে এক প্রকার কেহই চিনিত না বলিলেই চলে। যাহা হউক গুরু নানক যে সকল শিষ্য করিয়াছিলেন, তাহারা শিখ নামে অভিহিত হইল এবং পর পর দশজন গুরুর অধীনে এই শিখ সম্প্রদায় জগতে 'বীর' বলিয়া পরিচিত হইল। ইহাদের মূল মন্ত্রও এক জাতীয়তা। ক্রিয়া কর্ম্মও বেদ, স্মৃতি বিরোধী।

যদিও বাবা নানকের সময় পাঞ্জাবে মুসলমান প্রভাবে হিন্দুগণ প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, তবুও শিখ সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের লোকই এই সম্প্রদায়ে বেশী করিয়া যোগ দিয়াছিল। সুতরাং মিথ্যা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ইহাতে প্রভূত ক্ষতি হইয়াছিল বলিতে হইবে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের চতুর্থ বিদ্রোহী—রাজা রামমোহন রায়

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের দুই শত উননব্বই বৎসর পরে ১৭৭৪ খ্রীঃ ব্রাহ্মণ বংশে বেদজ্ঞ রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে বিদ্রোহ উপস্থিত করেন, তাহার ফলে মূর্ত্তিপূজা, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম জাতিধর্ম্ম, খুকী বিবাহ, বিধবার বাধ্যতা মূলক ব্রহ্মচর্য্য পালন, সহমরণ, সমুদ্র যাত্রায় নিষেধ, অস্পৃশ্য সংস্পর্শে পাতিত্য, অসবর্ণা কন্যা বিবাহ, খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে উপপুরাণের অনুশাসন—এক কথায় তৎকালীন হিন্দু-সমাজের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রচলিত নিয়মগুলি অস্বীকৃত হইল।

রাজা রামমোহন রায় বেদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তন্ত্র সহায়ে যে বিধান দিয়া ছিলেন, তাহার উপরে বর্ত্তমান ব্রাহ্ম সমাজে বিলক্ষণ অদল বদল করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

সে কালের শিক্ষিত মধ্যে সল্প সংখ্যক লোক প্রকাশ্যে ও অধিক সংখ্যক লোক অন্তরে রাজা রামমোহনকে সমর্থন করিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে শিক্ষিত হিন্দু সমাজ ধীরে ধীরে রাজা রামমোহন কথিত ধর্ম্ম ও কর্ম্মবাদ অনেকাংশে গ্রহণ করিয়া নানা দিক দিয়া হিন্দু সমাজকে দোষমুক্ত করিতে লাগিলেন। বাংলা দেশ ধীরে ধীরে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মোহ কাটাইতে লাগিল।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পঞ্চম বিদ্রোহী স্বামী দয়ানন্দ

আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার ধর্ম্মমত বিশেষ ভাবে পাঞ্জাবে আদৃত হইয়াছে। স্বামী দয়ানন্দ বৌদ্ধযুগে বেদপন্থীগণ যে নিরামিষ যজ্ঞ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, সেই নিরামিষ যজ্ঞ গ্রহণ ও বেদের জ্ঞান কাণ্ড বর্জ্জন করিয়া যে আর্য্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, মূর্ত্তিপূজা, নাবালিকা কন্যা বিবাহ, বিধবার পক্ষে বাধ্যতা মূলক অবিবাহিতা জীবন যাপন অস্বীকার করিলেও বৈদিক সোম-সংস্থা যাগ পূণঃ প্রবর্ত্তন করিতে পারে নাই। অধিকন্তু মাংস এবং বিশেষ ভাবে গোমাংসের প্রতি আর্য্য সমাজের বিতৃষ্ণা রক্ষণশীল ব্রাহ্মণের ন্যায় রহিলেও প্রভেদ—আচার্য্য শঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের সকল দেশের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ একবাক্যে যাহা স্বীকার করিয়াছেন অর্থাৎ প্রাচীন কাল হইতে বুদ্ধ দেবের পরবর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত আর্য্য ও আর্য্য বংশীয় ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যগণ যজ্ঞে ও

শ্রাদ্ধে গোমাংস প্রদান করিত এবং ভক্ষণও করিত তাহা স্বামী দয়ানন্দ ও তৎসম্প্রদায় স্বীকার পর্য্যন্ত করেন না। অধিকন্তু আর্য্য সমাজীগণ গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি তীর্থ ও রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অতি মানবগণের প্রতি অশ্রদ্ধা ভাষণ প্রয়োগ করিতে খ্রীষ্টান পাদ্রীগণকেও হার মানাইয়া ছিল। স্বামী দয়ানন্দের অভ্যুত্থান—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিরুদ্ধে চতুর্থ বিদ্রোহ। কিন্তু অতি প্রবল বিদ্রোহ। প্রমাণ—পাঞ্জাবে বর্ণাশ্রমীগণ সর্ব্ববিষয়ে আর্য্য সমাজের পশ্চাতে চলিয়াছে।

শ্রীভগবানের যেন ইচ্ছা নয় যে, আর্য্য সমাজ ভারতে এক-জাতীয়তা স্থাপন ও বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। তাই স্বামী দয়ানন্দ অতবড় পণ্ডিত হইয়াও যাহা বেদ বলিয়া গ্রহণ করিলেন, তাহা জ্ঞান কাণ্ড বর্জ্জিত ও নিরামিষ কর্ম্মকাণ্ড হওয়ায়, সমগ্র ভারতের উপরে প্রভাব বিস্তার করিবার পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া রহিল। স্বামী দয়ানন্দ যদি জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয় কাণ্ডই গ্রহণ এবং সোম সংস্থা যাগের প্রবর্ত্তন করিতেন, তবে অদূর ভবিষ্যতে ভারত আর্য্য সমাজ প্রচারিত বৈদিক ধর্ম্মের করতল গত হইতে পারিত।

ষষ্ঠ বিদ্রোহী শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ

ব্রাহ্ম সমাজ ও আর্য্য সমাজ একদিকে এবং রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ অপর দিকে যে কোলাহল তুলিয়াছিল, তাহা নীরব না হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণকে পুরোভাগে রাখিয়া শূরবীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা লইয়া জগতের সন্মুখে উপস্থিত হইলেন, তাহার প্রভাবে ব্রাহ্ম, আর্য্য, রক্ষণশীল হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনীষীগণ আপন আপন সম্প্রদায়ের শাস্ত্র ব্যাখ্যার অপকৃষ্টতা অনুভব করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। শ্রীবাসব হইতে স্বামী দয়ানন্দ পর্য্যন্ত পাঁচ জন বিদ্রোহীই হিন্দু সমাজ হইতে

বাহির হইয়া পৃথক সমাজ বা সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বা স্বামী বিবেকানন্দ তাহা করেন নাই। বরং তাঁহারা সমাজকে যে ধর্ম্মের কথা শুনাইয়া ছিলেন, সমাজ যদি কখন সে কথা গ্রহণ করিতে পারে, ভারতে মানব ধর্ম্ম ও মানব সমাজ ছাড়া—হিন্দু, ব্রাহ্ম, আর্য্য, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ বলিয়া কোন পৃথক ধর্ম্ম বা সম্প্রদায় থাকিবে না বা থাকিতে পারেও না, ইহা তাঁহারা সুনিশ্চিত জানিতেন। অতএব এইদিক দিয়াও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপরে আঘাতটি নিতান্ত সহজ হয় নাই।

যদিও বৈষ্ণব বা আর্য্য সমাজের মত স্বামী বিবেকানন্দ কোন পৃথক সমাজ গঠন করেন নাই, তবুও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী জগতে প্রচার করিবার জন্য প্রথমে বাংলা দেশে বেলুড় গ্রামে স্থায়ী মঠ নির্ম্মাণ করিয়া একদল উৎসাহী শিক্ষিত যুবককে সন্ন্যাস দিয়া—শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সহায়ে তাঁহাদের মুক্তি ও জগতের হিত কোন্ পথে সাধিত হইবে জানাইয়া দিলেন। উত্তর কালে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে সন্ন্যাসীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু অল্প দিনেই দেখা গেল,—বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীগণ স্বামিজীর বেলুড় মঠের নিয়মাবলীকে পরিহার করিয়া কি ধর্ম্ম মতে কি কর্ম্ম জীবনে এক 'আপাপন্থী' বা স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করিতে অভ্যস্থ হইয়াছেন। কারণ, তত্ত্বজ্ঞের সংখ্যা চিরদিনই মুষ্টিমেয় হইয়া থাকে।

যদিও কথাটা অতি তুচ্ছ তবুও বলিতে হইবে,—প্রথম বিদ্রোহী শ্রীবাসব হইতে স্বামী বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত কোন বিদ্রোহীর মাথায় শিখা ছিল না। কিন্তু সপ্তম বিদ্রোহী—মাথায় লম্বা শিক্ষা লইয়া যে অভিনয়ে মত্ত হইয়াছেন, তাহাতে দেশবাসী প্রায় সকলেই এক বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—'মহাত্মার অন্ত পাওয়া ভার !! আমরা শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী মহারাজের কথাই বলিতেছি।

সপ্তম বিদ্রোহী মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধীর ভারতব্যাপী হরিজন আন্দোলন স্বামী বিবেকা-নন্দের ছুঁৎমার্গ পরিহারেরই বিরাট প্রচেষ্টা। মহাত্মা গান্ধী, যদি এই হরিজন নিয়াই মাতিয়া থাকিতেন, তবে এত কোলাহল উঠিত না। তিনি কখন বলেন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ভাল নহে, কখন বলেন, ঠিক বর্ণাশ্রমধর্ম্মই আমি চাই, কখন বলেন হরিজনেরা মন্দিরে প্রবেশ করিবে, কখন বলেন মাত্র দূর হইতে দর্শন করিয়াই চলিয়া যাইবে—এমন কত কি যে বলেন! কিন্তু প্রতি কথার পরেই, কথাটা পালটাইবার রকম দেখিয়া লোকের ধারণা হইয়াছে,—মহাত্মার মাথার শিখাটিই যত গোল বাধাইতেছে। ঐ শিখা ধরিয়া অতীতে মহম্মদ আলী সৌকৎ আলী টানিয়া গান্ধী মহারাজকে খিলাফত আন্দোলনে নাচাইয়াছেন। ঐ শিখা ধরিয়া টানিয়া পণ্ডিত মদনমোহন মহাত্মাকে বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে কথা না বলিতে বাধ্য করিয়াছেন। ধনিকের দল মহাত্মার ঐ শিখা ধরিয়া টানিয়া শ্রমিকের পক্ষে যাইতে বাঁধা দিয়াছিলেন। তাই দেশবাসী যদিও যুক্ত করে বলিতেছেন,—মহাত্মার অন্ত পাওয়া ভার, তবুও অস্বীকার করা চলে না যে,—মহাত্মার হরিজন আন্দোলন রক্ষণশীল বর্ণাশ্রমীদের বিলক্ষণ আঘাত করে নাই।

প্রবৃত্তিমার্গ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিরোধী মহামানবগণের জীবনালোকে যে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় স্থাপিত, সেই সকল সম্প্রদায় মধ্যে যে সম্প্রদায় যত বেশী প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত সেই সম্প্রদায়ের পতনও তত শীঘ্রই সম্ভব হইয়াছে

বুদ্ধদেবের শিক্ষাবাদ মধ্যে 'জীব হিংসা করিও না, ব্যভিচার করিও না ও মদ্যপান করিও না' ছিল শ্রেষ্ঠ উপদেশ। বৌদ্ধ সঙ্ঘের পতনের

সূত্রপাতে দেখা গেল,—ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের অবাধ যৌন সম্বন্ধের ফলে জারজ শিশু হত্যা, ভ্রূণ হত্যা ও জন্ম শাসন বিদ্যা প্রকাশ পাইয়াছিল। শক্তি সংগ্রহের জন্য মদ্যপান ও মাংসাহার—সাধনার অঙ্গরূপে যুক্ত হইয়াছিল।

আচার্য্য শঙ্কর শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন,—নরকের দ্বার নারী। মোক্ষকামীর পক্ষে স্বর্গ, পুত্র ও বিত্তের কামনা নিষিদ্ধ। আর বলিয়াছিলেন,—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। শঙ্করপন্থী সাধুগণ ইহার ব্যাখ্যা করিলেন,—স্বর্গ, মর্ত্ত, নরক—সকলই প্রপঞ্চময়। সুতরাং লাড্ডু খাওয়া ও স্ত্রী সঙ্গ করা প্রপঞ্চেরই অন্তর্ভূক্ত। ইহাতে নিত্য মুক্ত আত্মায় কোন কলঙ্ক স্পর্শে না। অতএব ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দ ভোগ করা অন্যায় নহে। এই পথে দশনামী সন্ন্যাসীগণের প্রভাব নষ্ট হইয়া গেল।

শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—'বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি (নারী) সম্ভাষণ, দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন'। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব বাবাজীগণ ইহার কি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারি নাই। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে,—প্রতি আখড়ায় বাবাজীদের সহিত বৈষ্টমীও রহিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণবের নাকি নাড়ীচ্ছেদ নাই, তাই বৈষ্টমীদিগকে কখনও সন্তান সম্ভাবিতা হইতে দেখা যায় না। ধন্য আখড়ার বাবাজী মোহন্তগণ! যাঁহারা গুরু পরম্পরা এমন এক ঔষধ শিখিয়াছেন যে,—কোন বৈষ্টমীর সন্তানও হয় না, শরীরও ভাঙ্গে না। গ্রাম্য ভাষায়—এই ঔষধেরই নাম হইল,—পেটপোড়া!

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকল সময়েই বলিতেন,—যেমন করে পার আগে শ্রীভগবানকে লাভ কর। তারপর তিনি যা করাবেন, তাই করবে। তিনি সন্ন্যাসীদের বলিতেন,—কামিনী কাঞ্চণ ত্যাগ যোগীর লক্ষণ। গৃহীদের বলিতেন,—দুইটি তিনটি সন্তান হইবার পরে স্বামী স্ত্রী ভাই

ভগিনীর মতন থাকিয়া ভগবানের সংসার করিবে। অর্থাৎ সন্তান-গুলিকে গোপাল ভাবিয়া মানুষ করিবে।

স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন,—Be and make, let this be our motto. অর্থাৎ—'সাধনায় সিদ্ধ হও, পরে অপরকেও সিদ্ধ হইতে সহায়তা কর—ইহাই আমাদের জীবন ব্রত হউক।' আমরা বলি,—ইহা সকলেরই ব্রত হউক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে,—শ্রীরামকৃষ্ণ বা স্বামী বিবেকানন্দ গৃহীদের সহায়ে কোন পৃথক সম্প্রদায় গঠন করেন নাই। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শ্রীগুরুর বাণী সন্ন্যাসীদের জীবন ও কর্ম্মের মধ্য দিয়া জগতকে জানাইবার জন্য বেলুড়মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন।

এই বেলুড়মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সঙ্ঘ বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। এই অল্প সময়ের প্রথম দিকে মিশনের আত্মপ্রত্যয় ও অদম্য কার্য্যশক্তি যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, আর আজ যাহা বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনে হইতেছে, তাহাও দেশবাসী বিলক্ষণই দেখিতে পাইতেছেন। সুতরাং সে কথা আমাদের না বলিলেও চলিবে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন,—"সকল হৃদ্‌গত ভাবই ফলানুমেয়, কার্য্য করিলেই প্রকাশ পাইবে।" এই কষ্টি পাথরে আধুনিক বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীগণকে যাঁচাই করিলে সকলেই দেখিবেন,—আধুনিক বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীগণের অধিকাংশের হৃদ্‌গত ভাব যাহা কার্য্যে প্রকাশ পাইতেছে তাহা হইল,—ব্যক্তিগত ভাবে নূতন নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা, তরুণ তরুণীদের জন্য বিদ্যালয় ও বোর্ডিং স্থাপন, গুরুগিরি বা কানে মন্ত্র দিয়া শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা। ফলে কি হইতেছে, তাহাই এখন দেখিতে হইবে।

ইদানীং এই সকল আশ্রম ও বিদ্যালয় হইতে ছাত্র ও ছাত্রীদের সহিত বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীগণের দৈহিক সম্পর্কের সঠিক সংবাদে দেশ মুখরিত। কারণ,—দেশ বিদেশে এই সংবাদ নির্যাতিত ছাত্র ছাত্রীগণের দ্বারাই প্রকাশ পাইয়াছে। তাই যে দেশবাসী এত দিন বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীগণের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন, তাঁহারাই এখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—এক পয়সার গেরুয়া রঙ্গে কাপড় ছোপাইয়া পরা যত সহজ, মনকে ছোপাইয়া কামিনী কাঞ্চণ হইতে অনাসক্ত রাখা মোটেই সহজ নহে।

বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীগণের হৃদ্গত ভাব যাহা উৎসাহের সহিত কার্য্যে প্রকাশ পাইতেছে,—তাহা জপ, ধ্যান, পূজা পাঠ বা তপস্যায় নহে। তাহা প্রকাশ পাইতেছে,—নারী ছাত্রীর জন্য নারী শিক্ষয়িত্রী, নারী রোগীর জন্য নারী ধাত্রী সস্তায় সংগ্রহ করিতে, আর এই সকল কার্য্যের জন্য চাঁদা আদায় করিতে। এক কথায়—কামিনীগণের জন্য বিপুলভাবে কাঞ্চণ সংগ্রহ করিতে।

ইহা ছাড়া নূতন হৃদ্গত ভাবের বিকাশও দৃষ্ট হইতেছে। যথা,—জন্মশাসন বিদ্যা রীতিমত অর্থব্যয় করিয়া শিক্ষা করা।

ইতিহাস কিন্তু বলিবে,—আধুনিক বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীগণ যাহা করিতেছেন, তাহা বিশেষও নহে, নূতনও নহে। বৌদ্ধযুগে ইহার সকল অভিনয়ই হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহারই ফলে বৌদ্ধ সঙ্ঘের ন্যায় আধুনিক শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সঙ্ঘও যে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তাহাও বিশেষ বা নূতন নহে। নূতন ও বিশেষ হইল,—বৌদ্ধ সঙ্ঘ ছয়শত বৎসর পরে পঙ্কিল হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন অর্দ্ধ শতক অতিক্রম না করিতেই পতনোন্মুখ হইয়াছে।

শুধু আধুনিক বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কথা বলিয়া ইতি করিলেই কথার শেষ হইবে না। আরও আছে।

এদেশে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যতগুলি সন্ন্যাসীর আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে, ইহাদের কোন কোন আশ্রম জন্ম হইতেই কামিনী কাঞ্চণে আসক্তি দেখাইতেছে। কোন কোন আশ্রম আরম্ভে বেশ তেজ দেখাইয়া, যতই দিন অতিক্রম করিতেছে, ততই আদর্শ ছাড়িয়া কামিনী কাঞ্চণের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, ঠিক সাধু হওয়া যেমন সকলেব সাধ্য নহে, তেমন ঠিক সাধু দেখিতেও দেশবাসী লালায়িত নহে। তাই দেশবাসীর শ্রমলব্ধ অর্থে এই সকল আশ্রমগুলি দিন দিন বেশ সচ্ছল হইতেছে। সুতরাং খাঁটি সাধুর অভাবও দেশে একান্ত ভাবেই উপস্থিত হইয়াছে।

দেখিতেছ না যে সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া দেশ তমোগুণ সমুদ্রে ডুবিয়া গেল

এই যে মহামানবগণের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম সঙ্ঘগুলির শোচনীয় পরাজয়, ইহার জন্য মহামানবগণের শিষ্য প্রশিষ্যগণই দায়ী। তাঁহারা যদি সাধারণ মানবকে মহামানবের ন্যায় শক্তিশালী মনে করিয়া সকলকেই প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিতে উৎসাহ না দিতেন, তবে এই শোচনীয় পরাজয় এত ব্যপক ভাবে কখনই সম্ভব হইত না। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন,—"ত্যাগের অপেক্ষা শান্তিদাতা কে? অনন্ত কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক ঐহিক কল্যাণ নিশ্চিত অতি তুচ্ছ। সত্ত্বগুণাপেক্ষা মহাশক্তি সঞ্চয় আর কিসে হয়? অধ্যাত্ম-বিদ্যার তুলনায় আর সব 'অবিদ্যা' সত্য বটে, কিন্তু কয়জন এজগতে সত্ত্বগুণ লাভ করে— এ ভারতে কয়জন? সে মহাবীরত্ব কয়জনের আছে যে নির্ম্মম হইয়া

সর্ব্বত্যাগী হন ? সে দূরদৃষ্টি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ হয় ? সে বিশাল হৃদয় কোথায়, যাহা সৌন্দর্য্য ও মহিমা-চিন্তায় নিজ শরীর পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয় ? যাঁহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লোক সংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়।—আর এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য কোটি কোটি নরনারীকে সামাজিক, আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে ?

"এ পেষণেরই বা কি ফল ?

"দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণ সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজড় বুদ্ধি পরাবিদ্যা-নুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে; যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্ম্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্রুরকর্ম্মী তপস্যাদির ভাণ করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম্ম করিয়া তোলে; যেথায় নিজের সামর্থ্য হীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষ নিক্ষেপ; বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্ব্বিত চর্ব্বণে, এবং সর্ব্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃ-পুরুষের নাম কীর্ত্তনে; সে দেশ যে তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে তাহার কি প্রামাণান্তর চাই ?

"অতএব সত্ত্বগুণ এখনও বহুদূর। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পরমহংস পদবীতে উপস্থিত হইবার যোগ্য নহেন বা ভবিষ্যতে আশা রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে রজোগুণের আবির্ভাবই পরম কল্যাণ। রজোগুণের মধ্য দিয়া না গেলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় ? ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে ? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে ?" *

* উদ্বোধনের প্রস্তাবনা হইতে উদ্ধৃত।

এই ভোগ শেষ না হইতে যাঁহারা বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাঁহাদের যোগ যে জমিতে পারিতেছে না, ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ। এ বিষয়ে আধুনিক বেলুড় মঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীগণের সহিত অন্যান্য ত্যাগী প্রতিষ্ঠানগুলির কোনও প্রভেদ নাই। সর্ব্বত্রই পঞ্চ 'ম' কারের জন্য কি আকুলী ব্যাকুলী, সর্ব্বত্রই অর্থ সংগ্রহের জন্য কি প্রাণপাৎ প্রচেষ্টা! এ দৃশ্য বড়ই করুণ হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার নিকট কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন,—"এমন লোক কেন আনিস মা, যে টাকার লোভ দেখায়।" ভারতবর্ষের অধিকাংশ সন্ন্যাসীগণই ভাবেন,—'মা, এমন লোক কেন আনিস, যে টাকা দেয় না।' সিংহ চর্ম্মাচ্ছাদিত হইলেই যে গর্দ্দভ সিংহ হয় না, তাহা প্রতিদিন ভারতীয় সন্ন্যাসীগণ দেশবাসীকে বিলক্ষণ সমঝাইয়া দিতেছেন।

সপ্তম বিদ্রোহী গান্ধী মহারাজ এখনও জীবিত আছেন। এমত অবস্থায় তাঁহার কথা ভবিষ্য ভারতের উপরে অর্পণ করিয়া যাওয়াই শ্রেয়।

বলিয়া রাখা ভাল,—বিদ্রোহী সম্প্রদায়ের পতন যত বেশী শোচনায়ই হউক না কেন, ইহাঁদের কৃতকর্ম্মে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে অবস্থিত অতি অধিক সংখ্যক হিন্দুই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন হইয়াছেন। তবুও যে তাঁহারা চুপ করিয়া আছেন, সে কেবল এতদিনের সংস্কার বশতঃই বলিতে হইবে। আর বলিতে হইবে,—সমাজকে নূতন করিয়া গড়িবার মত শ্রদ্ধা ইহাঁদের নাই। তাই বাধ্য হইয়া নীরবে সমস্ত সামাজিক অন্যায়েরই ইহাঁরা প্রশ্রয় দিতেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ভবিষ্য ভারত গঠনের জন্য বলিয়াছেন,—ছুঁৎমার্গ পরিহার করিতে, আর বলিয়াছেন,—"মানব নিজ প্রভাব বিস্তার করুক, উন্নতির পক্ষে যাহা কিছু বাধা বিঘ্ন আছে, সব ভাঙ্গিয়া ফেলা হউক, তাহা হইলেই আমরা উঠিব।"

ছুঁৎমার্গ যে অশাস্ত্রীয় কথা, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। সমাজের ভাবী উন্নতির যাহা বাধা বিঘ্ন তাহাও প্রামাণ্য শাস্ত্র সহায়ে প্রকাশিত হইয়াছে। এখন কি করিতে হইবে, উপসংহারে তাহাও প্রামাণ্য শাস্ত্র সহায়ে দেখাইতে হইবে।

পুরাতন শাশ্বত ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রাণীর পক্ষে সমান কাল কাহারও পরিহার্য্য নহে এবং এই কালের কোন ব্যতিক্রম নাই

মহাভারতে অনেক খাঁটি কথা আছে, তন্মধ্যে নিম্নে যাহা উদ্ধৃত করা হইল, তাহা সকলের পক্ষেই বিশেষ ভাবে প্রাণিধান যোগ্য। সেই খাঁটি সত্য কথাটি হইল,—"কোন ব্যক্তি, বিশেষ যত্ন করিয়া কালকে (চিরন্তনী সত্যকে) অতিক্রম করিয়াছে, এরূপ কখনও দৃষ্টি গোচর হয় নাই। পুরাতন শাশ্বত ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রাণীর পক্ষে সমান, কাল কাহারও পরিহার্য্য নহে এবং এই কালের কোন ব্যতিক্রম নাই।" ১

এই কথার মধ্যে দুইটি ভাগ আছে। প্রথমতঃ কাল, দ্বিতীয়তঃ পুরাতন শাশ্বত ধর্ম্ম। সুতরাং প্রথমে কালের কথা বুঝিতে হইবে।

পৃথিবীর আবর্ত্তনের ফলেই দিন ও রাত্রি হইতেছে। এই আবর্ত্তন সৃষ্টির প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত ঘড়ির কাটার ন্যায় ঠিক ভাবে ও সমতালে চলিয়া আসিতেছে। কোথায়ও এক সেকেণ্ড সময়েরও এদিক ওদিক নাই। অনাদি কাল হইতে সমনিয়ম ও সমতালে সে চলিয়াছে অবিরাম

১। প্রযত্নেনাপ্যক্রান্তো দৃষ্টপূর্ব্বো ন কেনচিৎ।
পুরাণঃ শাশ্বতো ধর্ম্মঃ সর্ব্বপ্রাণভৃতাং সমঃ॥
কালো ন পরিহার্য্যশ্চ ন চাস্যাস্তি ব্যতিক্রমঃ।
অহোরাত্রাংশ্চ মাসাংশ্চ ক্ষণান্ কাষ্ঠা লবান্ কলাঃ॥
শান্তিপর্ব্ব, ২২৭ অঃ, ৯৬—৯৭ শ্লোক॥

গতিতে। সুতরাং এই কালের যে কোন পরিবর্ত্তন নাই, ইহা বুদ্ধিমান মাত্রেই জানেন। তবুও যাঁহারা শাস্ত্রমধ্যে এই অপরিবর্ত্তনীয় কালকে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—এই চারি ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা, যে পুরাতন শাশ্বত ধর্ম্ম সকল প্রাণীর পক্ষে সমান, তাহার বিরুদ্ধাচরণের জন্যই উহা করিয়াছিলেন। এই পুরাতন শাশ্বত ধর্ম্ম যে কি তাহার আলোচনা পূর্ব্বেই হইয়াছে। এবং বিরুদ্ধাচরণ যে কতদূর ঘটিয়াছে, তাহাও সকলেই দেখিতে পাইয়াছেন। এখন একবার তুলনা-মূলক ভাবে দেখিতে পারিলে শাশ্বত ধর্ম্ম যে কি তাহা আরও পরিষ্কার উপলব্ধি হইবে।

প্রথমে পক্ষী ও পশু জগতের কথা দেখা যাউক। পক্ষী ও পশুগণ নিজ নিজ শাশ্বত ধর্ম্মানুসারে অনাদি কাল হইতে যে যাহার বাঁধা নিয়মে আহার ও যৌন সম্বন্ধ, নিদ্রা ও বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা কাপড় পরে না। সকলে বাসস্থান নির্ম্মাণও করে না। যাহারা করে, তাহারা অনাদি কাল হইতে যে যাহার আদর্শানুযায়ী একরকমের বাসাই নির্ম্মাণ করিয়া আসিতেছে। হাঁস ও মুরগী ভিন্ন অন্য সকল পক্ষীর মধ্যে সাময়িক নিষ্ঠাযুক্ত যৌন সম্বন্ধও অনাদিকাল হইতে সম নিয়মে প্রচলিত আছে। খাদ্য সম্বন্ধেও তাহাই। নিরামিষাহারী পাখী মরিয়া গেলেও আমিষাহার করিবে না, আমিষাহারী পক্ষী বা পশু মরিয়া গেলেও কলা মূলা খাইবে না। আর তাহারই জন্য দেখা যায় যে,—পক্ষী ও পশুর মধ্যে স্বাস্থ্যহানী বড় ঘটে না, অকাল মৃত্যুও তাহাদিগকে তাড়না করে না।

এই প্রকার মানুষেরও একটা পুরাতন শাশ্বত ধর্ম্ম ছিল, যাহার বলে তাহাদেরও স্বাস্থ্যহানী বা অকাল মৃত্যু বড় একটা ঘটিত না।

পুরাতন শাশ্বত ধর্ম্ম মানবকে কাপড় পরিতে, গৃহ নির্ম্মাণ করিতে, রান্না করিয়া খাইতে, বিছানায় শয়ন করিতে, বিবাহ করিয়া ঘর সংসার কিম্বা চাষ আবাদ করিতে বলে নাই। এখনও জগতের নানা দেশে

আদিম জাতীর মধ্যে পুরাতন শাশ্বত ধর্ম্ম প্রবলভাবে প্রচলিত আছে। তাহাদিগকে আমরা অসভ্য বলি। কিন্তু যাহারা বুদ্ধিমান, তাহারা অনেক দিন হইতে পুরাতন শাশ্বত ধর্ম্ম বা প্রকৃতি দত্ত নিয়ম ত্যাগ করিয়া যতই দূরে যাইতে বা সভ্য হইতে লাগিল, ততই তাহাদের মধ্যে স্বাস্থ্যহানী ও অকাল মৃত্যু আরম্ভ হইল। কিন্তু বুদ্ধিমান মানব এই স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিবার দোষ ক্ষালনের জন্য, যে কালের কোন পরিবর্ত্তন নাই, সেই কালের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া যাহা করিল তাহাতেও সে সান্তনা পাইল না। তাই সভ্য মানব, তাহার সভ্যতার এত সম্পদ থাকিতেও সে আজ শৃগাল কুকুর হইতেও স্বাস্থ্যহীন অসুখী এবং বিড়াল শাবক হইতেও অসহায় পরমুখাপেক্ষী। অথচ পুরাতন শাশ্বত ধর্ম্মেও সে ফিরিতে পারিতেছে না। এখন উপায় কি? উপায় বিজ্ঞগণের হাতে। যাঁহারা তৎপর না হইলে, সভ্যতার এত সুখ সুবিধা স্বাস্থ্যহীন মানব ভাগ্যে বেশী দিন আর ভোগে আসিবে না।

বুদ্ধদেবের বাণী

এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের একটি বাণী বলিতে হইবে। ইতিহাস বলেন,—বুদ্ধদেবের প্রথম রাজা শিষ্য অজাতশত্রু বজ্জিয়ানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ফলাফল সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের অভিমত জানিতে চাহিলে, বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন,—যতদিন বজ্জিয়ানগণ একতাবদ্ধ ও প্রাচীন রীতি নীতিতে একনিষ্ঠ থাকিবে, ততদিন তাহাদের অবনতি ঘটিবে না, বরং শ্রীবৃদ্ধিই হইবে।*

---

* Gautam (Buddha) replied that so long as the Vajjians remained united and true to their ancient customs we expect them not to decline but to prosper.

The civilisation of India. By R. C. Dutt.

First Edition, pp 39.

বুদ্ধদেবের শিক্ষাবাদ প্রভাবে আর্য্যবর্ণের পতন

বেদাদি ধর্ম্মগ্রন্থ ও ইতিহাস সহায়ে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, যতদিন আর্য্যগণ একদিকে দেব-বেদ-যজ্ঞ ও প্রাচীন রীতি নীতি আশ্রয় এবং অন্যদিকে ভারতীয় অনার্য্যগণের উপরে ক্ষমতা বিস্তার উপলক্ষ্য করিয়া একতাবদ্ধ ছিল, ততদিন তাহাদের উন্নতি ও অগ্রগমন অব্যাহত ছিল। বুদ্ধদেবের দশটি শিক্ষাবাদ [যাহা গ্রন্থের ২৮—৩৩ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে] এবং বৈদিক ধর্ম্ম ও আর্য্যবর্ণের প্রাচীন রীতি পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলেই ধরা পড়িবে যে,—বুদ্ধদেব জ্ঞাতসারে আর্য্য-গরীমা ধ্বংস করিবার জন্যই ঐ সকল বিধি আশ্রয় ও প্রচার করিয়াছিলেন। কার্য্যতঃ তাহাই কিন্তু হইয়াছিল।

বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী আর্য্য-রাজগণ মধ্যে যাঁহারাই বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মকে রাষ্ট্রধর্ম্মরূপে রাজ্যে চালাইয়াছিলেন বলিয়াই বৈদিক পশু যাগ স্থলে হবি সংস্থা [নিরামিষ] যাগ প্রবর্ত্তিত * এবং মদ্যপান ও অবাধ যৌন সম্বন্ধ দোষাবহ বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ফলে মদ্যপান বন্ধ হইয়া গেল এবং বিবাহ নামক প্রথা বৌদ্ধগণের সহিত আর্য্যগণকেও অনিচ্ছা সত্ত্বে গ্রহণ ও প্রচলন করিতে হইল। এইভাবে বৌদ্ধধর্ম্মকে উপলক্ষ্য করিয়া আর্য্যগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। আর এই বিভাগ উপলক্ষ্য করিয়া উভয় পক্ষের পতনের বীজ প্রথমে অঙ্কুরিত হইল। এই পতনের আরম্ভ হইয়াছিল, উভয় দল উভয় দলের ধর্ম্মমতের নিন্দা

* হবি সংস্থা যাগের নজীর রাখিতে যাইয়া নূতন করিয়া ঋগ্বেদে বশিষ্ঠ ঋষির নামে যুক্ত হইল,—হে অগ্নি! অহিংসাদি নিয়ম যুক্ত যজ্ঞ দ্বারা মনোরথ পূর্ণকরতঃ দেবগণকে আহ্বান করিতেছি এবং তাঁহাদের উদ্দেশে কর্ম্ম (যজ্ঞ) করিতেছি ॥ ৭।৩৪।৮ ॥

করিয়া। এই নিন্দার ফলে উভয় পক্ষের মনে ধর্ম্ম বিষয়ে সংশয় ও সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছিল।

জননী ও জন্মভূমিই একমাত্র দেবতা হউন

বর্ত্তমান সময়ে অসংখ্য ধর্ম্মমত আশ্রয় করিয়া যতগুলি সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে, তাঁহারাও একে অপরের ধর্ম্মমতের অসারত্ব প্রমাণ করাই ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ফলে পৃথিবীতে ধর্ম্মমতের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা লোপ পাইয়াছে এবং তাহার স্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে,—জননী জন্মভূমি। এই জননী জন্মভূমিকে আশ্রয় করিয়া আজ গড়িয়া উঠিতেছে জাতীয়তা বা Nationality. কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ ভারত ভারতীকে লক্ষ্য করিয়া যে বলিয়াছিলেন,—আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য জননী জন্মভূমিই আমাদের একমাত্র দেবতা হউন, ইহার মূলে ছিল, স্বামিজীর অনুভূতি। সেই অনুভূতি হইল,—গর্ভধারিণী জননী যে সন্তানকে আলোকে আনিলেন, ধরিত্রী তাহাকে চিরদিনের জন্য বুকে তুলিয়া লইলেন। জননী সন্তানের স্তন্য পীযূষদায়িণী মা, জন্মভূমি অন্নদায়িনী মা। উভয় মা ই সন্তানপালিনী, সন্তানের জীবনীশক্তিদায়িনী, অনন্ত কল্যাণময়ী। সুতরাং উভয়ে এক ও অভেদ।

আজ যে আমরা সর্ব্বহারা লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছি, তাহার প্রধান হেতু ঘরে ঘরে আমাদের জননীগণ হতমানা। সন্তান হইয়াও যাহারা স্তন্যদায়িনী মায়ের মর্য্যাদা দিতে পারে না, তাহারা কেমন করিয়া জন্মভূমির মর্য্যাদা দিতে শিখিবে? কিন্তু ভবিষ্য ভারতের উন্নতির উপায় স্বরূপ স্বামিজী যখন বলিয়াছেন, তখন সেই মহামন্ত্র আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে। আমাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে গর্ভধারিণী জননীর স্থান

ঘরে ঘরে সকলের উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। মুখের কথায় নহে কার্য্যের দ্বারা। সে কার্য্যের কথা পরে প্রকাশ পাইবে।

ভবিষ্য ভারতের উন্নতির উপাদান

১। প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ। এইজন্য আমাদিগকে এমন ভাবে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে, যাহার চালা বা ছাদের গরম বাহিরের গরম বা ঠাণ্ডা হইতে ঘরের মধ্যে বেশী গরম বা ঠাণ্ডা আনয়ন করিবে না। অন্যথায় বেশী সময় ঘরের বাহিরে থাকা প্রয়োজন এবং প্রতি বাড়ী এমন ভাবে নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক, যাহাতে গরমের দিনে শিশুদের লইয়া গৃহিনীগণ নিরাপদে রাত্রিতে উঠানে শয়ন করিতে পারেন।

২। নল কূপের সাহায্যে উত্তম পানীয় জল ও বাড়ীর জল নিকাশের ব্যাবস্থা। উত্তম পানীয় জল শরীরকে ব্যাধিশূন্য রাখিতে ও হজমের সহায়তা করিতে অদ্বিতীয়। পানীয় জল দূষিত হইলে দেশের স্বাস্থ্য কতদূর নষ্ট হয়, তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ। বাল্যকাল হইতে দূষিত জলের জন্য ভুগিয়া ভুগিয়া পঙ্গু হইয়া থাকা অপেক্ষা সবদিক দিয়াই মৃত্যু শ্রেয়। সুতরাং মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে হইলে উত্তম পানীয় জল ও বাড়ীর জল নিকাশের ব্যবস্থা অতি অবশ্য করা কর্ত্তব্য। বাড়ীর জল নিকাশের ভাল বন্দোবস্ত না থাকিলে সে বাড়ীর জর জ্বালা কিছুতেই দূর হইবার নহে।

৩। বাড়ী ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার অর্থ সকলেই জানেন। কিন্তু তবুও ঘরে থুথু ফেলা, বাড়ীর যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করা কেহই দোষাবহ মনে করিতে চান

না। ছোট খাটো কাজ হইতে কত অনর্থ যে উপস্থিত হয়, তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রচলন করিতে হইবে,—

(ক) দু'তিন হাত গভীর লম্বা নালা করিয়া তাহাতে মলমূত্র ত্যাগ করা ও সঙ্গে সঙ্গে মাটি চাপা দেওয়া।

(খ) থুথু ফেলিবার জন্য একটা পাত্রে বালি রাখিয়া জল দিয়া ভিজাইয়া তাহার উপরে থুথু ফেলা এবং সেই থুথু বালি সমেত মলমূত্র ত্যাগের নালাতে ফেলিয়া সঙ্গে সঙ্গে মাটি চাপা দেওয়া।

(গ) রান্নার ফেন জল এমন স্থানে ফেলিতে হইবে যেন সহজে শুকাইয়া যায়।

(ঘ) বাড়ীতে পানা পঁচা পুষ্করিণী থাকিলে তাহা ভরাইয়া কূপের প্রচলন করা এবং কূপের মুখে এমন জালতির ঢাকা রাখা যাহাতে মশা যাইয়া ডিম পাড়িতে না পারে। ঘরের দেওয়ালে ঝুল ও জিনিষ পত্রে ধূলা না জমিতে পারে। আত্ম রক্ষার জন্য যে দেশে সাপ বেশী ও গৃহস্থকে মাটিতে শয়ন করিতে হয়, সে দেশে নেউল ও ময়ুর রক্ষা ও বৃদ্ধি করা এবং বাসগৃহে সন্ধ্যার সময় কারবালিক এসিড্ জলে মিশাইয়া প্রতিদিন ছড়াইয়া দেওয়া।

৪। সহজে হজম হয় অথচ পুষ্টিকর এমন আহারের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা হইতে বর্ত্তমানে যে রান্নার ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহারও যেমন পরিবর্ত্তন হওয়া বিধেয়, তেমন অনেক দুষ্পাচ্য আহার্য্য বস্তু—যেমন ক্ষীর, পায়স, পিঠা খাওয়াও বন্ধ রাখা প্রয়োজন। প্রকৃতি মানুষকে ঘাস (কাচা ফল, মূল, তরকারী) ও মাষ (মাছ মাংস) খাইবার মত দাঁত দিয়াছেন। এমত অবস্থায় ভবিষ্য ভারতকে প্রকৃতির নির্দ্দেশ অনুসারে কাচা ফল মূল এবং মাছ ও মাংস খাইতে হইবে। সে মাংস খাওয়া বেদ ও মনু সংহিতার বিধান মতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বয়স

ও স্বাস্থ্যের রকম দেখিয়া আহারের পরিমাণও তদনুসারে দেওয়া শিখিতে হইবে। অন্যথায় অল্পাহারে লোক শুকাইয়া যাইবে, বেশী আহারে অজীর্ণে ভুগিতে থাকিবে। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে,—সমগ্র জাতিকে নূতন করিয়া পাকপ্রণালী শিখাইতে হইবে। আর শিখাইতে হইবে এমন কোন খাদ্য বস্তু থাকিতে পারে না, যাহা খাইলে জাতি যাইতে পারে। যেমন গো-মাংস, শূকরের মাংস, মুর্গীর মাংস, কূর্ম্ম মাংস প্রভৃতি।

৫। আলো ও বাতাস শরীরে যত বেশী লাগিতে পারে সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া পোষাক পরিচ্ছদ নির্ব্বাচন। এই পোষাক দ্বিবিধ হওয়া দরকার।ঃ—প্রথমতঃ কাজে কর্ম্মে পোযাকটা যেন বিঘ্ন উপস্থিত না করে। দ্বিতীয়তঃ আলো ও বাতাস শরীরে যত বেশী লাগিতে পারে।

৬। শারীরিক বল বৃদ্ধির নিমিত্ত বালক ও বালিকার জন্য পৃথক পদ্ধতির খেলা, ব্যায়াম, ও আত্মরক্ষার জন্য তীর ধনুক ও গুলতির ব্যবহার শিক্ষা। যে বয়স হইতে খেলা করিতে চিকিৎসকগণ বলেন, সেই বয়স হইতে বালক বালিকাদিগকে শক্তির অনুরূপ খেলা, ব্যায়াম ও তরুণ বয়সে চোর ডাকাত ও উৎপীড়কের হাত হইতে মান মর্য্যাদা বাঁচাইবার জন্য তীর ধনুক ও গুলতির ব্যবহার শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা জাতীয় কর্ম্মপদ্ধতি হিসাবে করিতে হইবে। এবং তীর ধনুক ও গুলতি ব্যবহারের অভ্যাস বার্দ্ধক্যে অচল হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে হইবে, যে ভাবে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ আমরণ সন্ধ্যা বন্দনা নিত্য করিয়া আসিতেছেন।

৭। পুরুষ ও নারীর শিক্ষা প্রকৃতির অনুকূলে প্রচলন রাখিতে হইবে। ভাবী অনাগত দলের দিকে চাহিয়া কন্যার শিক্ষা ও

অর্থনৈতিক দুরাবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কুটির শিল্প পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়া কন্যাগণের অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থাগমের জন্য পুরুষ যে কোন বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে। কিন্তু নারীর প্রধান শিক্ষা হইবে,—ধাত্রী বিদ্যায় পারদর্শিনী হওয়া। দ্বিতীয় শিক্ষা হইবে,—সন্তান পালন বিদ্যা শিক্ষা করা। ইহার পরে নারী জাতি এমন বিদ্যা শিখিবে, যাহার বলে সন্তান পালনের সঙ্গে ঘরে থাকিয়া অর্থোপায়ও হইতে পারে।

৮। নাগরিক বা সামাজীক জীবন যাপন প্রণালী শিক্ষা। এই শিক্ষা বাল্যকাল হইতে খেলা ধূলা ও পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়া কাহার কর্ত্তব্যের সীমা কতদূর, কিভাবে জীবন যাপন করিলে অপরের অসুবিধার সৃষ্টি হইবে না, আপদে বিপদে, সুখে সম্পদে কি ভাবে চলা বিধেয়, এই সকল বিষয় শিখিতে হইবে। এবং ব্যবহারিক জীবনে উহা কাজে লাগাইয়া সমাজকে দায়মুক্ত ও আনন্দযুক্ত রাখিতে হইবে।

৯। বিবাহের বয়স নিরুপণ। বিবাহ যে কোন বয়সে হইতে পারে, যদি বিধবা বিবাহ, বিবাহচ্ছেদ ও বিবাহিতা কন্যার শিক্ষা দীক্ষার প্রচলন স্থির থাকে। অন্যথায় কন্যার দ্বিতীয় সংস্কার ও ছেলেরা সাবালক হইলেই বিবাহ হওয়া বিধেয়। বেশী বিলম্বে বিবাহ হওয়া বা বিবাহ করা পুরুষ বা নারীর কাহারও পক্ষে বিধেয় নহে। কারণ, কাল কাহার অপরিহার্য্য নহে এবং কালের যখন কোন ব্যতিক্রম নাই, তখন যে বয়সের যাহা, তাহা না হইলে, উভয় পক্ষকেই অস্বাভাবিক পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে উভয় পক্ষেরই স্বাস্থ্য-হানী অবশ্যম্ভাবী। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে,—নারী প্রসঙ্গে পুরুষদের উদার মত আনিতে হইবে। ঋগ্বেদে নারী প্রসঙ্গে সতী অসতী বলিয়া কোন মন্তব্য নাই। মহাভারতে সতীত্বের কোন বালাই নাই।

নানা শাস্ত্রে নারী সম্বন্ধে নানা মন্তব্য রহিয়াছে। অধিকাংশ শাস্ত্রের মতে নারী চির পবিত্র। তন্মধ্যে স্কন্দ পুরাণ কিন্তু দুইটি বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বেশ মজা করিয়াছেন। যথা,—

(ক) নারী সর্ব্বদাই পবিত্র, ইহার কোন মতে দোষ হয় না। কারণ,—প্রতি মাসিক তাহার পাপরাশি বিনষ্ট করে॥ কাশী খণ্ড, পূর্ব্বার্দ্ধ, ৪০।৩৭ ॥

অগ্নি, চন্দ্র, গন্ধর্ব্ব এই তিনে প্রথমে নারীকে (স্ত্রিয়ঃ) ভোগ করেন, পশ্চাতে মনুষ্যগণ (মানুষাঃ) ভোগ করিয়া থাকে। (বহু পুরুষ সংসর্গিণী হইলেও) নারী কিছুতেই দোষযুক্ত হয় না॥ কাশী খণ্ড, পূর্ব্বার্দ্ধ, ৪০।৩৮ ॥

(খ) সূত্রাকার বলিয়াছেন,—নারী মাত্রেই অসতী, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি নারীর নিকট ফলই (সহধর্ম্মিনী, সন্তানের জননী, আনন্দ-দায়িনী—এই ত্রিবিধ) কামনা করিবে। তাহার দোষ (পর পুরুষাশ্রয়) দেখিবে না॥ মাহেশ্বর খণ্ডে কুমারিকা খণ্ড, ৬।১০৯—১১১ ?

ভবিষ্য ভারতকে নারী সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইবে, নারী পবিত্রও নহে অসতীও নহে। নারী—নারী। যতদিন সে লোক-বিশেষের সহধর্ম্মিনী, সন্তানের জননী ও আনন্দদায়িনী থাকিবে, ততদিন সে সেই লোক-বিশেষের স্ত্রী। বিবাহচ্ছেদ হইলে সে হইবে,—নারী। ইহার বেশী নারীর জন্য মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজনই দেখা যায় না।

১০। **কন্যার পছন্দ ও যুবার সম্মতিতে বিবাহ বিধির প্রচলন। ইহা কিন্তু প্রাচীন প্রথারই অনুকরণ মাত্র।** বিবাহ বিষয়ে আমরা নূতন কোন মত প্রবর্ত্তন করিতে চাহি না। আমরা চাহি,—মনু সংহিতার গুটি কতক প্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তন দেখিতে।:—

(ক) স্বয়ম্বর প্রথা। যাহা কন্যার নিজ পছন্দে বর নির্ব্বাচন করিতে দেয়॥ ৯।৯০ ॥

(খ) গান্ধর্ব্ব প্রথা। যাহা নর নারীর অনুরাগ বশতঃ সহবাসে (বিবাহ) সিদ্ধ হয়॥ ৩।৩২ ॥

(গ) স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শৌচ বিবিধ শিল্প বস্তু সকলের নিকট সকলে গ্রহণ করিতে পারে॥ ২।২৪০ ॥ এই ব্যবস্থা হইতে পুরুষের পছন্দে ও কন্যার সম্মতিতেও বিবাহ হইতে পারিবে।

(ঘ) বীর্য্যশুল্ক। যে ভাবে মহারথী অর্জ্জুন দ্রৌপদী ও শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে লাভ করিয়াছিলেন। এই চার রকম বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইলেই নিন্দিত পণ প্রথা আপনা হইতে সমাজে অচল হইয়া যাইবে, যাহা ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য কিম্বা আসুর বিবাহ দ্বারা কদাচ অচল হইবে না। ইহাছাড়া,—কন্যা কখন দানের বস্তু হইতে পারে না। কম্ ধাতু হইতে যে কন্যা শব্দের উৎপত্তি, সে কন্যা যে চির স্বাধীনা।

বলা বাহুল্য মিথ্যা বর্ণ বিভাগের কোন প্রভাব কন্যার উপরে বর্ত্তাইবে না। কন্যা যাহাকে ইচ্ছা বরণ করিতে পারিবে। অন্যদিকে বরও কন্যার সম্মতি পাইলে, সেই কন্যাকে বিবাহ করিতে সক্ষম হইবে।

১১। সন্তানের মাতৃনামে পরিচয়। সন্তানের পক্ষে মাতৃনামে পরিচিত হওয়াই খাঁটি সত্য পরিচয়। সকল অবস্থায় সত্যের মর্য্যাদা যখন দিতেই হইবে, তখন সন্তানের পক্ষে মাতৃনামে পরিচিত হওয়াই অধিকতর সঙ্গত ও সুশোভন। এই প্রথা প্রচলিত থাকিলে কাহাকেও মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইবে না।

১২। চুক্তিমূলক বিবাহ। বিবাহের অর্থই হইল চুক্তি-মূলক, যেমন ঋগ্বেদ ও মনু সংহিতায় রহিয়াছে। সুতরাং বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইবার হেতু হইয়াছিল,—মমত্ব ও বিশ্বাসের অভাব। বিবাহ-বন্ধন

অটুট রাখিতে, কিন্তু বিবাহিত মাত্রেরই কাম্য হওয়া স্বাভাবিক। সেই কামনা যদি মমত্ব ও বিশ্বাসের অভাবে কখন ছিন্ন হইয়া যায়, তখন পরাশর সংহিতা ৪।২৬ ও মনুক্ত ৯।১৭৫ বিধানের বলে পতি পরিত্যক্তা কিম্বা বিধবা পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবে। ঋগ্বেদেও বিধবাকে মনোমত পতি লাভ করিতে বলা হইয়াছে ॥ ১০।১৮।৭ ॥

১৩। নর নারীর যে কোনরূপ সংমিশ্রণের ফলে যে সন্তান হইবে, তাহারা কেহই পতিত বা নিন্দনীয় হইতে পারে না। মনু সংহিতার মধ্যে যে দ্বাদশবিধ পুত্র ও তাহাদের সহিত যেরূপ সামাজিক সম্পর্কের কথা লিখিত আছে, সেই প্রাচীন প্রথাই ভবিষ্য ভারতে বলবৎ রাখিতে হইবে।

১৪। মিথ্যা পরিচয়ে যে বিবাহ তাহা অসিদ্ধ। মৎস্য পুরাণে লিখিত আছে,—বর স্বীয় পরিচয় ও দোষের কথা গোপন করিয়া যদি কন্যার পাণিগ্রহণ করে, তাহার দণ্ড হইবে। আর ঐ কন্যা দত্তা হইলেও অদত্তা বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ ঐ কন্যার পুনরায় বিবাহ হইতে পারিবে॥ ২২৭।৮॥ এ ব্যবস্থা বর ও কন্যা উভয়ের পক্ষে প্রযুক্ত হইবে।

১৫। কন্যাই বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইবার অধিকারী পুত্র নহে। (ক) ঋগ্বেদে দেখা যায়, প্রাচীনকালে আর্য্য রীতি অনুসারে আর্য্যকন্যা জন্মস্থানে চির জীবন থাকিতেন। প্রমাণ 'জামাই গৃহ' কথা। ইহা ছাড়াও গুটি কয়েক মন্ত্র আছে, যাহা প্রকাশ করিতেছে যে,—বিবাহ নামক প্রথার প্রবর্ত্তনের পরেই কন্যাকে পতিগৃহে গমন করিতে হইল। ১

১। প্রাচীন প্রথায় কন্যাগণ চির জীবন যে জন্ম স্থানে থাকিত তাহার প্রমাণ,— "তোমরা এই স্থানে উভয়ে থাক, পরস্পর পৃথক হইওনা। * * * আপন গৃহে থাকিয়া পুত্র পৌত্রাদির সহিত আমোদ আহ্লাদ ও ক্রীড়া বিহার কর" । ১০।৮৫।৪২ ।

এই প্রথা প্রবর্ত্তনের ফলেই ধীরে ধীরে সন্তানের হস্তে গর্ভধারিণী জননী-গণের লাঞ্ছনাও সুরু হইয়াছিল। এই লাঞ্ছনার অবসান কোন 'নীতি' দ্বারাই দূর হইবার নহে। নীতিজ্ঞান এতদিনও ছিল। কিন্তু তাহা পুত্রবধূ ও পুত্রের হস্তে জননীকে লাঞ্ছনা ও অবমাননার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। বরং দেখা গিয়াছে,—যেখানে জননী বিষয়ের মালিক, সেখানে তাঁহার মান মর্য্যাদা পুত্র ও পুত্রবধূর দ্বারা লাঘব হইতে পারে নাই। বিষয়ের মালিকের করুণার উপরেই পুত্রগণকে নির্ভর করিয়া সংযতবাক্ হইতে হইয়াছে। সুতরাং জননীর প্রতি মমত্ব জাগাইয়া সন্তানগণকে জন্মভূমির প্রতি কর্ত্তব্য পরায়ণ করিয়া দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিতে হইলে,—সর্ব্বাগ্রে বিষয়ের স্বামীত্ব কন্যা পরম্পরা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(খ) পুরাতন শাশ্বত ধর্ম্মের মান্য ও প্রাচীন প্রথা বলবৎ রাখিবার জন্য 'বিবাহ-নাকচ' (Divorce) প্রথা যখন অতি অবশ্য প্রচলিত রাখা প্রয়োজন, তখন আর্য্যবর্ণের প্রাচীন প্রথার ন্যায় কন্যাকুলকে জন্ম-স্থানে রাখাই কর্ত্তব্য। নতুবা পতি পরিত্যক্তা অশিক্ষিতা, কর্ম্মদ্বারা

"এই স্থানে সন্তান সন্ততি জন্মিয়া তোমার প্রীতিলাভ হউক। * * * এই পতির সহিত আপন শরীর মিলিত কর, বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত নিজ গৃহে প্রভুত্ব কর" ॥ ১০।৮৫।২৭ ॥

কন্যার পতিগৃহে গমনের কথা।ঃ—"হে কন্যা! সূর্য্যদেব যে বন্ধনের দ্বারা তোমাকে বদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই বরুণের বন্ধন (জন্মস্থানে থাকিবার প্রথা) হইতে তোমাকে মোচন করিতেছি। যাহা সত্যের আধার, যাহা সৎকর্ম্মের আবাস, এইরূপ স্থানে তোমাকে নিরুপদ্রবে তোমার পতির সহিত স্থাপন করিতেছি" ॥ ১০।৮৫।২৪ ॥

"এই কন্যাকে এই স্থান হইতে মোচন করিতেছি, অপর স্থান হইতে নহে। অপর স্থানের সহিত ইহাকে (কন্যাকে) উত্তমরূপ গ্রথিত করিয়া দিলাম" ॥ ১০।৮৫।২৫ ॥

"পূষা তোমাকে হস্ত ধারণ করিয়া এই স্থান হইতে লইয়া যাউন। অশ্বিদ্বয় তোমাকে রথে বহন করুন। পতি গৃহে যাইয়া গৃহের কর্ত্রী হও" ॥ ১০।৮৫।২৬ ॥

জীবিকা অর্জ্জনে অক্ষমা পত্নী কোথায় যাইবে, কেমন করিয়া আহারের সংস্থান করিবে। ভাইর সংসারে! যে ভাই প্রতিদিন নিজ গর্ভধারিণীকে নানা ভাবে উপেক্ষা ও হতাদর করিয়া থাকে, এমন ভাইর দল কেন যাইবে পতি পরিত্যক্তা ভগিণীকে স্থান দিয়া খরচ বাড়াইতে? সুতরাং বিষয়ের স্বামীত্ব কন্যাগণকে না দিয়া বিবাহ নাকচ প্রথা প্রচলিত করিতে গেলে পতি পরিত্যক্তা পত্নীর ভাগ্যে দাসী বৃত্তি বা দেহ বিক্রয় ভিন্ন আহারের সংস্থান করা অসম্ভব হইবে। পুরুষের দল কষ্টও সহ্য করিতে পারে, প্রয়োজন মত যত্র তত্র যাইতেও পারে। কিন্তু কন্যাকুল তাহা পারে না। না পারিবার হেতু হইল,—অসহায়া নারীর প্রসঙ্গে পুরুষ জাতির একটা অহেতুক তীব্র মমত্ব বোধ আছে। এই দিক দিয়া দেখিলেও কন্যাগণই বিষয়ের উত্তরাধিকার লাভ করিবার পক্ষে উপযুক্ত। ইহা ছাড়াও অন্য হেতু আছে। হেতুটি হইল,—

(গ) কন্যা জন্ম স্থানে থাকিতে পারিলে তাহার মনের আনন্দ ও স্বাধীনতা বেশী থাকিবে কিম্বা সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে অপরিচিতদের মধ্যে আসিয়া নানা সমালোচনা, তাড়না, পীড়ন সহ্য করিয়া তাহার মনের স্বাভাবিক আনন্দ, সরলতা ও স্বাধীনতা বেশী থাকিবে? এ প্রশ্নের উত্তরে পুরুষ ও নারী একবাক্যে স্বীকার করিবে,—জন্মস্থানে থাকিতে পারিলেই কন্যার মনের আনন্দ ও স্বাধীনতা বেশী থাকিবে।

বিবাহিত জীবন আরম্ভে বধূর দলকে যে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়, দৈববশে বধূ বিধবা হইলে, সে নির্য্যাতন নূতন আকারে সুরু হয়। এ দৃশ্য আজ দেশের প্রায় সকল ঘরে ঘরে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

এই সমস্ত বিষয় এক সঙ্গে ভাবিয়া দেখিলে নিতান্ত স্বার্থপর দশ বিশ জন পুরুষ ছাড়া বাকী সকলেই স্বীকার করিবেন যে,—কন্যাগণের পতি গৃহে গমন ও আনুসঙ্গিক অত্যাচার উৎপীড়নের ফল ভাবী সন্তান-

গণকে বিশেষ ভাবে স্পর্শ করিয়া থাকে। ফলে সন্তানগণ সকল বিষয়ে দুর্ব্বল হইয়া জন্মে। জাতি যখন উন্নত ও মহৎ হইবার জন্য লালায়িত, তখন পরিবর্ত্তন যতই অসম্ভব মনে হউক না কেন, ভাবী সন্তানের মঙ্গলের জন্য কন্যাকুলকে বিষয়ের স্বামীত্ব ও জন্মস্থানে থাকিবার অধিকার ফিরাইয়া দেওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, যেখানে কন্যার নিজস্ব বাড়ী বলিতে কিছুই নাই, চিরদিন ভাড়া বাড়ীতে কাটিয়াছে, সেইখানে কন্যাকেই পতিগৃহে যাইতে হইবে।

১৬। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও স্মার্ত্তকর্ম্ম বেদ বিরোধী হেতু অবশ্য বর্জ্জনীয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও স্মার্ত্তকর্ম্ম বেদে দৃষ্ট হয় না। যাহা সত্য নহে, যাহা বৈদিক ধর্ম্মের বিরোধী এমন কর্ম্ম কেহই বেদের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া করিতে পারে না। বিশেষতঃ সমস্ত শাস্ত্রকার, শাস্ত্রের ভাষ্যকার যখন একবাক্যে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানাং সিদ্ধান্তের দ্বারা বেদকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন, তখন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও স্মার্ত্তকর্ম্ম বেদ বিরোধী বলিয়াই ত্যাগ করিতে হইবে।

১৭। মানব জাতির প্রতিষ্ঠা। আর্য্যগণ যখন ভারতের অধিরাজ ছিল, তখন তাহারা ছিল অনার্য্যগণের প্রভু। সুতরাং বিজয়ীর দম্ভ তাহাকে শিখাইয়াছিল,—আর্য্য শ্রেষ্ঠ, বিজিত দস্যু বা অনার্য্যগণ নিকৃষ্ট। তবুও দেখা যাইবে যে—মনু বলিতেছেন,- স্ত্রী রত্নং দুষ্কুলাদপি (২।২৩৮)। আর মহাভারত বলিতেছেন,—যযাতি ও অনার্য্যা কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভজাত পুরু বংশের কথা, যে বংশে রাজা শান্তনু দাসরাজ কন্যা অনার্য্যা সত্যবতীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর বলিয়াছেন,—ঋষি বশিষ্ঠ বংশ ও অন্য বহু ঋষির সহিত অনার্য্যা কন্যার সহবাসের সংবাদ।

মনুর বিধান ও মহাভারতের কাহিনী হইতে প্রকাশ,—আর্য্যগণ অনার্য্যা কন্যা গ্রহণ করিতে পারিত কিন্তু অনার্য্যকে কন্যা দান করিতে পারিত না। ইহাতে বিজয়ীর দম্ভে আঘত লাগিত।

মুসলমান রাজত্বে আর্য্য ও অনার্য্য উভয়ে বিজিত, রাজদরবারে উভয়ে কাফের, উভয়েই হিন্দু। কিন্তু হইলে কি হইবে! ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তিনামায় অসবর্ণ কন্যা গ্রহণ নিষিদ্ধ থাকায়, অদ্যাবধি সেই হেতুতে এক আর্য্যবর্ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যে রূপান্তরিত হইয়াও * যখন একে অপর বর্ণের কন্যা গ্রহণে অক্ষম, তখন অনার্য্যের আর্য্যা কন্যা গ্রহণের কা কথা! ইদানীং আর্য্য ও ব্রাহ্ম সমাজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্মার্ত্তকর্ম্ম ও মূর্ত্তিপূজা যে বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র বিরোধী, একথা প্রমাণ করিয়া যখন এক জাতীয়তা স্থাপন করিয়াছে, আর ইংরাজ রাজের নিকট যখন ব্রাহ্মণ ও তথা কথিত চণ্ডাল বা অনার্য্যে কোন প্রভেদই নাই এবং তাহা যখন এক শ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দুগণও সমর্থন করেন, যাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞান ও সংখ্যা নগণ্য ত নহেই বরং বিলক্ষণ প্রবল, তখন সুদূর অতীতের সেই বিজয়ীর শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভ বর্ত্তমানে কিছুতেই প্রতিষ্ঠা পাইতে পারে না। অতএব এক জাতীয়তা গঠন করিতে হইবে নিছক মানব ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া। যাহার মধ্যে অর্থ বা বংশ কৌলিন্যের কোন স্থান থাকিবে না। সকলেই সমান থাকিবে এবং সকলেই সকলের অন্ন ও কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবে। কাহারও নামের শেষে শর্ম্মা, বর্ম্মা প্রভৃতি উপপদ থাকিবে না। যেমন ঋগ্বেদ ও মহাভারতে নাই।

* আর্য্যগণই যে ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণে বিভক্ত হইয়াছিল, সে কথা বিষ্ণুপুরাণ ২।৪।১৭, ১৯ ও ব্রহ্মপুরাণ ২০।১৭, ১৯ শ্লোকে উক্ত আছে। :—

ইজ্যতে তত্র ভগবাং স্তৈর্ব্বর্ণৈরার্য্যকাদিভিঃ।

মহাভারতে ভীষ্মদেব কহিয়াছেন,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ইহারা পরস্পরের অন্ন ভোজন করিতে পারে॥ অনুশাসন পর্ব্ব, ১৩৫ অধ্যায়॥

১৮। মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব স্ফুরণের সঙ্গে ভগবানের আরাধনার প্রবর্ত্তন। মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি বশে যেমন তাহার ক্ষুধা পায়, ঠিক তেমনই ধর্ম্ম ভাবের বিকাশ যাহার মধ্যে প্রকৃতি বশে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাকেই তাহার মনের মতন আরাধনা করিতে দিতে হইবে। এই ভাবে স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব স্ফুরণের পূর্ব্বে কাহাকেও নিজ ধর্ম্মমত বা ব্যক্তিগত মতের দ্বারা প্রভাবান্বিত করিতে দেওয়া হইবে না। কারণ বংশগত বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত কোন লোকেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতে পারে না। ইহা 'তোতাপাখী' বানাইবার যন্ত্র হয় মাত্র। এরূপ শিক্ষার ফলে মানুষ 'ধোবীকা কুত্তা' বনিয়া থাকে। সে না হয় 'ঘর্‌কা', না হয় 'ঘাট্‌কা'। অর্থাৎ সে সাহস করিয়া না পারে দুনিয়াটা ভোগ করিতে, না পারে সাহস করিয়া দুনিয়াটা ত্যাগ করিতে। অনুরাগ না হইলে শুধু অনুষ্ঠানিক কর্ম্ম মানুষ যন্ত্রবৎ করিতে পারে। কিন্তু তাহাতে নিজে শান্তি পাইতে কিম্বা অপরকে শান্তনা দিতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,—"মনে করুন আমি একটি ছোট ছেলে। আমার পিতা একখানি ছোট বই আমার হাতে দিয়া বলিলেন,—ঈশ্বর এই রকম। কেন, আমার মনে ঐ সব ভাব ঢুকাইয়া দিবার তাঁহার কি মাথা ব্যাথা পড়িয়াছিল? আমি কি ভাবে উন্নতি লাভ করিব, তাহা তিনি কিরূপে জানিলেন? আমার প্রকৃতি অনুসারে আমি কিরূপে উন্নতি লাভ করিব, তাহার কিছু না জানিয়া তিনি আমার মাথায় তাঁহার ভাবগুলি জোর করিয়া ঢুকাইবার চেষ্টা করেন—আর তাহার ফল এই হয় যে, আমার উন্নতি—আমার মনের বিকাশ কিছুই হয় না। * * *

আমার মাথায় কতকগুলি বাজে ভাব ঢুকাইয়া দিবার আমার পিতার কি অধিকার আছে? * * * এ সব জিনিষ আমার মাথায়

ঢুকাইয়া দিবার সমাজের কি অধিকার আছে? হইতে পারে, ওগুলি ভাল ভাব, কিন্তু আমার রাস্তা ও না হইতে পারে। লক্ষ লক্ষ নিরীহ শিশুকে এইরূপে নষ্ট করা হইতেছে। * * * কত কত সুন্দর ভাব। যাহা অতি আধ্যাত্মিক সত্য হইয়া দাঁড়াইত—সেগুলি বংশগত ধর্ম্ম, সামাজিক ধর্ম্ম, জাতীয় ধর্ম্ম প্রভৃতি ভয়ানক ধারণাগুলির দ্বারা অঙ্কুরেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। * * * আপনাদের মাথায় আপনাদের বাল্যকালের ধর্ম্ম, আপনাদের দেশের ধর্ম্ম এই সব লইয়া কি ঘোর কুসংস্কার রাশি রহিয়াছে। ঐ সকল কুসংস্কার শুধু আপনাদিগকেই প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাই নহে। আপনারা আবার সেইগুলি আপনাদের ছেলে মেয়েকে দিয়া তাহাদিগকেও নষ্ট করিতে উদ্যত রহিয়াছেন।" *

অতএব ভগবানের স্বরূপ বর্ণনা ও স্বর্গাদির লোভ দেখান হইতে পুরোহিতগণ যাহাতে বিশ্রাম পাইতে পারেন এবং কুলগুরুগণও যাহাতে কানে মন্ত্র না দিয়া অন্য ব্যবসা গ্রহণ করেন তাহা দেখাও প্রয়োজন হইয়াছে। ঠিক এই কথা মঠধারী বা পরিব্রাজক সন্ন্যাসীগণকেও বলা যাইতে পারে। তাঁহারা যে যুবা দেখিলেই বৈরাগ্যের কথা বলিতে থাকেন, কিন্তু তাঁহারা কি বলিতে পারেন, কাহার কোন্ পথে ধর্ম্মভাব জাগ্রত হইবে? আমরা জানি প্রকৃত বৈরাগ্যবান লোককে কোন মঠধারী বা পরিব্রাজক সন্ন্যাসী চান না। অপিচ কোন মঠ বা আশ্রমই প্রকৃত বৈরাগ্যবানের সাধন ভজনের পক্ষে অনুকূল স্থান নহে। আধুনিক নিয়ম কানুনে বাঁধা যে কোন মঠ বা আশ্রমে সাধক জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ যে একদিনও থাকিতে পারিতেন না, একথা বলিবার মত সম্বল আমাদের যথেষ্টই আছে। তবুও যে দেশে নিত্য নূতন নূতন মঠের উৎপত্তি, এগুলি একমাত্র তাহাদেরই জন্য,

* স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলী, ভক্তি রহস্য গ্রন্থে ইষ্ট দ্রষ্টব্য।

যাহারা ঝালে ঝোলে অম্বলে থাকিয়া মঠধারীগণের মনোরঞ্জনে সক্ষম হইবে। ভবিষ্যৎ ভারতের কর্ত্তব্য হইবে,—দৃঢ় হস্তে যে কোন মঠ বা আশ্রমকে পেটার্থী সাধুগণের হাত হইতে মুক্ত রাখা এবং প্রকৃত বৈরাগ্যবানের সাধন কেন্দ্ররূপে নিযুক্ত করা। অধিকন্তু সন্ন্যাসীগণ যাহাতে কোন স্কুল, বোর্ডিং স্থাপন করিয়া বালক বালিকা, তরুণ তরুণীদের মস্তিষ্ক চর্ব্বন এবং ধর্ম্ম ও দেশ হিতকর কর্ম্মের নামে পৌঢ় প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধ বৃদ্ধা—বিশেষ ভাবে বিধবাদের অর্থ শোষণ করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করা। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, বৈরাগ্যের নামে চরম অলসতা যথেষ্ট প্রশ্রয় পাইয়াছে। সুতরাং ভবিষাতে যাহাতে সাধুগণ উপদেশ প্রদান ও শিক্ষা বিস্তারের ছলে বিদ্যালয়, আশ্রম বা মঠ প্রভৃতি স্থাপন করিয়া দেশের আশা ভরসার স্থল যুব শক্তিকে বৈরাগ্যবান (?) তোতা পাখী কিম্বা 'ধোবীকা কুত্তা না ঘর্‌কা না ঘাট্‌কা' বানাইতে পারে, সর্ব্ব প্রযত্নে দেশবাসীকে তাহার গতিরোধ করিতে হইবে।

১৯। দেব মন্দির বিষয়ে ভাবের পরিবর্ত্তন। ভারতে অসংখ্য দেব দেবীর মন্দির আছে। এই দেব মন্দির গুলি মানবের প্রকৃতিগত ধর্ম্মভাবের সাধনা কেন্দ্র হইবে। কারণ, এই সকল জাগ্রত দেব দেবীর সাধনায় লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগবদ্দর্শন হইয়াছে। অতএব এই সকল দেব দেবী সেই পরম ব্রহ্মেরই বিভিন্ন বিকাশ প্রচার রাখিয়া, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবের প্রাচীন কলহ ত্যাগ এবং এই সকল মন্দিরের উৎসবকে শ্রীভগবানের বিভিন্ন রূপের লীলা কীর্ত্তন বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত দেশবাসীকে স্বীকার করাইতে হইবে। নতুবা এক সম্প্রদায়ের সহিত অপর সম্প্রদায়ের কলহকে জিয়াইয়া রাখিবার জন্য কোন বিগ্রহ বা মন্দিরের অস্তিত্ব কদাচ রক্ষিত হইতে পারে না। যেহেতু, ইহা দ্বারা অতীতে ধর্ম্মের নামে অযথা অনেক রক্তপাত হইয়াছে।

২০। **জাতির স্নায়ু ও পেশী সতেজ ও সবল রাখিবার জন্য বৈদিক পশুযাগের প্রবর্ত্তন ও প্রচলিত প্রথায় দেব দেবীর নিকট পশুবলির সংরক্ষণ।** অতীতের ঋষিগণ বৈদিক সোম সংস্থা যজ্ঞে পশু বলি দিয়াছেন। তন্ত্রের বিধানে লক্ষ লক্ষ সাধক পশু বলি দিয়া দেবীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন। শেষ শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবও এই তন্ত্রমতে জগন্মাতার আরাধনায় বলি দিয়া শ্রীশ্রীমহামায়ার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং আধ্যাত্মিক দিক দিয়া বলি কদাচ অশ্রদ্ধার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

আধিভৌতিক দিক হইতে বলি সমগ্র জাতির স্নায়ু ও পেশী দৃঢ় ও সবল করিবার উপায় বলিয়াই উহা বহাল রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য॥

আজ ইংরাজ রাজের বিধানে স্থির হইয়াছে যে, ভারত ক্রমশঃ স্বরাজের পথে চালিত হইবে এবং যাহাতে ভারতবাসী ভবিষ্যতে ভারতের শাসন ও সমরক্ষণ করিতে সক্ষম হয় তেমনই ভাবে তাহাকে শিখাইয়া লইতে হইবে। এই বিধানে দেশ রক্ষার ভার ধীরে ধীরে ভারতবাসীকেই গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং জাতির স্নায়ু ও পেশী দৃঢ় ও সবল রাখিবার অনুকূলে ঘরে ঘরে ব্যায়াম ও পশু পক্ষী বলি দিবার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ছেলে বেলা হইতে যাহারা বলি দেখিয়া থাকে, স্নায়ু দৌর্ব্বল্য তাহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। অতএব কসাইর দোকানের মাংস না খাইয়া গৃহস্থগণের অবশ্য কর্ত্তব্য, ভাবী বংশধরগণের স্নায়ু দৃঢ় ও পেশী সবল রাখিবার জন্য ঘরে ঘরে যে কোন ভাবে বলির প্রচলন পুনঃ প্রবর্ত্তন করা।

কথায় বলে, কচুগাছ কাটিতে কটিতে লোক ডাকাত হয়। আমরা কিন্তু অতীতের ইতিহাসে পশুবলি দেখিয়া দেখিয়া মানুষকে অসম সাহসী, মহারথী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে দেখিয়াছি।

২১। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ভবিষ্য ভারত বা মানব জাতি ও মানব ধর্ম্ম গঠনের যে উপাদান বেদাদি প্রামাণ্য ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইল, তাহাতে যাঁহারা বিশ্বাসী ও অনুরাগী, তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইবে,—গঠন মূলক কার্য্যারম্ভ করা। :—

(ক) সমভাষাভাষি লোকদের লইয়া এক এক প্রদেশ গঠন করা।

(খ) প্রত্যেক প্রদেশের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করতঃ দেশবাসীকে সচ্ছল ও সন্তুষ্ট রাখা।

(গ) প্রতি প্রদেশের বাসগৃহ নূতন ভাবে নির্ম্মাণ, গ্রামে গ্রামে উত্তম পানীয় জলের ব্যবস্থা, ঘরে ঘরে সহজ পাচ্য ও বলকারক খাদ্যের প্রচলন, বালক বালিকার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য খেলা ধূলা ও আত্মরক্ষার জন্য তীর ধনুক ও লাঠি শিক্ষার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পোষাক পরিচ্ছদের নূতন প্রচলন, ভাবী সন্তান ও অর্থ সঙ্কটের প্রতি নজর রাখিয়া পুরুষ ও স্ত্রীর পৃথক শিক্ষা ও পৃথক উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের পন্থা, নাগরিক জীবনের ইতি কর্ত্তব্যতা, যাহার যেরূপ সামর্থ্য তদনুসারে তাহাকে উপার্জ্জন-সক্ষম করিয়া তোলা, নারীজাতি সম্বন্ধে উদার ধারণা পোষণ, বিবাহকে চুক্তি মূলক করিয়া মানব জীবনকে শান্তিপ্রদ, কন্যার পছন্দে বর নির্ব্বাচন করিবার অধিকার, মিথ্যাপরিচয়ে কেহ বিবাহ করিলে, সেই বিবাহ নাকচ করিয়া কন্যাকে অন্যত্র বিবাহ করিবার অধিকার, সন্তানের কল্যাণ কামনায় নারীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব প্রদান ও সন্তানকে মাতৃনামে পরিচিত হইবার ব্যবস্থা, স্মার্ত্তকর্ম্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বেদবিরোধী বলিয়া পরিত্যাগ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রত্যেকের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইবার সাবকাশ দেওয়া এবং পূজায় পশুবলির পূণঃ প্রচলন করা বা করিতে প্রাণপাত চেষ্টা করা প্রত্যেক প্রাচীন পন্থায় বিশ্বাসী ও অনুরাগীর অবশ্য কর্ত্তব্য। এক কথায় যাহা বর্ত্তমান সমাজে প্রচলিত থাকিয়া জীবনের গতিরোধ করিতেছে, তাহা

বাদ দিয়া উপরোক্ত বিষয়গুলি প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। আর করিতে হইবে,—বর্ত্তমান হিন্দু-আইনের (Hindu Law) আমূল পরিবর্ত্তন সাধন।

বর্ত্তমান হিন্দু-আইন রচিত হইয়াছিল,—রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণের মন্ত্রণায়—আর তাহা রচিত হইয়াছিল ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তি নামার ফলে যে সকল উপপুরাণের জন্ম, তাহার নজীরে।

ভবিষ্য ভারত যে আইন প্রণয়ন করিবে, তাহার নজীর বা উপাদান হইবে চিরন্তনী প্রকৃতির নিয়ম ও মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই উভয়ের উপর নির্ভর করিয়া যে আইন রচিত হইবে, একমাত্র তাহাই সমধিক পরিমাণে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা প্রদান করিতে সক্ষম। ইহা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই।

সমাপ্ত।